অবিস্মরণীয় নারী

খুশবন্ত সিং

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

খুশবন্ত সিং -এর

অবিস্মরণীয় নারী

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

অনূদিত

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা–১১০০

প্রকাশকাল | ফেব্রুয়ারি ২০০২
ফাল্গুন ১৪০৮

প্রচ্ছদ | এম. জি. রাব্বানী

বর্ণবিন্যাস | এ্যাপেলটক কম্পিউটারস
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ | নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা–১১০০

মূল্য | **একশত ত্রিশ টাকা**

ABISMARANIYA NARI — novel by Khuswant Singh. Translated by Anwar Hossain Manju Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100, First Edition : February 2002.
Price : Tk.130 ,00 only.

ISBN . 984-11–0524–6

অনুবাদকের কথা

ভারতের অন্যতম সফল লেখক খুশবন্ত সিং এর 'বুক অফ আনফরগটেবল ওম্যান' তার জীবনে আসা নারী এবং তার পরিচিত বিশিষ্ট মহিলা ব্যক্তিত্বদের উপর বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রের কলামে যা লিখেছেন তার সংকলিত রূপ। এতে স্থান পেয়েছে খুশবন্ত সিং-এর প্রথম যৌবনের বান্ধবী গায়রুনেসা হাফিজের কাহিনী, যার সাথে সম্পর্কের কারণে মুসলমানদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছিল। ভারতীয় মুসলমানরাও যে তাদের দেশকে হিন্দু ও শিখদের মতোই ভালবাসে এবং জাতীয় স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে তারা ভুল করতে পারে না এ উপলব্ধিও সৃষ্টি হয় তার মধ্যে। লেখক তার স্ত্রী কাভাল মালিককেও চিত্রায়িত করেছেন, যিনি গণমাধ্যমের প্রচারণার প্রতি বিরূপ এবং নিস্পৃহ হলেও নিজের বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তে অটল। বিতর্কিত শিল্পী অমৃতা শেরগিল, মাদার তেরেসা, ফুলন দেবীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন চমৎকারভাবে। তার বর্ণনা সংশ্লিষ্ট নারী ব্যক্তিত্বদের জীবনী নয়, জীবন ও কর্মের বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য দিকই শুধু পরিস্ফুট হয়েছে। এছাড়াও খুশবন্ত সিং-এর উপন্যাস ও ছোটগল্পের বেশ কিছু সংখ্যক নারী চরিত্রকে এ গ্রন্থে স্থান দেয়া হয়েছে। ব্ল্যাক জেসমিন মার্থা স্ট্যাক, লেডি মোহন লাল, জীন মেমসাহেব, ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস 'দিল্লি'র হিজড়া বেশ্যা ভাগমতি, ঊনিশ'শ' সাতচল্লিশ সালে দেশবিভাগের পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচিত 'ট্রেন টু পাকিস্তান' এর কৃষ্ণ নয়না নূরান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতে বৃটিশ বিরোধী সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রেক্ষাপটে লিখা 'আই শ্যাল নট হিয়ার দ্য নাইটিঙ্গেল' উপন্যাসের যৌনকাতর গৃহবধু চম্পক এবং দৃশ্যত যৌন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ উপন্যাস 'দ্য কম্প্যানি অফ ওম্যান'-এর বেশ ক'টি চরিত্র গৃহপরিচারিকা ধান্নো, কলেজে ইংরেজী শিক্ষিকা সরোজিনী ভরদ্বাজ, আজাদ কাশ্মীরের এক মন্ত্রীর স্ত্রী ইয়াসমিন ওয়ানচো, গোয়ার মালিশ কারিনী মলি গোমেজের সাবলীল সুপাঠ্য বিবরণ পাঠকদের উজ্জীবিত করার জন্যে যথেষ্ট।

খুশবন্ত সিং-এর রচনাশৈলীর সাথে বাংলাদেশের পাঠকসমাজ পরিচিত। তার অধিকাংশ রচনায় মানুষের যৌন চেতনা ও আচরণের খোলামেলা বর্ণনা রয়েছে, যা অনেক পাঠকের কাছে বিব্রতকর বিবেচিত হলেও জীবন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার বর্ণনার মাঝে ন্যাকামি নেই, অসততা নেই। খোলামেলা প্রকাশের সততায় সমৃদ্ধ খুশবন্ত সিং-এর প্রতিটি উপন্যাস, ছোটগল্প এবং অন্যান্য রচনা।

সূচিপত্র

একজন মহিলার প্রতিকৃতি ৭
ভারতীয় নারী ১১
মাদার তেরেসা ২৪
ভারতীয় সমাজে যৌনজীবন ২৮
ফুলন দেবী ৩২
গায়রুন্নিসা হাফিজ ৪২
সাদিয়া দেহলভী ৪৫
আনিস জং ৪৮
কামনা প্রসাদ ৫২
অমৃতা শেরগিল ৫৭
বোম্বের ভিখারিনী মেয়েটি ৬১
আমার স্ত্রী কার্ভাল ৬৩
শিখ সরদারজি এবং অভিনেত্রী ৬৭
লেডি মোহনলাল ৭৪
মার্থা স্ট্যাক ৭৯
বিন্দু ৮৮
জীন মেমসাহেব ৯৩
ধান্নো ৯৯
সরোজিনী ১০৪
ইয়াসমিন ১০৯
মলি গোমেজ ১২১
নূরান ১৪৫
বীনা ১৫৪
চম্পক ১৬১
ভাগমতি ১৬৫
জর্জিন ১৬৮

একজন মহিলার প্রতিকৃতি

প্রত্যেকের দাদিমার মতো আমার দাদিমাও একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। যে বিশ বছর আমি তাকে দেখেছি তিনি বৃদ্ধা এবং চামড়া ভাঁজ পড়া অবস্থায়ই ছিলেন। লোকজন বলতো, একসময় তিনি তরুণী, সুন্দরী ছিলেন এবং তার স্বামীও ছিল। কিন্তু তা বিশ্বাস করা কঠিন। ড্রয়িং রুমে বাতির আধারের উপর ঝুলানো ছিল আমার দাদাজি'র একটি ছবি। মাথায় বিরাট পাগড়ি এবং ঢিলেঢালা পোশাক পরা। দীর্ঘ সাদা দাড়ি তার বুকের উল্লেখযোগ্য অংশ ঢেকে রেখেছে এবং তাকে কমপক্ষে একশ' বছর বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে। তাকে দেখে এমন ব্যক্তি মনে হয় না, যার একজন স্ত্রী ও সন্তান থাকতে পারে। তাকে মনে হয় যেন তার শুধু অসংখ্য নাতি-নাতনিই থাকতে পারে। আর দাদিমার তরুণী ও সুন্দরী থাকার ব্যাপারটা কল্পনায়ও প্রায় অবাস্তব বলে মনে হয়। তিনি আমাদেরকে তার শৈশবের খেলাগুলো সম্পর্কে বলতেন, যা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং তার ক্ষেত্রে অমর্যাদাকর মনে হয়। তিনি আমাদেরকে যেসব মহান ব্যক্তি সম্পর্কিত কাহিনী বলতেন, এটাকেও আমরা সেরকম কাহিনী বলেই বিবেচনা করতাম।

তিনি সবসময় বেঁটে, মোটা এবং একটু সামনের দিকে একটু ঝুঁকানো ছিলেন। তার সারা মুখ জুড়ে বলিরেখা। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, আমরা যেভাবে তাকে দেখে আসছি তিনি বরাবর সেরকমই ছিলেন। বৃদ্ধা, এমন বৃদ্ধা যে, তার আর বয়স বাড়বে না এবং বিশ বছর যাবত তার বয়স একই রয়েছে। তিনি কখনো সুন্দরী ছিলেন না, তবু তিনি সবসময় সুন্দর। এক হাত কোমরে রেখে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে দাগহীন সাদা পোশাক পরে তিনি সারা বাড়ি ঘুরতেন, আরেক হাতে জপমালা ঘুরাতেন। জপমালার রৌপ্য গুঁটি তার ফ্যাকাসে, ভঙ্গুর মুখের উপর ছড়ানো থাকতো এবং ঠোঁট অব্যাহতভাবে নড়তো অনুচ্চ প্রার্থনায়। হ্যাঁ, তিনি সুন্দরী ছিলেন। শীতের পার্বত্য ল্যান্ডস্কেপের মতো ছিলেন তিনি; খাটি সফেদ পবিত্রতার ও পরম সন্তোষের শান্তি ছিল তার নিঃশ্বাসে। দাদিমা এবং আমি ভালো বন্ধু ছিলাম। বাবা-মা যখন শহরে বাস করতে গেলেন তখন তারা আমাকে দাদিমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন এবং আমরা একসাথে থাকতাম। সকালে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে স্কুলের জন্যে তৈরি করে দিতেন। একঘেঁয়েমিপূর্ণ সুরে তিনি সকালের প্রার্থনা উচ্চারণ করতেন আমাকে স্নান ও কাপড় পরানোর সময় তিনি আশা করতেন যে, তার উচ্চারিত প্রার্থনা শুনে শুনে আমি মুখস্ত করে ফেলতে সক্ষম হবো। আমি শুনতাম, কারণ আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে ভালোবাসতাম, কিন্তু প্রার্থনা শিখার কথা কখনো ভাবিনি। এরপর তিনি আমার কাঠের স্লেটটা সংগ্রহ করে

আনতেন, যা তিনি আগেই ধুঁয়ে হলুদ রং এর চক দিয়ে রং করে রেখেছেন। এছাড়া মাটি দিয়ে তৈরি কালির দোয়াত এবং নলখাগড়ার কলম একসাথে বেঁধে আমার হাতে তুলে দিতেন। মোটা বাসি একটি চাপাতি সামান্য মাখন মেখে তার উপর চিনি ছড়িয়ে নাশতা খাওয়ার পর আমরা স্কুলে যেতাম। তিনি সঙ্গে বেশ ক'টি বাসি চাপাতি নিতেন গ্রামের কুকুরগুলোর জন্যে।

দাদিমা সবসময় আমার সাথে স্কুলে যেতেন, কারণ স্কুলটি ছিল গুরুদুয়ারা সংলগ্ন। পুরোহিত আমাদেরকে অক্ষর ও সকালের প্রার্থনা শিখাতেন। শিশুরা বারান্দার সারিবদ্ধভাবে বসে যখন কোরাস ধরে অক্ষর বা প্রার্থনা উচ্চারণ করতো, তখন দাদিমা গুরুদুয়ারার ভিতরে বসে গ্রন্থ পাঠ করতেন। আমাদের উভয়ের পড়া শেষ হলে আমরা একসাথে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম। এসময় গ্রামের কুকুরগুলো গুরুদুয়ারার দরজায় অপেক্ষা করতো। সেগুলো ঘেউ ঘেউ করতো এবং আমাদের নিক্ষিপ্ত চাপাতির টুকরার জন্যে কামড়া কামড়ি করতে করতে আমাদেরকে বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করতো। আমার বাবা-মা যখন শহরে মোটামুটি গুছিয়ে উঠতে সক্ষম হলেন, তখন তারা আমাদের নিতে পাঠালেন। সেটি ছিল আমার ও দাদিমার মধ্যে বন্ধুত্বের একটি সংকটকাল। যদিও আমরা দু'জন শহরের বাসায় একই রুমে থাকতাম, কিন্তু দাদিমা আমার সঙ্গে আর স্কুলে যেতেন না। আমি বাসে উঠে ইংলিশ স্কুলে যেতাম। রাস্তায় কোন কুকুর ছিল না এবং দাদিমা শহরের বাড়ির চত্বরে চড় ইপাখিদের জন্যে খাবার ছড়িয়ে দিতেন।

বছর গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাতও কমতে লাগলো। প্রথম দিকে কিছুদিন তিনি আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে স্কুলের জন্যে তৈরি করে দিতেন। স্কুল থেকে ফিরে এলে জানতে চাইতেন যে, শিক্ষক আমাকে কি শিখিয়েছে। আমি তাকে ইংরেজি শব্দ এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও শিক্ষা, আপেক্ষিক তত্ত্ব, আর্কিমিডিসের তত্ত্ব, পৃথিবী গোলাকৃতির ইত্যাদি ছোটখাট বিষয় সম্পর্কে বলতাম। ইংলিশ স্কুলের শিক্ষায় তিনি বিশ্বাস করতেন না তিনি। ইশ্বর এবং পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কিত কোন শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করতেন। একদিন আমি তাকে বললাম যে, আমাদেরকে সঙ্গীত শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। তাকে অস্থির মনে হলো। তার কাছে সঙ্গীতের সঙ্গে নিচতার সম্পর্ক আছে। সঙ্গীত শুধুমাত্র বাইজি ও ভিক্ষুকদের জন্যে এবং কিছুতেই ভদ্রলোকদের জন্য নয়। এরপর তিনি আমার সঙ্গে কমই কথাবার্তা বলতেন।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর আমাকে একটি পৃথক রুম দেয়া হলো। দাদিমার সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিন্ন সূত্রটিও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দাদিমা হাল ছেড়ে দেয়ার মতো এই বিচ্ছিন্নতাকে মেনে নিলেন। কারো সাথে কথা বলার জন্যে তিনি খুব কম সময়ই তার সূতা কাটার চরকা ছেড়ে উঠতেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি চরকার পাশে থাকতেন এবং প্রার্থনা জপতেন। শুধু বিকেলে তিনি চরকা ছেড়ে উঠতেন চড় ই পাখিদের খাবার দেয়ার জন্যে বারান্দায় বসে তিনি যখন রুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করতেন তখন শত শত ছোট পাখি জড়ো হয়ে বিচিত্র তালে কিচিরমিচির শব্দের সৃষ্টি করতো। কিছু চড় ই তার পায়ের উপর, কিছু তার কাঁধের উপর বসতো। কিছু পাখি তার মাথার উপরও বসতো। তিনি হাসতেন, কিন্তু কখনো পাখিগুলোকে সরিয়ে দিতেন না। তার জন্যে এটি ছিল দিনের সবচেয়ে সুখী অর্ধ ঘন্টা।

উচ্চতর পড়াশুনার জন্যে আমি যখন বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে দাদিমা এতে অত্যন্ত বিচলিত হবেন। আমাকে পাঁচ বছর থাকতে হবে এবং তার যে বয়স, তাতে কেউ কিছু বলতে পারে না। কিন্তু দাদিমা বললেন। এমনকি তিনি খুব আবেগপ্রবণও হলেন না। আমাকে বিদায় জানাতে অন্যান্যের সাথে তিনি রেলস্টেশন পর্যন্ত এলেন, কিন্তু কথা বললেন না অথবা কোন আবেগও দেখালেন না। প্রার্থনায় তার ঠোট নড়ছিল। তার মন প্রার্থনায় মগ্ন ছিল। তার আঙ্গুল জপমালার উপর ব্যস্তভাবে ঘুরছিল। নিরবে তিনি আমার কপালে চুম্বন করলেন এবং যখন আমি তাকে ছেড়ে এলাম, আমার কপালে আদ্রতার ছাপ, যা ছিল সম্ভবত আমাদের দু'জনের মধ্যে দৈহিক সংস্পর্শের সর্বশেষ চিহ্ন।

কিন্তু আসলে তা ছিল না। পাঁচ বছর পর আমি ফিরে এলে স্টেশনে তার সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তার বয়স যেন একদিনও বাড়েনি। তখনো তার কথা বলার সময় নেই এবং যখন তিনি আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন তখন তার প্রার্থনা উচ্চারণ করতেই শুনছিলাম। এমনকি আমার পৌছার প্রথম দিনেও তার সুখের মুহূর্ত ছিল চড় ইগুলোর সাথে, যেগুলোকে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে খাওয়ালেন।

সন্ধ্যায় তার মাঝে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তিনি তার প্রার্থনা করলেন না। পড়শী মহিলাদের জড়ো করলেন এবং একটি পুরনো ঢোল সংগ্রহ করে গান গাইতে লাগলেন। কয়েক ঘন্টা ধরে তিনি পুরনো ঢোলের কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় হাতের আঘাতে শব্দ তুলে বীরদের ঘরে ফেরার গান গাইলেন। তাকে থামানোর জন্যে আমাদেরকে হস্তক্ষেপ করতে হলো, যাতে তার উপর অধিক চাপ না পড়ে। যদ্দিন থেকে তাকে জানি তার মধ্যে শুধু সেদিনই তিনি প্রথম প্রার্থনা করেননি।

পরদিন সকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মৃদু জ্বর এবং ডাক্তার বললেন যে, জ্বর সেরে যাবে। কিন্তু আমার দাদিমা ভিন্নরকম ভেবেছিলেন। তিনি আমাদের বললেন যে, তার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি বললেন, যেহেতু তার জীবনের অধ্যায় সমাপ্ত হওয়ার আর মাত্র কয়েক ঘন্টা আছে, সেজন্যে তিনি প্রার্থনা করতে চান। আমাদের সাথে আর সময় নষ্ট করতে চান না।

আমরা প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করলেন। শান্তিপূর্ণভাবে বিছানায় শুয়ে তিনি প্রার্থনা করছিলেন আর জপমালা ঘুরাচ্ছিলেন। আমরা সন্দেহ করার আগেই তার ঠোটের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল এবং তার প্রাণহীন আঙ্গুল থেকে জপমালা পড়ে গেল। তার মুখের উপর শান্তিময় বিবর্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমরা উপলব্ধি করলাম যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা তাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে রীতি অনুসারে মেঝের উপর শুইয়ে একটি লাল কাপড় দিয়ে তার শরীর ঢেকে দিলাম। কয়েক ঘন্টা ধরে শোক প্রকাশের পর অন্তেষ্টিক্রিয়ার প্রস্তুতির জন্য আমরা তাকে একাকী ফেলে রাখলাম।

সন্ধ্যায় আমরা তার রুমে প্রবেশ করলাম তাকে দাহ করার জন্যে বয়ে নিতে একটি খাটিয়াসহ। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল এবং অস্তমান সূর্যের আভায় তার রুম এবং বারান্দা সোনালী রং ধারণ করেছে। উঠানের মাঝামাঝি এসে আমরা থামলাম। পুরো বারান্দা এবং তার রুমে যেখানে তিনি মৃত অবস্থায় লাল কাপড়ে আবৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন, সেখানে হাজার হাজার চড় ইপাখি বসে আছে। কোন কিচিরমিচির শব্দ নেই। পাখিগুলোর জন্যে আমরা দুঃখবোধ করলাম। আমার মা তাদের জন্যে কিছু রুটি সংগ্রহ করে আনলেন এবং সেগুলোকে ছোট ছোট টুকরা করলেন, ঠিক দাদিমা যেমন করতেন। এরপর সেগুলো ছিটিয়ে দিলেন। চড় ইপাখিগুলো রুটির টুকরার দিকে ভ্রুক্ষেপ করলো না। আমরা দাদিমার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার পর পাখিগুলো নিরবে উড়ে গেল। পরদিন সকালে ঝাড় দার রুটির টুকরাগুলো ঝাড় দিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিল।

ভারতীয় নারী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীকে নির্বাচিত করার ঘোষণা শুনে আমার পঁচাত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা ক্ষুব্ধভাবে বললেন, 'একজন মহিলা কি করে দেশটা চালাবে?'

পুরো পরিবার আমার বর্ষীয়ান বাবা-মা, আমার ভাইয়েরা, তাদের স্ত্রীরা এবং তাদের সন্তানরা, যাদের অধিকাংশই স্কুল ও কলেজ পড় য়া, তারা দুপুরে খেতে জড়ো হয়েছিল। আমরা যখন কফি পান করছিলাম তখনই রেডিওতে ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কিত খবরটি প্রচারিত হয়েছিল।

একজন মহিলা কি ভারতের মতো একটি দেশ চালাতে পারবে? আমার পিতা আবার প্রশ্ন করলেন রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে। সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে চান তিনি। বড়দের কেউই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো না। পনিটেল বাঁধা ও জিনস পড়া মেয়েরা হাসতে লাগলো এই ভেবে যে, বড়রা তাদের লক্ষ্য করছে না। তারা হাত মিলিয়ে ছেলেদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি নিচের দিকে দিয়ে ব্যঙ্গ করলো। ছেলেরা প্রতিশোধ নিল মেয়েগুলোর নাকের উপর চাটি মেরে। কিন্তু আমার পিতার কঠোর দৃষ্টিতে পড়ায় সহসাই তাদের হাসি ও সৌজন্য বিনিময় বন্ধ হয়ে গেল। 'দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে।' কর্তৃত্বের সুরে তিনি ঘোষণা করলেন।

পরিবার প্রধানের সঙ্গে কোনকিছু নিয়ে সরাসরি বিরোধিতা করা শোভনীয় নয়। কিন্তু বিরোধিতা করারও সূক্ষ্ম পদ্ধতি আছে। 'এ ব্যাপারে আমাদের আর কি পথ খোলা আছে?' আমার ভাইদের একজন বললেন। 'অন্য যারা আছে তাদের যে কেউ তার চাইতে ভালো হতে পারে," আমার পিতা গর্জে উঠলেন। 'তাকে ওখানে বসানো হয়েছে, তিনি নেহরুর কন্যা বলে। এটা কোন্ ধরণের গণতন্ত্র?' আমার পিতা নেহরুকে পছন্দ করেন না। কিন্তু তার যুক্তি শিগগির খন্ডন করা হলো; নেহরুর পর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন শাস্ত্রী, তার কন্যা নয়। তখন আমরা বিকল্প বিবেচনা করেছিলাম।

মোরারজি দেশাই? তিনি ছিলেন নিষিদ্ধ করার পক্ষে এবং হিন্দি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে। তিনি শক্তিশালী হলেও খেয়ালী ব্যক্তি ছিলেন। সফররত একজন অতিথিকে কি তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে গো-চোনা পানের পরামর্শ দেননি? এবং তিনি কি প্রকাশ্যে বলেননি যে, বিগত পঁচিশ বছর তিনি স্ত্রীর সাথে কোন সঙ্গম করেননি? না, মোরারজি দেশাইকে পছন্দ করা যায় না।

গুলজারী লাল নন্দা যার চারপাশে সারাক্ষণ ঘুরঘুর করতো ওইসব পবিত্র লোক ও গেরুয়া বস্ত্রধারী যোগীরা? হস্তরেখাবিদ ও গণকদের সাথে পরামর্শ না করে তিনি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। ভালো প্রশাসক এবং একজন ভালো বিকল্প গাড়ির অতিরিক্ত চাকার মতো। তারা যথার্থই তাকে বলতো অর্থিমন্ত্রী (শবাচ্ছাদনের কোনা তুলে ধরা মন্ত্রী)। দু'নম্বর হওয়ার জন্যে ভালো। প্রধানমন্ত্রী, অবশ্যই নয়!

কুমারাস্বামী কামরাজ? চমৎকার, পিতৃপুরুষ এবং ধূর্ত ও সৎ রাজনীতিবিদ। কিন্তু হিন্দি বা ইংরেজী বলতে পারেন না। সম্ভবতঃ কখনো তিনি একটি ভাষা শিখেছিলেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন? রাজনীতিবিদ এস কে পাতিল? দু'জনের কেউই এখন পর্যন্ত জাতীয় ব্যক্তিত্ব নন। কিন্তু আগামী কয়েক বছরে তারা তা হতে পারেন।

তাহলে আর কে থাকে ? ইন্দিরা গান্ধী। ততোক্ষণে আমরা ভাবতে শুরু করেছি যে, আমরা তাকে নির্বাচিত করেছি এবং ক্ষুব্ধ কিছু শুভেচ্ছা একত্রিত করা হলো: তিনি অন্যদের চাইতে বেশি শিক্ষিত এবং অনেক আধুনিক চেতনাসমৃদ্ধ। জনগণ, কোসিগিন, উইলসন এবং দ্য গলের মতো লোকদের সাথে তিনি কথা বলতে সক্ষম। তিনি জানেন যে, কিভাবে যথাযথ আচরণ করতে হয় এবং চাইলে তিনি লোকদের যখন তখন বিমুগ্ধ করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনি সুন্দরী। কেউ কি একথা বলেনি যে, অন্য কোন কারণে না হলেও প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রে একটি সুন্দর মুখ দেখার জন্যে তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাইতেন? এবং তার অত্যন্ত উপযুক্ত মধ্য নাম আছে প্রিয়দর্শিনী। তিনি ভালো প্রশাসক নন তা প্রমাণিত হয়েছে যখন তিনি তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু সে ধরণের কাজ তিনি আমলাদের উপর ছেড়ে দিতে পারেন। আমাদের আর কোন পছন্দ নেই, ইন্দিরা গান্ধীই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যথার্থ পছন্দ।

আমার পিতা অবশেষে যুক্তিগুলো মেনে নিলেন। পরাভূত হয়েও তার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, আমার কথা মনে রেখো, আমরা বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। 'কোন মহিলার পক্ষে ভারতের মতো একটি দেশ শাসন করা সম্ভব নয়।'

আমাদের পরিবার নয়াদিল্লির ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। সংখ্যার দিক থেকে ইংরেজী কেতাদুরস্ত উচ্চ শ্রেণীর আকার খুবই ছোট। কিন্তু সিনিয়র বেসামরিক আমলা, রাজনীতিবিদ এবং জনমত সৃষ্টিকারীদের অধিকাংশ এই শ্রেণীভুক্ত।

এই শ্রেণী হতেই ভারতের প্রতিটি নারী নেতৃত্বও এসেছে ঃ কবি সরোজিনী নাইডু (লাভ টু অল এন্ড এ কিস টু দি নিউ সোল অব ইন্ডিয়া, ইন্দিরার জন্ম উপলক্ষে তিনি নেহরুর কাছে লিখে পাঠিয়েছিলো) এবং তার কন্যা পদ্মশ্রী, যিনি পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ছিলেন; শিল্পী অমৃতা শেরগিল, নেহরু মন্ত্রিসভার প্রথম মহিলা মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর, পরিবার পরিকল্পনা নীতি বিশারদ ধনবন্তী রামা রাও এবং তার কন্যা লেখিকা শান্তা রামা রাও; জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম এবং একমাত্র মহিলা সভাপতি মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত এবং তার ঔপন্যাসিক কন্যা নয়নতারা, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালিনী, অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফটস বোর্ডের চেয়ারম্যান কমলাদেবী চট্টোপধ্যায়, লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত সুন্দরী মহারানী ও বেগমরা।

শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্য থেকে ভারতে নারী নেতৃত্বের এধরণের বিকাশের দৃষ্টান্ত নেই। মহিলাদের কোন সম্মেলনে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, ভাসার এবং স্মিথের উচ্চারণে ইংরেজী এবং ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের পরিচালিত স্কুলছাত্রীদের ইংরেজি গান সুনির্দিষ্টভাবে শোনা যাবে। নারীদের সমানাধিকার প্রদানের ফলে পুরুষদের মতো সামাজিক ও শিক্ষাগত সমতা অর্জন অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক মহিলাকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত করার ক্ষেত্রে সুফল ফলিয়েছে, বিশেষ করে যারা সুযোগসন্ধানী তাদের ক্ষেত্রে।

লোকসভার দর্শক গ্যালারি নতুন ক্ষমতাসীন শ্রেণীকে পাখির দৃষ্টির মতো এক পলক দেখার চমৎকার স্থান। একবার আমি সেখানে গিয়ে পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। যেখানে পুরুষরা নির্বাচিত হয়ে এসেছে সকল শ্রেণী হতেঃ ধোপদুরস্ত পোশাক পরা অভিজাত, ধূতি পরা ব্যবসায়ী, কলার বিস্তার করে রাখা শ্রমিক নেতা, এলোমেলো পোশাকের উপজাতীয় লোকজন, যারা আসনে পা আড়াআড়ি করে বসে, এর মধ্যে মহিলারা সবাই ছিল সুন্দর পোশাকে সজ্জিতা (আমি চল্লিশ জন গুণেছিলাম) ছিলেন। তাতে এটা স্পষ্ট ছিল যে, তারা ভারতীয় সমাজের উচ্চ শ্রেণী হতে আগত।

কিছু মহিলা সরকারি দলে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পাশাপাশি ছিলেন ঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. সুশীলা নায়ার, পররাষ্ট্র বিষয়ক উপমন্ত্রী মিসেস লক্ষ্মী মেনন, অর্থ বিষয়ক উপমন্ত্রী সুন্দরী তারেকশ্বরী সিনহা, যার কুচকুচে কালো চুলের গোছা গালের উপর দুলছিল। (একজন আমেরিকান সিনেটরকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'আপনার মতো সুন্দরী অর্থ উপমন্ত্রী আমি আর দেখিনি।')

বিরোধী দলীয় লোকসভা সদস্যদের মধ্যে মহিলা ছিলেন জয়পুরের মহারানী গায়ত্রী দেবী, যিনি রক্ষণশীল স্বতন্ত্র পার্টির সদস্য। সেই মুহূর্তে তিনি নেহরুর পররাষ্ট্র নীতির বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের রাজনীতিতে যোগদান উৎসাহিত করলেও তার নিজের ফাঁদে নিজেই আটকা পড়েছেন। কিছুটা রেগে তিনি বললেন; একজন মহিলার সঙ্গে আমি কথা কাটাকাটি করবো না।'

সেদিন আমি আরো দু'বার মহারানীকে দেখেছি; প্রথমে শান্তিবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের দেয়া এক পার্টিতে, যিনি ভারত থেকে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধরত নাগা বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে অনানুষ্ঠনিকভাবে ব্রিফিং দিচ্ছিলেন। মহারানী এলে ব্রিফিং শুরু হলো। তার প্রবেশের সাথে সাথে দামি ফরাসী পারফিউমের সুগন্ধ সবার নাকে লাগলো। উজ্জ্বল নীলকান্ত মনির মতো সিফন শাড়ি পরেছিলেন তিনি এবং শাড়ির রূপালি আঁচল চাঁদবিহীন রাতের তারকার মতো জ্বলজ্বল করছিল। তার টানা বড় বড় চোখে চারদিকে তাকালেন। সবাই উঠে দাঁড়ালো। ঠিক হিলারী বেলক যেভাবে একজনকে বর্ণনা করেছিলেন, 'সবগুলো তরবারি খোলার পর রাজার আদেশের মতো উজ্জ্বল তার মুখ।"

মহারানী তার বিলম্বের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, মুখে উপর থেকে চুল সরিয়ে নিয়ে সবাইকে বসতে বললেন এবং রাজকীয় ভঙ্গিতে কার্পেটের উপর বসলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ মন্তব্য করলেন, সত্যিই এটা একটি বিপ্লব ঘটেছে যে, স্বয়ং মহারানী সাধারণ মানুষের পদতলে বসেছেন।' মধুর হাসি দিয়ে মহারানী উত্তর দিলেন। হ্যান্ডব্যাগ থেকে সোনার কেস বের করে একটি নীলাভ সিগারেট ধরালেন।

ব্রিফিং শেষে তিনি নিখুঁত ইংরেজীতে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি যখন রুমে কিছু লোকের সাথে হিন্দিতে কথা বলছিলেন, সে হিন্দি তেমন ভালো ছিল না। তিনি ব্যাখ্যা করেন, 'আমার মাতৃভাষা বাংলা এবং এক রাজপুতকে বিয়ে করেছি আমি।' আমার পাশে বসা একজন ফিসফিস করে বললেন, 'তার বাংলা ও রাজস্থানী হিন্দির চাইতে খারাপ। তিনি শুধু ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারেন।

জিমখানা ক্লাবে এক ড্যান্স পার্টিতে সেদিন সন্ধ্যায় আবার তাকে দেখলাম। তিনি তার স্বামী ও পুত্রের সাথে ছিলেন। প্রিন্সের পরনে সামরিক ইউনিফর্ম এবং পিতার দেয়া পার্টিতে কিছু সময় অতিবাহিত করলেন। মহারাজা ও মহারানী তাদের টেবিলে কাটালেন ফরাসী শ্যাম্পেন পান করে। মহারাজা কোন বিলে স্বাক্ষর করলেন না; তাদের সাবেক প্রজা ও ভক্তদের পক্ষ থেকে এ পার্টি উপহারস্বরূপ ছিল।

গায়ত্রী দেবী নিজের অধিকার বলেই একজন প্রিন্সেস ছিলেন। তিনি কুচবিহারের রাজার কন্যা; যেখানকার লোকজন কড়া মদ পানের জন্যে এবং সুন্দরী রাজকন্যা জন্ম দেয়ার জন্যে বিখ্যাত। গায়ত্রী দেবীকে যখন জয়পুরের মহারাজার সাথে বিয়ে দেয়া হয়, তখন তার দুই স্ত্রী এবং তাদের সন্তানরা ছিলেন। উপযুক্তভাবে শিক্ষিত এবং মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মহারাজার তৃতীয় স্ত্রী হতে সম্মত হলেন। কারণ রাজন্যদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। এখন পর্যন্ত বহু প্রিন্সের অনেক স্ত্রী আছে। হায়দরাবাদের মরহুম নিজামরা কয়েকশ' বেগম ও রক্ষিতা রাখতেন তাদের হারেমে।

ক্ষমতাসীনরা যখন রাজন্যদের নিকট থেকে তাদের ভূসম্পত্তির বিপুল অংশ বাজেয়াপ্ত করে তাদের সম্মানজনকভাবে বাঁচার মতো সম্পত্তি রাখার অধিকার দেয়, তখন বহু প্রিন্স ব্যবসা শুরু করেন। জয়পুরের মহারাজা তখনো প্রভূত সম্পদশালী ছিলেন; তিনি তাদের প্রাসাদগুলোর একটিকে হোটেলে রূপান্তরিত করেন এবং বিত্তবান আমেরিকানদের জন্যে বাঘ শিকারের আয়োজন শুরু করেন। গায়ত্রী দেবী স্বতন্ত্র পার্টিতে যোগ দিয়ে নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে নেহরু সরকারের জন্যে একটি কন্টকে পরিণত হন। শাস্ত্রী বিজ্ঞতার সঙ্গে তার স্বামীকে স্পেনের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেন পরবর্তী নির্বাচনে গায়ত্রী দেবীর কাছ থেকে রক্ষা পাবার আশায়। কিন্তু মহারানী তাতে পিছু হটেননি। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় রাজ্য রাজস্থানের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মহিলা নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন।

ভারতের শহর এবং সাড়ে পাঁচ লাখ গ্রামের মধ্যে, এবং লোকসভা আলোকিত করে রাখা অভিজাত, শিক্ষিত মহিলা ও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে অনেক শতাব্দীর ব্যবধান। সময়ের ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এসব মহিলার জীবনধারায় কোন

পরিবর্তন ঘটেনি। যাদের মা ও দাদিমারা সবসময় নির্দিষ্ট মাত্রার স্বাধীনতা ভোগ করতেন, এখনো তারাই সে স্বাধীনতা ভোগ করেন। দক্ষিণ ভারতের মহিলারা, যেমন, কেরালার মহিলারা ভারতের অন্যসব অঞ্চলের চাইতে অনেক অগ্রসর। কারণ সেখানে আঞ্চলিক মাতৃতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রাধান্য পেয়েছে। সাধারণভাবে সমাজের নিম্নশ্রেণী ও নিচু আয়ের মহিলারা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের চাইতে অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে। অতীতেও তারা একই রকম ছিল। এবং যাদের মহিলা পূর্বসুরীরা অন্তপুরে অবরুদ্ধ ছিল, এখনো তারা অন্তপুরেই অবরুদ্ধ হয়ে আছে। যদিও ১৯৪৯ সালের সাংবিধানিক আইনে মহিলাদের আইনগত সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে, তবু এখনো তারা আইন বহির্ভূত বিধিনিষেধের বেড়াজালে নিপীড়িত হচ্ছে।

তবু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় মহিলা সবসময় কঠোরতা ও নিপীড়নের মধ্যে কাটিয়েছেন এমন বলা যাবে না। এবং আর্যদের আগমণ পূর্ব সময়ে আমাদের মহিলা পূর্বসুরীরা যে স্বাধীনতা ভোগ করতেন তা এখনকার অগ্রসর মহিলাদেরকেও হার মানাবে। তারা কোমরের উপরে কিছু পরিধান করতো না এবং কোমরের নিচ থেকেই বস্ত্রহীন থাকতো। তারা কড়া মদপান করতো, সকাল পর্যন্ত নৃত্য করতো এবং যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। একজন মহিলা কর্তৃক চার পাঁচজন স্বামী রাখা খুব সাধারণ ব্যাপার; পুরুষদের হারেম ছিল অজ্ঞাত। তারা সম্পত্তির মালিক হতো, কারণ সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। বর্তমানে ভারতে এই হতদরিদ্র, অশিক্ষিত, জঙ্গলবাসী আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কেটি। তাদের জীবনধারার নমুনা এখনো উত্তর-পূর্বদিকে আসাম থেকে শুরু করে দক্ষিণে কেপ কমোরিন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার অনেক পার্বত্য উপজাতির মধ্যে এবং দক্ষিণের দ্রাবিড়দের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

আর্যরা ভারতে আসতে শুরু করেছিল খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার সাল হতে এবং তারাই প্রথমে এই জীবনধারা গ্রহণ করে। তাদের সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারতে দেখা যায়, এক রাজা তার রানীকে গর্ভবতী করতে ব্যর্থ হয়ে প্রাচীন রীতি অনুসারে তাকে অন্য পুরুষদের বীর্য গ্রহণের জন্যে তাকে পীড়াপীড়ি করেনঃ 'প্রাচীনকালে মহিলারা তাদের নিজ বাড়িতে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতো না, অথবা তাদের স্বামীদের উপর নির্ভরশীল ছিল না। সেজন্যে তাদের পাপীও বিবেচনা করা হতো না। কারণ যুগই এই রীতির অনুমোদন দিয়েছিল।'

এ অবস্থায় পিতৃত্বের ধারনার গুরুত্ব ছিল সামান্য, পিতৃ পরিচয়হীন অবস্থা নিন্দনীয় ছিল না। আতিথেয়তার অংশ ছিল কোন সম্মানিত অতিথির শয্যায় হাজির হওয়া। ঋগবেদের সময় পর্যন্ত (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সাল) এই স্বাধীনতা অব্যাহত ছিল। ঋগবেদে মহিলাদের পুরুষের সমতুল্য, যুক্তিতর্কে অংশগ্রহণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন এবং মদ ও মাংস উপভোগের সমান অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপরই মহিলাদের মর্যাদায় পরিবর্তন আসে। প্রথমে বহু স্বামীর সঙ্গে যৌনমিলন নিষিদ্ধ করা হয়। ঋষি উদ্দালাকা সোয়েতাকেতু ঘোষণা করেন; 'একজন মহিলা শুধুমাত্র একজন পুরুষের সাথেই দৈহিক সম্পর্ক রাখতে পারে... যদি কোন মহিলা তার স্বামীর

প্রতি অবিশ্বাসী হয়, তাহলে আজ থেকে তা হবে পাপ।'

এরপর থেকে মহিলাদের নামিয়ে দেয়া হয় শুধু সন্তান উৎপাদনকারীর পর্যায়ে-ঠিক একখণ্ড জমি যেভাবে ফসল উৎপাদন করে। সে যদি পুত্র সন্তান প্রসব করে তাহলে তাকে আংশিক মর্যাদার অধিকারী মনে করা হয়, কিন্তু কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে তাকে আইনগতভাবেই একপাশে অপসারণ করে তার কন্যাসন্তানদের আগাছার মতো ধ্বংস করে দেয়া হয়। মহিলারা অপরিচ্ছন্ন (অথর্ব বেদ অনুসারে একজন মহিলার নাভির নিচ থেকে সবসময় অপরিচ্ছন্ন) এবং ভালো মানুষদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার ক্ষেত্রে শয়তানের যন্ত্রবিশেষ। মৈত্রেয়ানী সংহিতা অনুসারে 'মহিলারা প্রধান সামাজিক ক্ষত, তাদের চেতনা অবিশ্বস্ত এবং অন্ধকারের অশরীরী আত্মা।'

নারীদের হীন মর্যাদার জন্যে মুখ্যত দায়ী বিখ্যাত আইনদাতা মনু, যাকে হিন্দুদের জাতিভেদ বা বর্ণপ্রথার পিতাও বলা যায়, যিনি খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ সালের দিকে জীবিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'নারী তার ছলনার মতোই নোংরা অপবিত্র। নারীকে সৃষ্টির সময় সৃষ্টিকর্তা নারীর জন্যে প্রেমের শয্যা, একটি আসন ও অলংকার; অপবিত্র চিন্তাভাবনা, ক্রোধ, অসততা এবং মন্দ স্বভাব বরাদ্দ করে দিয়েছেন।' মনু নারীর জীবনের মধ্যম ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত একজন নারী পুরুষের উপর নির্ভরশীল। শৈশবে তার পিতার উপর, যৌবনে স্বামীর উপর এবং বার্ধক্যে পুত্রের উপর।'

মনু নারীর বাল্য বিবাহের বিধানও দিয়েছেন 'আট থেকে দশ বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, এবং যুবতি কন্যা বাবা-মা'র ঘরে অবিবাহিত অবস্থায় থাকলে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, বিবাহিতা নারীর কোন সম্পত্তি থাকতে পারবে না। তিন ব্যক্তি-একজন স্ত্রী, একটি পুত্র ও একজন ক্রীতদাসের নিজস্ব সম্পত্তি থাকবে না। তাদের উপর যাদের মালিকানা সম্পত্তির অধিকার তাদেরই।

স্বামীকে দেবতুল্য করে তোলার জন্যেও মনুই দায়ী। 'স্বামী মাতাল, লম্পট, বিপথগামী অথবা বহু স্ত্রীরক্ষক হলেও স্বামীকে ভগবানের মতো পূজা করতে হবে' মর্মে মনু নির্দেশ দিয়েছেন। স্বামীর দেবতুল্য মর্যাদার ধারনা টিকে থাকে। 'জন্ম থেকে স্বামীর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা নিয়ে বড় হয়ে স্ত্রী স্বামীকে ফুল, অলংকার এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্তু দিয়ে পূজা করে। স্বামীকে সবসময় কল্পনা করে 'এই হচ্ছে প্রেমের দেবতা।' ধর্মীয় বিধান এভাবেই বলেছে।

সতীদাহ–অর্থাৎ বিধবাকে তার মৃত স্বামীর চিতায় জ্বালিয়ে দেয়ার বিধান ছিল নারীর মর্যাদাকে আরো হীন করার অধোগামী ব্যবস্থা। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধ বাল্য বিবাহ ও সতীদাহ প্রথাকে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু এরপরও ভারতীয় নারীদের দুর্দশার অবসান ঘটেনি। বৌদ্ধদের কৌমার্য অবলম্বনের উপর গুরুত্বদানের ফলে মহিলারা ভালো মানুষগুলোকে প্রলুব্ধ করতে উদ্যোগী হয়। বুদ্ধ তার ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন,

'নারীকে দেখো না।'

'কিন্তু কোন নারী যদি আমাদের সামনে পড়ে যায়, তাহলে আমরা কি করবো?' তার প্রধান অনুসারী জানতে চান।

"তাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকো।'

'কিন্তু তারা যদি আমাদের সাথে কথা বলে, তখন আমরা কি করবো?'

অনুসারী আবার জানতে চায়।

'তাহলে সতর্ক থাকো,' বিজ্ঞ একজন তাকে সতর্ক করে।

খ্রিষ্টযুগ শুরু হওয়ার পর কন্যা সন্তান জন্মের পর মেরে ফেলাই রীতি হিসেবে চালু হয়। বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বেশ্যাবৃত্তি, যুদ্ধে পরাজিত হলে মৃত সৈনিকদের বিধবা স্ত্রীদের হত্যা করাও সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়। কিন্তু ধর্মে এসব বিধান তো আগে থেকেই ছিল।

কিন্তু এর চাইতেও শোচনীয় পরিণতি অপেক্ষা করছিল। এক হাজার খ্রিষ্টাব্দের দিকে মুসলমানরা হিন্দুস্থানে অভিযান শুরু করে এবং পরবর্তী সাতশ' বছর এদেশের বিশাল অংশের উপর তাদের আধিপত্য চালিয়ে যায়। যদিও ইসলামী আইনে একজন মহিলার সম্পত্তির অধিকার এবং স্বামীকে তালাক দেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে, কিন্তু যেসব হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তারা তাদের নিজস্ব রীতি প্রথাই অনুসরণ করাকে প্রাধান্য দেয়। সম্পত্তির মালিকানা এবং তালাক দেয়ার অধিকার পুরুষদের মর্জির উপরই রয়ে যায়। মুসলমানরা পর্দা প্রথাও চালু করে হারেমে অবস্থান এবং অবগুণ্ঠন দেয়া। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা মুসলিম শাসক ও অভিজাতদের অনুসরণ করে মহিলাদের হারেম বা জেনানার ব্যবস্থা করে।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা বিধবাদের ঘৃণ্য বিবেচনা করতো। তাদের মাথার চুল কামিয়ে ফেলা হতো, কোন অলংকার পরিধান করতে দেয়া হতো না ; তারা শুধু সাদা শাড়ি পরার অনুমতি পেত। এমনকি বিধবা দেখলে দুর্ভাগ্যের কারণ বিবেচনা করা হতো। বিধবাদের বাধ্য করা হতো ভিক্ষাবৃত্তি অথবা বেশ্যালয়ে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করতে অথবা মন্দিরে পাঠিয়ে দেয়া হতো দেবদাসী হিসেবে ভগবানের সেবা করতে। এখনো হিন্দিতে বিধবা এবং বেশ্যা শব্দের অর্থ এক 'রান্ড'।

বৃটিশ শাসন কায়েমের পর নারীদের অবস্থানের উন্নততর পরিবর্তন আসে। শিক্ষিত ভারতীয়দের ক্ষুদ্র একটি অংশ গোঁড়া হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সংস্কারকে সমর্থন করে। ১৮২৯ সালে ভাইসরয় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। তার প্রধান সমর্থক ছিলেন রামমোহন রায়, যিনি তার আপন ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় জ্বলে মৃত্যুবরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিধবাদের পুনঃবিবাহের বিষয় আইনসম্মত করা হয় ১৮৫৬ সালে এবং আরো পরে ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা হয়।

মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় ১৯২০ এর দশক থেকে এই পরিবর্তনগুলো আসতে থাকে। হাজার হাজার মহিলা, যাদের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীও ছিলেন, তারা প্রতিরোধ

আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নারী শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। অ্যানি বেসান্ত এবং মার্গারেট কাজিনস বহু নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলোর মধ্যে অল ইন্ডিয়া উইম্যানস কনফারেন্স এবং ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইম্যান এখনো সক্রিয়।

নেহরু নারী মুক্তির প্রক্রিয়াকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসন সংখ্যাগারিষ্ট হিন্দু প্রতিবন্ধকতার প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে। অন্য যে কারো চাইতে ১৯৪৯ সালের সাংবিধানিক আইনে 'রাষ্ট্র তার কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য করবে না' মর্মে গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। ১৯৫৫ সালে ভারতে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় এবং দু'হাজার বছর পর হিন্দু নারীদের জন্যে স্বামীদের তালাক দেয়ার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৬ সালে সম্পত্তির উপর হিন্দু নারীদের সমানাধিকার দেয়া হয়।

নেহরু নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পদচারনার উপরও জোর দিয়েছিলেন। তিনি আইন করে প্রত্যেক গ্রাম পরিষদে কমপক্ষে একজন নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছিলেন। কংগ্রেস পার্টি এবং কংগ্রেসকে অনুসরণ করে অন্যান্য বিরোধী দলও নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীতার ক্ষেত্রে কোটা স্থির করেছিল। বিগত সাধারণ নির্বাচনে ১০ কোটি মহিলা ভোটারের মধ্যে ৪০ শতাংশ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিল। বর্তমানে ভারতের পার্লামেন্টে মহিলা সদস্য সংখ্যা ঊনষাট জন (মার্কিন কংগ্রেসে মহিলা প্রতিনিধি মাত্র বার জন) এবং রাজ্য বিধান সভাগুলোতে মহিলা সদস্য সংখ্যা ১৯৫ জন।

বিশ্বের অন্য যেকোন দেশের চাইতে ভারতে অধিক সংখ্যক মহিলা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। কিন্তু এর দ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভুল হবে যে, ভারতের মহিলারা অন্য দেশের চাইতে অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে। সমাজের উচ্চস্তর ছাড়া মহিলাদের ভাগ্যের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এখনো ভারতীয় মহিলা জনসংখ্যার দশ শতাংশের কম সংখ্যক পড়তে বা লিখতে পারে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্সি মহিলাদের জীবনযাত্রা ইউরোপীয়দের মতোই। খ্রিষ্টান (প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ) এবং শিখদের (প্রায় ১ কোটি) মধ্যে মহিলা বিদ্বেষমূলক কোন প্রথা নেই। এই দুই সম্প্রদায়ের মহিলারা হিন্দু মহিলাদের চাইতে শিক্ষিতা নার্সিং এবং শিক্ষকতার মতো পেশায় তাদের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্যণীয়। ভারতের ৫ কোটি মুসলিমের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দু প্রতিপক্ষের চাইতে তাদের দুর্দশা অত্যন্ত শোচনীয়। ভারতের কেন্দ্রস্থলে ভূপাল হিন্দু অধ্যুষিত একটি রাজ্যের মুসলিম প্রধান শহর। এখানকার অনেক স্বচ্ছল মুসলিম পরিবার যেহেতু দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে চলে গেছে, ফলে যারা রয়ে গিয়েছে তারা হতদরিদ্র এবং নিগৃহীত। ভূপালের রাস্তা ভিক্ষুকে পূর্ণ। কুষ্ঠরোগীরা লোকদের গায়ে হাত দিয়ে ভিক্ষা চাইছে, 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে কিছু দিন।' মহিলারা আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা, শুধু চোখের জায়গায় দু'টি গর্ত কাটা। তারা নাকি সুরে বলছে, "আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিছু দিন।' বেশ্যার দালালেরা, যাদের মাথায় দীর্ঘ চুল ও চোখের সুরমা দেয়া–তারা আপনার কানের কাছে মুখ এনে

বিড় বিড় করবে, 'সাহেব কি কাউকে খুঁজছেন? আমি পনের টাকার বিনিময়ে পনের বছরের মেয়ে জোগাড় করে দিয়ে পারি।'

ভিক্ষুক ও বেশ্যার দালালদের ভিড় ঠেলে আমি চার ফুট প্রশস্ত গলি দিয়ে এগিয়ে যাই। উর্দু এবং ইংরেজিতে "লুৎফুন্নেসা বেগম দাই; ধাত্রী এবং নার্স' লিখা নেমপ্লেট দেখে কড়া নাড়ি। দরজার পিছন থেকে একটি বালিকার কণ্ঠ জানতে চায়' 'কে?' সে দরজা খুলে আবার আমার মুখের উপরই বন্ধ করে দেয়। 'আম্মা নামাজ পড়ছেন...একজন শিখ এসেছে,' সে তার মাকে সর্তক করে।

সেই বাড়ির ছোট্ট আঙ্গিনায় আমাকে প্রবেশ করতে দেয়ার আগে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। এক পাশে সার করে রাখা মাটির কয়েকটি কলসি, অন্য পাশে চটের পর্দা ঝুলিয়ে রাখায় বুঝা যাচ্ছে সেটি পায়খানা, আঙ্গিনার কেন্দ্রস্থলে একটি খাটিয়া যার উপর দাই বসা, সে আমাকে চিনতে পারলো। তিন মাস আগে সে আমার বাবুর্চির স্ত্রীকে প্রসব করিয়েছিল, এবং আমি তাকে তার কাজের জন্যে দশ টাকা দিয়েছিলাম।

'সালাম আলায়কুম, সরদারজি, বাচ্চাটি কেমন আছে?' সে জানতে চায়।

'সে ভালো আছে? তুমি আর তোমার মেয়ে কেমন আছো ?'

'আল্লাহর শোকর বলে সে উপরের দিকে দু'হাত তুললো।

'বেটি, সরদারজির জন্যে পান নিয়ে আয়।' তার মেয়ে ঘরের ভিতরে যায় এবং ক্ষুদ্র ভ্রাম্যমান তাবুর মতো পুনরায় বের হয়ে হয়ে আসে চোখের সামনে দু'টি গর্তসহ।

ভারতীয় দারিদ্রের মান অনুসারে লুৎফুন্নিসা দরিদ্র নয়। সে মাসে ১২০ টাকা কামায়। দু'বার তার তালাক হয়েছে, প্রথম স্বামী তালাক দিয়েছে কয়েক দফা গর্ভপাতের পর কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়ায়; আর দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়েছে তার কোন সন্তান না হওয়ায় এবং লোকটি আরেক বিয়ে করায় সেই স্ত্রী সন্তানের জন্ম দিয়েছে। লুৎফুন্নিসা কয়েক বছর স্বামীর ঘরে সতীন হিসেবে ছিল। এরপর ছোট স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে স্বামী লুৎফুন্নিসাকে তালাক দেয়। লোকটি তাকে শুধু তিনবার বলেছে, 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম।' অতএব বিচ্ছেদ অনিবার্য। সে বললো, 'রাসুলুল্লাহ (সাঃ) পুরুষদের অধিকার দিয়েছেন তিন স্ত্রী রাখতে এবং যাকে খুশি তাকে তালাক দিতে। আমি এ ব্যাপারে প্রশ্ন বা অভিযোগ করার কে? তাছাড়া আমার দুই স্বামীর কাছ থেকেই আমি মোহরানার টাকা পেয়েছি- ৭৫০ টাকা, যা দিয়ে মাথা গোঁজার জন্যে জায়গাটা কিনতে পেরেছি; ক্লান্ত হাসির সাথে তার পানরঞ্জিত দাঁতগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। 'এখন আমার একটাই চিন্তা, আমার মেয়েটাকে নিয়ে। আপনি তো জানেন, ওর বয়স প্রায় তের বছর। ওর জন্যে একটা স্বামী খুঁজে পেলে আমি শান্তিতে মরতে পারি।'

'তোমার সামনেও তো অনেকগুলো সুখের বছর পরে আছে। তুমি তো এমন বুড়ো হওনি যে, আরেকজন স্বামীর ঘরে যেতে পারবে না।'

'তওবা, তওবা! বেহেশ্‌ত আমার জন্যে হারাম হয়ে যাক।' সে উত্তর দিল। 'আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন! আমার মতো বুড়িকে কে বিয়ে করবে? আমার পাকা চুল দেখুন! সে তার চোখের সামনে এক গোছা পাকা চুল টেনে আনে এবং খুশি হয় যে, একটি চুলও

সাদা হয়নি।

'তোমার মেয়েকে স্কুলে পাঠাও না কেন?'

'পড়াশুনা করে সে কি করবে? আমার কি কোন শিক্ষা ছিল? আমার মা এবং দাদিমা কি কখনো স্কুলে গেছেন? পড়াশুনা মেয়েদের মাথা বিগড়ে দেয়। তখন তারা সিনেমা দেখতে যেতে চায়, ফ্যাশন করতে শিখে, রোজ, লিপস্টিক লাগায়, অচেনা লোকদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলে। না, না, সরদারজি, যেমন আছি, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। আমার মেয়ে রান্না করতে পারে, সেলাই জানে। সে নামাজ আদায় করে, কোরআন তেলাওয়াত করে। এছাড়া আর কি প্রয়োজন?

'আচ্ছা, তুমি নার্সের পেশায় কি করে এলে?'

'ওহ, এই কথা। আমার চাচি একজন দাই ছিলেন এবং মাঝে মাঝে আমি তার সাথে যেতাম। এরপর আমি কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে কিছু বিষয় শিখেছি। এই যেমন, এন্টিসেপটিক ব্যবহার, হাত পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি। আমার হাতে খুব বেশি দুর্ঘটনা ঘটেনি। লোকজন সবসময় আমার কাছে আসে। অনেকে আমাকে সাড়ে সাত টাকা দেয়, কেউ এক খিলি পান ছাড়া আর কিছুই দেয় না। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে পেট ভরে খাওয়ার মতো অবস্থা দিয়েছেন।'

শিক্ষার ব্যাপারে যুক্তি এখানেই শেষ হয়। তার কন্যা জাহানারা বোরখা পরা আরেক মহিলাকে নিয়ে আসে। দাইকে সম্বোধন করে আগন্তুক মহিলা বলে, 'আম্মার প্রসব বেদনা উঠেছে। আপনার সরঞ্জাম নিয়ে চলুন।'

লুৎফুন্নিসা তার ব্যাগ তুলে নেয়। এয়ার ইন্ডিয়ার কাঁধে ঝুলানো একটি ব্যাগ, গোঁফধারী মহারাজার ছবি আঁকা। রাজকীয় ভঙ্গিতে অবনত। সে বোরখা পরে আমাকে ডাকলো তার সামনে যাওয়ার জন্যে। আমরা গলিতে পা রাখলাম। সে দরজার চেন তুলে দিয়ে বড় একটি লোহার তালা আটকে দিল। 'বেটি, ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দাও।' দরজার পিছন থেকে ছিটকিনি লাগানোর শব্দ শুনলাম। 'সরদারজি, আমরা খুব খারাপ সময় কাটাচ্ছি। কাউকে আর বিশ্বাস করা যায় না। অচেনা লোকদের তো নয়ই, আপনজনদেরকেও নয়।'

তার তের বছর বয়স্কা জাহানারা ভিতর ও বাহির থেকে তালাবদ্ধ। ভারতে মুসলিম নারী সমাজের মুক্তির প্রতীকি অবস্থা বলা যেতে পারে। তাদের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে আরো সময় লাগবে। হিন্দুদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পর্কের ধরন ব্যাপকভাবে ভিন্নতর ধর্ম ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের কারণে। দাক্ষিণাত্যে বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সেখানকার হিন্দু মহিলারা তাদের স্বামীদের বয়স্ক কোন আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের সময় মুখের উপর ওড়না দিয়ে ঢেকে নেয়। একজন স্বামী পথ চলার সময় তার স্বামীর কয়েক গজ পিছনে থেকে অনুসরণ করে, কখনো স্বামীর পাশাপাশি নয়। স্বামীর সাথে স্ত্রী কখনো একই খাটিয়ায় বসে না, মেঝের উপর বসে। স্বামীর সাথে খায় না, স্বামীর খাওয়া শেষ হলেই কেবল স্ত্রী খায়। হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় অদ্ভুত রীতি সংরক্ষণ করে আছে। দিল্লির পশ্চিমে মরুবাসী ক্ষুদ্র

একটি গোষ্ঠী 'বিশনোই' এর পুরুষরা তাদের গোষ্ঠীর সবচেয়ে সক্ষম পুরুষকে গামা শাহের ষাড় হিসেবে চিহ্নিত করে। গামা শাহ তাদের কল্পিত মহাপুরুষ। সেই ষাড় বিশনোই সম্প্রদায়ের বন্ধ্যা মহিলাদের গর্ভসঞ্চারের জন্যে দায়িত্ব পালন করে থাকে। পুরুষরা যখন কাজ করতে মাঠে চলে যায়, গামা শাহের ষাড় তখন বন্ধ্যা নারীদের অথবা অক্ষম পুরুষদের বাড়িতে প্রবেশ করে। সে তার পাদুকা ঘরের চৌকাঠে রাখে, যার অর্থ গৃহকর্ত্রী গামা শাহের ষাড়ের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য লোকজনেরও নিজস্ব পদ্ধতি আছে। তারা তাদের কন্যাদের বোঝা হিসেবে বিবেচনা করে না, কারণ তাদেরকে সমতলের লোকদের মতো বিপুল যৌতুক দিতে হয় না। বরং আগ্রহী বরকেই কনের পিতাকে অনেক ক্ষেত্রে কনের জন্য পন পরিশোধ করতে হয়। কবীরপন্থীদের মতো দরিদ্র এবং নিচু শ্রেণীর অস্পৃশ্যদের মধ্যে কনের মূল্য পরিশোধ খুব সাধারণ ব্যাপার।

হিমালয়ের পাদদেশে কাসুলি নামে ছোট্ট শহরে চৌদ্দ বছর আগে আমার স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে যে বাড়ি পেয়েছিল সে বাড়িতে আমরা একটি কবীরপন্থী পরিবারও পেয়েছিলাম। বাড়ির কেয়ারটেকার চাজ্জু রাম এবং তার স্ত্রী কমলার বয়স বিশের কোঠায় এবং তাদের একটি মাত্র সন্তান। কিন্তু প্রতিবছর বসন্তকালে যখন আমরা কাসুলিতে যেতাম তখন কমলাকে গর্ভবর্তী অবস্থায় দেখতাম। চাজ্জু রাম লাজুক ভঙ্গিতে আমার কাছে স্বীকার করেছে যে, 'এখানে শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডা এবং গায়ে দেয়ার জন্যে আমাদের একটি মাত্র লেপ আছে।' আমি তাদেরকে আরেকটি লেপ দিলাম শীত নিবারণের জন্যে। কিন্তু তাতে কমলার গর্ভধারণ বন্ধ হয়নি।

এখন তাদের সাতটি সন্তান—পাঁচটি কন্যা, দু'টি ছেলে। কমলা তার গর্ভপাত হয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং জন্মের সময় যেসব শিশুর মৃত্যু ঘটেছে তাদের কথা স্মরণ করতে পারে না। আমার স্ত্রী তাকে প্রশ্ন করলে সে শুধু বলে যে, 'আমি তাকে আর কি দিতে পারি? এটা তো একজন স্ত্রীর কর্তব্য। আমি মানা করলে সে অন্য কোন মেয়ে মানুষের কাছে যেতে পারে।'

যখন বড় দু'টি মেয়ের বয়স চার ও দু'বছর; তখন তাদেরকে অন্য পরিবারের দুই ভাই এর বাগদত্তা করলো। চাজ্জু রাম দু'কন্যার প্রত্যেকের জন্যে দু'শ পঁচিশ টাকা করে পেল এবং সে টাকা দিয়ে মহিষ কিনলো।

হিমাচলের কবীরপন্থী এবং আরো অনেক হিন্দু উপজাতিদের মধ্যে বিয়ের মিলন সম্পন্ন হয় বর ও কনে উভয়ের বয়োপ্রাপ্তির পর। কিন্তু চাজ্জু রামের দু'কন্যার কোনটারই তাদের জন্যে পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়নি। বয়োপ্রাপ্তির পর দেখা গেল দু'পাত্রই বেঁটে। অভিভাবকদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে বিয়ে ভেঙ্গে গেল। চাজ্জুরাম কনে মূল্য ফিরিয়ে দিল। ইতোমধ্যে মহিষের অনেক বাছুর হয়েছে এবং প্রতি মাসে দুধ বিক্রি করে সে দেড়শ' টাকা করে কামাচ্ছিল।

দু'টি মেয়েকেই দ্বিতীয়বার বিয়ে দেয়া হলো। একজনকে জনৈক বৃদ্ধের কাছে, যে বৃদ্ধ তার বন্ধ্যা স্ত্রীকে পিত্রালয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং আরেকজনকে একটি অফিসে চাকুরিরত এক তরুণ পিয়নের সাথে। এসব বিয়েতে কোন কিছুই লিখিত

আকারে ছিল না। বিয়ে অথবা তালাকের ক্ষেত্রে কোন প্রথা পালিত হয়নি। শুধু প্রয়োজন ছিল কবীরপন্থী পঞ্চায়েতের অনুমোদন এবং বরের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের খাওয়ানো। দু'বছর আগে চাজ্জু রামের অব্যাহত কাশির ব্যাধি হয় এবং তাকে একটি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। চিকিৎসায় তার উন্নতি হয় এবং শিগগির তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু এখন কমলার মনে কালো মেঘের ঘনঘটা। সে আমার স্ত্রীর কাছে এসে বারবার বলে, 'বিবিজি, আমি আর সন্তান চাই না। আরো কয়েক বছরের মধ্যেও আমি আর সন্তান ধারণ করতে পারবো না। এরপর সে কিছু করে বসলে আমি কিছুই মনে করবো না। আপনি ডাক্তারকে একটু বলে দিন না কেন যে, তিনি তাকে বলুক যে, এটা তার স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ।

ইন্দিরা গান্ধী একবার বলেছিলেন, 'ইতিহাস পাঠ করলে আপনারা দেখবেন যে, যেখানে মহিলারা জেগে উঠেছে, সে দেশ উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছে। যেখানে তারা নিশ্চল থেকেছে, সেই দেশ পিছিয়ে গেছে।'

ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার দু'দিন পর আমি দিল্লি ও আগ্রার মধ্যবর্তী স্থানে যমুনা নদী বরাবর কিছু গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে অধিকাংশ জমি ব্রাহ্মণ কৃষিজীবীদের, কিন্তু মঝে মাঝে অন্য জাতের কিছু লোক জাট, গুজ্জার, হরিজন, মুসলিম, মেও এবং শিখও ছিল। ফেরীর জন্যে অপেক্ষমান মিশ্র জাতের লোকগুলোর মধ্যে আমিও ছিলাম।

পুরুষ এবং মহিলারা পৃথকভাবে অবস্থান করছে। অল্পবয়স্কা হিন্দু মহিলারা তাদের মাথার কাপড় টেনে মুখ ঢেকে রেখেছে। কিছু মুসলিম মহিলার পরনে বোরখা। পুরুষদের সাথে বিভিন্ন সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনার পর আমি বরকত নামে একজন মেওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কে নির্বাচিত হয়েছে তা সে জানে কিনা। হ্যা'উনি নেহরুজি'র কন্যা।' লোকটি বললো। 'আমি তার নাম স্মরণ করতে পারছি না।'

'ইন্দিরা গান্ধী' সমস্বরে কয়েকজন উত্তর দিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ইন্দিরা গান্ধী' বরকত বললো। 'আমি জানতাম যে, উনি পন্ডিতজি'র কন্যা।'

'একজন মহিলাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেয়ে তোমার কেমন লাগছে?' বেশ জোরে আমি প্রশ্নটা করলাম যাতে সবাই শুনতে পারে।

কিছুক্ষণ কেউ উত্তর দিলনা। প্রশ্নটা আবার করলাম এবার মহিলার দিকে আমার মুখ ঘুরিয়ে, 'বহেনজি,' বয়োজ্যেষ্ঠাকে লক্ষ্য করে বললাম,' আপনার মতামত কি?

'ওগো রুদলুর মা, তুমি কিছু বলছো না কেন? বাড়িতে তো তুমি কখনো মুখ বন্ধ করো না।' লোকটি ফরিদাবাদ থেকে আগত একজন জাট। তার স্ত্রী দ্রুত উত্তর দিল,' ও রুদুলুর বাপ, তুমি তো খুব চতুর! উত্তরটা তুমিও দিচ্ছ না কেন?'

কৃষকরা হেসে উঠলো। তাদের মহিলারাও হাসতে লাগলো। 'এটা একটা ভালো প্রোপাগান্ডা' একজন শিখ বললো। 'মানুষ ভাববে, আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। পৃথিবীর কোন দেশে মহিলা প্রধানমন্ত্রী নেই। আমি তো এর পক্ষে।'

'তোমার কি মতামত? আবার বরকতের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলাম। তাকে সাহস দিলাম,' বাড়িতে তো মহিলারাই শাসন করে।'

'সেটা ভিন্ন কথা,' বরকত বিস্ময় প্রকাশ করলো। অন্য গ্রামবাসীরাও তার সাথে একমত হলো।' ওটার সাথে এটা এক কথা নয়।'

'কেন নয়?'

'শুনুন তাহলে, এটা হচ্ছে' বরকত কিছুটা হোঁচট খেয়ে আবার শুরু করলো, 'আমার বিবি যদি কোন ভুল করে, আমি সোজা তার মুখের উপর চড় মারি। একজন প্রধানমন্ত্রীর গালে কে চড় মারতে পারবে?'

তারা বসে দার্শনিকের ভঙ্গিমায় সমস্যাটি নিয়ে ভাবতে লাগলো। আঙ্গুল দিয়ে বালিতে নানা রকম দাগ কাটলো। তাদের যমুনার ওপারে নিয়ে যাবে যে নৌকা সেদিকে তাকিয়ে থাকলো। শেষ পর্যন্ত প্রবীণ একজন মুখ খুললো ঃ 'সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, একজন মহিলা কি দেশ চালাতে পারে?' এরপর তারা বালির উপর আরো দাগ কাটলো, নৌকার পানে আবার তাকালো।

(ইন্দিরা গান্ধী প্রথম দফা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার অল্পদিন পর নিবন্ধটি লিখিত হয়েছিল।)

মাদার তেরেসা

বিশ বছরের বেশি সময় আগের ঘটনা। নিউইয়র্ক টাইমস আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল পত্রিকাটির ম্যাগাজিন সেকশনের জন্যে মাদার তেরেসার সংক্ষিপ্ত জীবনী তৈরি করে দিতে। মাদার তেরেসাকে আমি লিখেছিলাম, তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে। অনুমতি পেয়ে আমি তিনদিন তার সাথে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাটানোর সুযোগ লাভ করি। কলকাতায় তার সাথে ওই তিন দিনের স্মৃতির চাইতে আর কোন কিছুই আমার দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবনে এতো তীক্ষ্মভাবে দাগ কাটেনি। কাসুলিতে আমার ভিলার পাঠকক্ষে আমার সবচাইতে প্রশংসিত ও প্রিয় দু'জন ব্যক্তিত্বের ছবি রেখেছি–একটি মহাত্মা গান্ধীর, আরেকটি মাদার তেরেসার।

তার সাথে মুখোমুখি সাক্ষাতের পূর্বে আমি মাদার তেরেসার উপর ম্যালকম মাগারিজের 'সামথিং বিউটিফুল ফর গড' গ্রন্থটি পাঠ করি। ম্যালকম সদ্য দীক্ষিত ক্যাথলিক এবং অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী। বিবিসি'র জন্যে তিনি তার উপর একটি চলচ্চিত্র তৈরি করতে যাচ্ছেন। তারা প্রথমে 'নির্মল হৃদয়ে' (পবিত্র আত্মা) গেছেন। কালিঘাট মন্দিরের কাছে মৃতপ্রায় দুস্থদের জন্যে স্থাপিত হয়েছে এ আশ্রম। ভবনটির বাইরের কিছু দৃশ্য ধারণ করে তারা এবং এর সূর্যালোকিত চত্তরের। ক্যামেরাম্যানরা তাদের মতামত ব্যক্ত করে যে, ঘরের ভিতরটা খুব অন্ধকার এবং তাদের কাছে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা নেই। শেষ পর্যন্ত কিছু দৃশ্য ধারণ ছাড়াই এবং অন্ধকার কক্ষের কিছু দৃশ্য ধারণ করে ছবিটি তৈরি হলো। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে দেখা গেল যে, সূর্যালোকে ধারণকৃত অংশগুলোর চাইতে অন্ধকার অংশের দৃশ্যগুলোই বেশি আলোকিত।

প্রথম যে বিষয়টি আমি মাদার তেরেসাকে প্রশ্ন করি, তা হলো, এটা সত্য কিনা। তিনি উত্তর দেন,' অবশ্যই! এ ধরনের ঘটনা তো সবসময় ঘটে।' এবং তিনি কণ্ঠে আরো গাম্ভীর্য এনে বলেন যে, 'প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায় এবং প্রত্যেকটি মুহূর্তে ঈশ্বর নিজেকে কিছু অলৌকিকত্বের মধ্যে প্রকাশ করেন।'

তিনি আরো কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন যখন তার প্রতিষ্ঠানটির কথা খুব কম লোকই জানতো এবং সবসময় সংকটের মধ্যে ছিল। 'কিন্তু কখনো অর্থসংকট গুরুতর ছিল না।' তিনি আমাকে বলেন। 'ঈশ্বর মানুষের মাধ্যমে সবকিছু দিয়েছেন। তিনি জানালেন যে, যখন বস্তি এলাকায় তার প্রথম স্কুল চালু করেন তখন তার কাছে পাঁচ টাকার বেশি ছিল না। কিন্তু যখনই লোকজন জানতে পারলো যে, তিনি কি করছেন তখন তারা অর্থ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে এলো। 'সবই ঐশ্বরিক দান।

একবার শীতের সময় আমাদের লেপ ছিল না। তার আশ্রমের সন্ন্যাসিনীরা দেখতে পেলেন যে, লেপের জন্যে কাপড় থাকলেও তুলা কেনার কোন টাকা নেই। মাদার তেরেসা যে মুহূর্তে তার বালিশ খুলে তূলা বের করতে যাচ্ছেন তখনই ঘন্টা বাজলো, একজন কর্মকর্তা, যিনি বিদেশে নিয়োগ পেয়ে কলকাতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তিনি তার কিছু কম্বল ও ম্যাট্রেস এনেছেন মাদারের আশ্রমে দেয়ার জন্য।' আরেকবার তাদের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল, তখন তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক মহিলা তাদের জন্যে এক বস্তা চাল নিয়ে আসেন। 'আমরা চালগুলো পরিমাপ করলাম আমাদের ছোট টিনের কাপ দিয়ে। বস্তায় ঠিক ততটা চাল ছিল, সেদিনের জন্য আমাদের যা প্রয়োজন। আমি যখন মহিলাকে ঘটনা বললাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, তিনি উপালব্ধি করেছেন যে, ঈশ্বর তার ইচ্ছার কলকাঠি হিসেবে তাকে ব্যবহার করেছেন।'

মাদার আমাকে প্রথম যে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়ে যান সেটি ছিল 'নির্মল হৃদয়'। ১৯৫২ সালে কলকাতা কর্পোরেশন ভবনটি তার কাছে হস্তান্তর করে। গোঁড়া হিন্দুরা এতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। কালি মন্দিরের সঙ্গে জড়িত চারশ' ব্রাহ্মণ পুরোহিত ভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 'একদিন আমি বাইরে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলি। "আপনারা যদি আমাকে হত্যা করতে চান, তাহলে হত্যা করুন। কিন্তু এখানে যারা বাস করছে তাদের কোন বিঘ্ন করবেন না। তাদেরকে শান্তিতে মরতে দিন।"

তার এ কথায় বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণরা শান্ত হয়ে যায়। পুরোহিতদের একজনকে 'নির্মল হৃদয়ে' ভর্তি করা হয়। যক্ষ্মায় আক্রান্ত লোকটির অন্তিম দশা চলছিল। সন্ন্যাসিনীরা তার সেবাযত্ন করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। এ ঘটনার পর মাদার তেরেসার প্রতি পুরোহিতদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীতে আরেক দিন একজন পুরোহিত হোমে ভর্তি হয়, লোকটি মাদার তেরেসার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে বলতে থাকে, "ত্রিশ বছর ধরে আমি মন্দিরে কালি দেবীর সেবা করেছি। এখন দেবীকে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি।'

মাদার তেরেসার সাথে আমি 'নির্মল হৃদয়' এ ঘুরে দেখলাম। আমরা যখন সেখানে ছিলাম, তখন চিকিৎসাধীন ১৭০ জন নারীপুরুষের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু ঘটে। তাদের বিছানায় আশ্রয় দেয়া হয় বারান্দায় শুয়ে থাকা দু'জন রোগীকে। মাদার তেরেসা প্রতিটি রোগীর কাছে গিয়ে তাদের অবস্থার কথা জানতে চান। রোগীদের যারা জানে যে, তারা আর বেশিদিন বাঁচবে না তাদের উদ্দেশ্যে মাদার তেরেসার একটিই বাণী, 'ভগবান আছেন।' মাদার তেরেসার কাঠামো খুব আকর্ষণীয় নয়– বড়জোর পাঁচ ফুট দীর্ঘ, ক্ষীণকায়, চোয়ালের হাড় স্পষ্ট দেখা যায় এবং ঠোট খুব পাতলা। সারা মুখ জুড়ে আঁচিল। তার ব্যক্তিত্বের খ্যাতি ছাড়া তিনি সাদামাটা ঘরোয়া চেহারার মহিলা। মাগারিজ যথার্থই তাকে চমৎকার ব্যক্তিত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মানুষের সাধারণ সুখের মাঝে তিনি নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছেন। তার অনুসারী সন্ন্যাসিনীদের জন্যে তিনি যে পোশাক নির্ধারণ করেছেন, তা নিজেও পরিধান করেন। তাতে সাদাসিধে দর্শন মাদার তেরেসাকে আরো সহজ সরল দেখায়।

ভারতীয় টানে তিনি কথা বলেন এবং কনভেন্টে পড়া অধিকাংশ ভারতীয়দের মতো বাক্য শেষ করেন প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে 'তাই নয় কি?' তিনি আমাকে বলেছেন যে, কিভাবে তিনি মাত্র বার বছর বয়সে একজন সন্ন্যাসিনী হিসেবে যুগোশ্লাভিয়ার স্কোপের শহরে তার পিতৃভূমি ত্যাগ করেন। ডাবলিনের কনভেন্টে কিভাবে তিনি ইংরেজি শিখেন এবং ১৯১৯ সালে কলকাতায় সেন্ট মেরী'স হাই স্কুলে জিওগ্রাফির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। বহু বছর তিনি সে স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে ছিলেন। সহসা তার মধ্যে এক ধরণের অদ্ভুত অস্থিরতা কাজ করতে থাকে। ব্যাপারটিকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, 'যীশু খ্রিস্টের কাছ থেকে একটি বিশেষ আহবান আসে। ১৯৪৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ছিল তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন।' দিনটিকে তিনি 'অনুপ্রেরণার দিন' হিসেবেও বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি দার্জিলিং এ যাচ্ছিলাম অবকাশ কাটাতে। ট্রেনে অবস্থানকালেই আমি তার আহবান পাই, সব ছেড়ে তাকে অনুসরণ করে বস্তিতে গিয়ে হতদরিদ্র লোকের মধ্যে তাকে সেবা করতে।' এজন্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেন। পাটনায় গিয়ে নার্সিং -এর উপর ব্যাপক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় এক বস্তিতে তাকে দান করা এক বাড়িতে প্রথম স্কুল চালু করেন। তার একমাত্র সহযোগী ছিল সুভাষিণী দাস (সিস্টার অ্যাগনেস)। একটি নতুন প্রতিষ্ঠান 'দি মিশনারিজ অব চ্যারিটিজ' গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির একটি পুরুষ শাখা 'ব্রাদার্স চ্যারিটিজ' গঠিত হয় কয়েক বছর পর। প্রতিষ্ঠানের চারটি লক্ষ্য স্থির করা হয়– 'দারিদ্র, পবিত্রতা, আনুগত্য এবং দরিদ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ।'

মাদার তেরেসা নিজে বাংলা শিখেন এবং শিগগিরই অনর্গল বাংলা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সহজ সিদ্ধান্ত তার শক্তির উৎস। আমি যখন তার কাছে জানতে চেয়েছি যে, 'আপনার জীবনে কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি—গান্ধী, নেহরু, অ্যালবার্ট, সোয়েটজার?' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি উত্তর দেন 'যীশু খ্রিস্ট।' এরপর আমি তাকে গ্রন্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি এই ভেবে যে, প্রসঙ্গটি তাকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু তার উত্তর একইভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল 'বাইবেল।'

একদিন আমি মাদার তেরেসার সাথে ভিক্ষা অভিযানে সহযাত্রী হলাম। ভিড়ে ঠাসা একটি ট্রামে আরোহণ করলাম আমরা। সাথে সাথে একজন যাত্রী আসন ছেড়ে তাকে বসতে অনুরোধ করলো। আরেকজন ধূতির গিঁট খুলে টিকেট কেনার জন্যে খুচরা পয়সা বের করে কন্ডাক্টরকে দিতে চাইলে কন্ডাক্টর তার টিকেটের মূল্য মাদার তেরেসাকে দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে যাত্রীর টিকেটের মূল্য পরিশোধ করলো। একটি বড় বিস্কুট কারখানার অফিসে গেলাম আমরা। ম্যানেজার মি. মুখার্জির অজুহাত তৈরি করাই ছিল। তার ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না। কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ চলছে ইত্যাদি। মাদার তেরেসা তাকে সহানুভূতি দেখালেন এবং বললেন, 'আমরা শুধু আপনার বাতিল হয়ে যাওয়া বিস্কুটের টুকরাগুলো চাই। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা যে, আমাদের কোন শ্রমিক সমস্যা নেই। আমরা ঈশ্বরের জন্যে কাজ করি। সেক্ষেত্রে কোন ইউনিয়ন নেই।' আমি লক্ষ্য করছিলাম, মি. মুখার্জির প্রতিরোধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। তিনি তার ফোন তুলে মাদার তেরেসার কাছে চল্লিশ টিন ভাঙ্গা বিস্কুট পাঠানোর নির্দেশ দিলেন।

১৯৬২ সালে মাদার তেরেসার সেবার স্বীকৃতি দেয়া হয় তাকে 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত করে। এ অনুষ্ঠানে পন্ডিত নেহরু এবং তার বোন বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তারা স্বীকার করেন যে, তারা আবেগে প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। এর কয়েক মাস পরই তিনি ম্যাগসেসে পুরস্কার পান। ষষ্ঠ পোপ পল তাকে একটি গাড়ি উপহার দেন। যা তিনি নিলামে বিক্রি করে দেন সাড়ে চার লাখ টাকায়। ১৯৭১ সালে পোপ জনের ২৩তম পুরস্কার লাভ করেন সাড়ে একুশ হাজার ডলার। এরপর একে একে পান গুড সামারিটান জোসেফ কেনিডি এওয়ার্ড, স্টেম্পলটন ফাউন্ডেশন পুরস্কার। একটি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রিন্স ফিলিপ বলেন, 'মাদার তেরেসার জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে চমৎকারিত্ব জ্বলজ্বল করছে এবং তা বিস্ময় ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তখন থেকে শান্তির জন্যে নোভেল পুরস্কার লাভ পর্যন্ত এমন একটি মাসও যায়নি, যখন তিনি কোন না কোন পুরস্কারে ভূষিত হননি বা সেবার জন্যে অর্থ সাহায্য পাননি। লব্ধ প্রতিটি পয়সা হাসপাতাল, এতিমখানা এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে এবং অন্য দেশে স্থাপিত কুষ্ঠ আশ্রম পরিচালনায় ব্যয় হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যায় শিয়ালদহ থেকে তার বাড়িতে আসার পথে আমাদেরকে গাড়ি থেকে নামতে হলো বিপরীত দিক থেকে একটি বিশাল শব মিছিল আসছিল বলে। এটি ছিল ভারতে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব কমরেড মোজাফফর আহমদের শবমিছিল। আমরা যখন এগিয়ে যাচ্ছিলাম ছোট ছোট লাল পতাকাধারী বহু লোক মাদার তেরেসার পা স্পর্শ করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল। তার আশির্বাদ নিয়ে তারা আবার মিছিলে অংশ নিচ্ছিল।

মাদার তেরেসা আমাকে দমদম এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিলেন। আমি যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি তখন তিনি বললেন, 'তাহলে?' অর্থাৎ আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা? আমি বললাম, 'দয়া করে আমাকে বলুন যে, কুষ্ঠ এবং গ্যাংগ্রিনের মতো নোংরা রোগে আক্রান্ত লোকদের আপনি কি করে স্পর্শ করেন? আমাশয় এবং কলেরা রোগীর ময়লা ও বমি কি আপনার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'প্রতিটি মানুষের মধ্যে আমি যীশুকে দেখি। নিজেকে বলি, এটি তো ক্ষুর্ধাত যীশু, তাকে অবশ্যই খাদ্য দিতে হবে। এটি অসুস্থ যীশু! এর গ্যাংগ্রিন, আমাশয়, কলেরা হয়েছে। আমার উচিত তাকে ধুয়ে পরিস্কার করা, তার সেবা করা। আমি তাদের সেবা করি, কারণ আমি যীশুকে ভালবাসি।'

মাদার তেরেসাকে শেষবার আমি দেখি দিল্লিতে দু'বছর আগে, যখন তিনি তার বন্ধু এইচ এন সিকান্দ কর্তৃক তাকে প্রদত্ত দু'টি মারুতি ভ্যান নিতে এসেছিলেন। তার বাড়িতে বিপুল সংখ্যক লোক জড়ো হয়েছিল। মাদার তেরেসা আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেলেও আমাকে চিনতে পারেননি। কি করে তিনি চিনবেন, এতোগুলো বছর কেটে গেছে এবং কতো লাখ লাখ মানুষের সাথে তিনি সাক্ষাত করেন।

ভারতীয় সমাজে যৌনজীবন

অনেক বছর আগে শীত মওসুমে রাতের এক ট্রেনে আমি দিল্লি থেকে ভূপাল যাচ্ছিলাম। এটি ছিল এক্সপ্রেস ট্রেন, সামান্য ক'টি বড় স্টেশনে শুধু বিরতি আছে। পাচ বার্থের একটি কম্পার্টমেন্টে নিজেকে দেখলাম। তিনটি বার্থ নিচে এবং দু'টি দু'পাশে উপরে। আমি নিচের বার্থে এবং আরো দু'জন যাত্রী আমার মুখোমুখি বার্থে। উপরের বার্থ দু'টি প্রফেসর ও মিসেস সাকসেনার নামে রিজার্ভ করা। ট্রেন ছাড়ার পনের মিনিট আগে একদল নারী-পুরুষ মিলে, অলংকৃত শাড়িতে ঢাকা এক নববধুকে কম্পার্টমেন্টের পাশে এনে দাঁড় করালো। তার মুখের উপর ঘোমটা টানা। হাতির দাঁতের বালায় তার হাত পূর্ণ। তারা কম্পার্টমেন্টের বাইরের প্যানেলে নেমে পড়লো এবং ভিতরে উঠে এলো। তারা দেখে হতাশ হলো যে, রিজার্ভ করা বার্থ দু'টি একটি থেকে আরেকটি পনের ফুট দূরে। লোকগুলোর মধ্যে একজন আমার কাছে এসে বললো যে, নবদম্পতির সুবিধার্থে আমি আমার বার্থটি ছেড়ে উপরের একটি বার্থ নিতে পারি কিনা। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে সম্মত হয়ে আমার বিছানা গুটিয়ে নিলাম। আরেকজন যাত্রী মাঝের বার্থটি ছেড়ে দিয়ে উপরের দ্বিতীয় বার্থে উঠে গেলেন যাতে নবদম্পতি পাশাপাশি থাকতে পারে। নবদম্পতির সাথে আসা লোকদের মধ্যে একজন গার্ডকে থামিয়ে বললো দম্পতিকে একটি নির্দিষ্ট জংশনে জাগিয়ে দিতে যেখানে রাত তিনটায় ট্রেনটি তিন মিনিটের জন্যে যাত্রাবিরতি করে।

গার্ড হুইসেল বাজিয়ে সবুজ পতাকা দেখানোর সাথে সাথে নবদম্পতিকে বিদায় জানাতে আসা লোকগুলো দু'জনকে আলিঙ্গন করে এবং অনেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে বিদায় নিল। ট্রেন আলোকিত প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করার সাথে সাথে নববধূ নাক ঝেড়ে তার মুখের ঘোমটা সরালো। তার বয়স চব্বিশ পঁচিশ বছর, ফর্সা ত্বক, গোলগাল মুখ। চোখে মোটা চশমা। আমি তার দেহের গঠন দেখতে না পারলেও অনুমান করলাম যে, মেদের বিরুদ্ধে মেয়েটি ব্যর্থ সংগ্রামে লিপ্ত। তার স্বামী তার চাইতে দেখতে কয়েক বছরের বড়। (জুনিয়র লেকচারারকে সম্মান দিতে প্রফেসর লিখা হয়েছে)। বধুর মতো তার মুখটাও ফোলা ফোলা এবং চশমাধারী। তাদের মৃদু কথাবার্তা থেকে যতটুকু আচ করতে পারলাম (আমি তাদের থেকে মাত্র চার ফুট উপরে) যে, তারা দু'জন একে অন্যের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাদের বিয়ে আত্মীয় স্বজন এবং হিন্দুস্থান টাইমসের পাত্র-প্রাত্রী কলামের মাধ্যমে আয়োজিত। তারা তাদের পাপাজি ও মাম্মিজিদের ব্যাপারে কথা বললো। তাদের কলেজের দিনগুলোর কথা, বন্ধুদের কথা 'আমার ভাই এর মতো' অথবা 'আমার আপন বোনের চাইতে ভাল' এসব বিষয় উল্লেখ করলো, কিছুক্ষণ পর আলোচনার গতি মন্থর হলো। আমি দেখলাম, লোকটির হাত তার মহিলার জানালার কার্নিশের উপর।

কম্পার্টমেন্টের বাতিগুলো নিভিয়ে দেয়া হলো একটি ক্ষীণ আলো রেখে। তাতে কম্পার্টমেন্টে চাঁদের নীল আলোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রেনটি বিভিন্ন স্টেশনে না থেমে অতিক্রমের সময় আলোকিত প্ল্যাটফর্ম ছাড়া আর বেশি কিছু দেখতে পারছিলাম না।

দম্পতিটি মধ্যবর্তী বার্থটি ছেড়ে নিজেদেরকে চার ফুট প্রশস্ত একটি বার্থে গা এলিয়ে আরাম বোধ করার সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করলো না। ছোট কম্পার্টমেন্টের অন্যান্য যাত্রীদের উপস্থিতি তারা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে একে অপরকে জানতে পুরোপুরি মগ্ন হয়ে গেল। তারা এতোটাই অধৈর্য হয়ে পড়েছিল যে, আরো সুবিধাজনক বা স্বচ্ছন্দ বোধ করার মতো কাপড় বদলে নেয়ার সময় ব্যয় করতেও রাজী ছিল না। নিজেদেরকে লেপ দিয়ে ঢেকে ফেলে তারা তাদের পৃথিবীতে হারিয়ে গেল।

শাড়ি মেয়েদের এমন একটি পোশাক যা একদিকে আলংকারিক, অন্যদিকে অত্যন্ত কার্যোপযোগী। উপযুক্তভাবে শরীরে পেঁচিয়ে নিলে এটি নারীর বিশেষ সুডোল অংশগুলো থেকে নিতম্বকে প্রকট করে তুলতে পারে। সুন্দরভাবে তৈরি একটি ব্লাউজ শাড়ির সাথে পরলে স্তনকে উপরের দিকে স্ফীত করে এবং নাভির নিচ পর্যন্ত পেটকে বিকশিত করে। এমন আর কোন পোশাক নেই, যা একই সাথে মেয়েদের শরীরের দুর্বল অংশ পরিবৃত রাখার পাশাপাশি সেই অংশগুলোকেও স্পষ্ট করে তোলে যা প্রকাশ করার দাবি রাখে। একজন মোটা মহিলাকে অন্য পোশাকের চাইতে শাড়িতে কম মোটা দেখায় এবং একজন ক্ষীণ মহিলাকে শাড়িতে পরিপূর্ণ মনে হয়। একই সাথে শাড়ি অত্যন্ত কার্যোপযোগী। একজন মহিলার প্রস্রাব বা পায়খানা করতে হরে শুধু কোমর পর্যন্ত শাড়ি উঁচিয়ে নিয়েই হলো। ঝটপট যৌনমিলন করতে চাইলে তার যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, শাড়ি সামান্য তুলে তার উরু প্রসারিত করা। দৃশ্যতঃ মিসেস সাকসেনাও তাই করেছেন। আমার কানে তার চাপা কণ্ঠে 'হায় রাম' শব্দ ভেসে এলো এবং উপলব্ধি করলাম যে, তাদের বিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করলো।

সাকসেনা দম্পতি নিজেদের ধৌত করার জন্যে বাথরুমে গেল না, বরং পুনরায় তারা সক্রিয় হলো। এবার তারা কম অধৈর্য এবং মনে হচ্ছিল তাদের এবারের প্রচেষ্টা আরো প্রবল। একাধিকবার তাদের উপর থেকে লেপ নিচে পড়ে গেল এবং প্রফেসরের উত্থানপতনরত নিতম্ব এবং কাপড়ের নিচ থেকে তার বধুর বের করে আনা স্তন আমার চোখে ধরা পড়লো। দ্রুত ধাবমান ট্রেনের একটানা শব্দ ছাড়িয়ে মেয়েটির পরিতৃপ্তি লাভের চাপা ধ্বনি এবং প্রফেসরের আনন্দের ঘোঁত ঘোঁত শব্দ শুনলাম। আমাদের কম্পার্টমেন্টে শান্তি নেমে আসার আগে তারা তৃতীয় দফা মিলিত হলো। তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। এরপর অন্ধকার ভেদ করে অগ্রসরমান ইঞ্জিনের বিরামহীন বিলাপ এবং আমার বয়োঃবৃদ্ধ সহযাত্রীর নাক ডাকার শব্দ যা আমার নিদ্রাকে মাঝে মাঝে বিঘ্নিত করছিল।

কম্পার্টমেন্টের দরজা ও জানালার উপর কারো সজোর চাপড়ানোর শব্দ বিরক্তিকরভাবে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। সেই সাথে চিৎকার 'উঠুন! উঠুন! গাড়ি সেহোরে পৌছ গেছে। আর এক মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেবে।' এটা গার্ডের কণ্ঠ।

আমি সুঁইচ অন করলাম এবং কম্পার্টমেন্ট আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হলো। স্মরণীয় একটি দৃশ্য! প্রফেসর সাকসেনা গভীর ঘুমে নিমগ্ন, তার নিতম্ব সম্পূর্ণ উন্মুক্ত; মিসেস সাকসেনাও গভীর ঘুমে, মুখটা পুরোপুরি খোলা, স্তনের উপর কোন বস্ত্র নেই; তিনি শুয়ে আছেন অসাড়ে যেন একটি বোর্ডে প্রজাপতিকে পিন দিয়ে গেঁথে রাখা হয়েছে। তার চুল বালিশের উপর ছড়ানো। তাদের গ্লাসগুলো ফ্লোরে পড়ে আছে।

যেরকম বিব্রতই তারা বোধ করুক না কেন, শিগগির তা কেটে গেল তাদের গাড়ি থেকে নামার ব্যস্ততার মধ্যে। আমরা তাদের বিছানা, সুটকেস বের করে দিলাম। প্রফেসর তার কাপড় ঠিক করতে করতে ঠান্ডা প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলেন। শাড়ির আঁচল দিয়ে খোলা স্তন ঢাকতে ঢাকতে তার স্ত্রী তাকে অনুসরণ করলো। ট্রেন যখন চলতে শুরু করেছে তখন মিসেস সাকসেনা আর্তনাদ করে উঠলো– তার একটি ইয়ারিং নেই। বন্ধুসুলভ গার্ড ট্রেন আবার থামালো। আমরা সবাই হাঁটুতে ভর দিয়ে ইয়ারিং খুঁজতে শুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত সেটি পাওয়া গেল সিটের একপ্রান্তের ফাঁকে। আমাদের যাত্রা আবার শুরু হলো।

'এটাই হচ্ছে প্রেম' আমার সহযাত্রীদের একজন মন্তব্য করলো। 'তারা নতুন বিয়ে করেছে এবং আজ ছিল একত্রে তাদের প্রথম রাত। সবার উচিত প্রেমরত লোকদের ক্ষমা করে দেখা।'

'কি ধরনের প্রেম?' আমি ব্যঙ্গাত্মক সুরে বললাম। 'কয়েক ঘণ্টা আগেও ওরা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাড়ি পৌঁছার মতো ধৈর্যও তাদের নেই। প্রেমের কোন বাক্যবিনিময় ছাড়াই তারা যৌনমিলনে লিপ্ত হয়েছে। আপনি এটাকে প্রেম বলতে চান?'

'যাহোক,' ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি মনে মনে বিচার করে উত্তর দিলেন। 'তারা হয়তো কিছুদিনের জন্যে আরেকবার সুযোগ নাও পেতে পারে। বাড়িতে তাদের আত্মীয়স্বজন, বরের মা, বোন ভাইয়েরা থাকবে। তাছাড়া অনেক ধরনের ধর্মীয় বিধি পালন করতে হবে। অধৈর্যর নামই যৌবন এবং শরীরের নিজস্ব বাধ্যবাধকতা আছে। আমরা বরং বলতে পারি এটা হচ্ছে প্রেমের সূচনা।'

'এটি আরেকটি পরিবারের সূচনা হতে পারে। কিন্তু প্রেম কোত্থেকে এলো, আমি তো তা দেখি না।' আমি মন্তব্য করলাম। 'অশিক্ষিত কৃষকরা তাদের স্ত্রীদের সাথে গবাদিপশুর মতো মিলিত হতে পারে, তা আমি বুঝতে পারি; কিন্তু দু'জন শিক্ষিত নরনারী একজন কলেজের লেকচারার এবং একজন স্কুল শিক্ষিকা সম্পূর্ণভাবে শোভনীয়তা বর্জিত অথবা গোপনীয়তা বোধহীন হয়ে তিনজন অজ্ঞাত পরিচয় লোকের উপস্থিতিতে মিলিত হবেন আমি তা বুঝতে পারি না।'

'আপনার মাঝে বিদেশী ধ্যানধারনা কাজ করছে', তৃতীয় ব্যক্তি আমার বক্তব্যকে খানিকটা অগ্রাহ্য করেই বললেন। 'যাকগে, এখন রাত সাড়ে তিনটা। কিছু সময় ঘুমানো যাক।' তিনি বাতির সুইচ এবং যুক্তি দু'টিই বন্ধ করলেন।

কিন্তু ঘটনাটি আমার মনে রয়েই গেল। কারণ এ ঘটনা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় নারী-পুরুষের সম্পর্কের বাস্তব অবস্থাকেই বিস্তারিতভাবে প্রতিফলিত করেছে। 'প্রেম' শব্দটি দ্বারা পাশ্চাত্যের যা বুঝায় তা ভারতের মাত্র অর্ধডজন বড় নগরীর পাশ্চাত্য জীবনে অভ্যস্ত ক্ষুদ্র একটি অংশই শুধু জানে, যারা ভারতীয় কোন ভাষায় কথা বলার চাইতে বরং ইংরেজিতে কথা বলে, শুধু ইংরেজি বই পড়ে পাশ্চাত্যের মুভি দেখে, এমনকি স্বপ্নও

দেখে ইংরেজিতে। বাদবাকী লোকদের কাছে প্রেম এমন কিছু, যে সম্পর্কে তারা কবিতায় পড়েছে, অথবা সিনেমার পর্দায় দেখছে ; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে খুব কম লোকেরই অভিজ্ঞতা হয়েছে। পারিবারিক আয়োজনে বিয়ে গৃহীত রীতি। 'লাভ' ম্যারেজ একটি দুর্লভ বা আপত্তিকর ব্যাপার। পারিবারিক আয়োজনে বিয়ের ক্ষেত্রে দু'পক্ষই প্রথমে একে অন্যকে জানার চেষ্টা করে, এমনকি দৈহিকভাবেও। এ পদ্ধতিতে সম্ভাব্য বর ও কনের কামনার কিছু গড়িয়েও পড়ে একে অন্যের মন ও ব্যক্তিত্ব আবিস্কারের সুযোগ পেয়ে। যখন কামনা তার প্রাবল্য হারাতে শুরু করে এবং তাদের মেজাজ মর্জির আর কোন দ্বন্দ্ব থাকে না, বিশেষ করে পরবর্তী দিনগুলোতে তাদের মধ্যে বন্ধন স্থাপিত হলে। কিন্তু এ ধরনের সুযোগের সম্ভাবনা ক্ষীণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভয়েই দুর্ভোগ পোহায় তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত।

যে সাকসেনা দম্পতির বাসর শয্যার আমি সাক্ষি তাদের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে সে সম্পর্কে আমার ধারনা নেই। হয়তো ইতোমধ্যে তারা ছোট এক বহর সাকসেনার জন্ম দিয়ে ফেলেছে। সাকসেনা নিজে হয়তো এখন পুরোপুরি প্রফেসর হয়েছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রোমান্টিক কবিতা শিখাচ্ছেন এবং মাঝে মধ্যে দু'একটি কবিতা লিখছেন কোন তরুণী প্রফেসরের উদ্দেশ্যে অথবা কোন সুন্দরী ছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে। মিসেস সাকসেনা সম্ভবতঃ স্বামীর আগ্রহ ধরে রাখতে চেষ্টা করেন কুকুরসুলভ ভক্তি প্রদর্শন ও প্রার্থনার মাধ্যমে এবং পবিত্র লোকদের কাছ থেকে আনা অলৌকিক বস্তুর সাহায্যে। হঠাৎ কখনো প্রফেসর যদি তার উপর উপগত হন তাহলে তিনি কল্পনা করেন তার কোন তরুণ সহকর্মীকে এবং পরিতৃপ্তি লাভের মতো কম্পিত হওয়ার আগে তার ঠোটে ভগবানের নাম উচ্চারিত হয় 'হায় রাম।'

সাকসেনা দম্পতি অধিকাংশ ভারতীয় দম্পতির চাইতে ভাগ্যবান। কারণ তারা তাদের পরিবার থেকে দূরে থাকেন এবং নিজেরা নিজেদের মোটামুটি গোপনীয়তার ব্যাপারে আশ্বস্ত। নববিবাহিত অধিকাংশ ভারতীয় দম্পতির কাছে গোপনীয়তার ধারণা সঙ্গোপনে মিলিত হবার মতোই দুর্লভ। তারা খুব কম ক্ষেত্রেই নিজেদের জন্য পৃথক একটা কক্ষ পায়। নববধু স্বামীর পরিবারের মহিলাদের সাথে ঘুমায়। স্বামী তার পিতা বা ভাইদের পাশাপাশি স্থাপন করা খাটিয়ায় শোয়। কখনো কখনো শাশুড়ি, যিনি একটি নাতি লাভের জন্যে আগ্রহী, তিনি পুত্র ও তার স্ত্রীর মধ্যে গোপন শলাপরামর্শ করেন। সবচেয়ে সাধারণ কৌশল হচ্ছে নববধুকে দিয়ে পুত্রের কাছে এক গ্লাস দুধ প্রেরণ; বিশেষ করে বাড়ির অন্য পুরুষ সদস্যরা যখন বাইরে থাকে। পুত্র সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করে এবং দ্রুততার সাথে মিলিত হয়। দম্পতির পক্ষে খুব কম সময়ই তাদের মিলন দীর্ঘতর করা বা পরিতৃপ্ত সঙ্গমের সুযোগ ঘটে। অধিকাংশ ভারতীয় পুরুষ এ বিষয়েও অজ্ঞ যে, মিলনে মেয়েদেরও চরম অবস্থা আসে এবং অধিকাংশ ভারতীয় নারী এ অজ্ঞতাকে আমলে নেয় না। কারণ তারা একটির পর আরেকটি গর্ভধারনে ব্যস্ত থাকে। অতএব যৌনমিলন যে উপভোগ হতে পারে তার কোন ধারনাই থাকে না তাদের। যে দেশটিতে যৌনতার শিল্প সম্পর্কিত বহুল পঠিত গৃন্থ 'কামসূত্রে সৃষ্টি সে দেশের মানুষের এহেন যৌনজীবন খুব দুঃখজনক। তদুপরি যৌনকর্মকে ভারতে আধাত্মিক মহত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে মন্দির গাত্রে যৌনমিলনরত যুগলের ভাস্কর্যকে প্রাধান্য দিয়ে।

ফুলন দেবী

[১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফুলন দেবী পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ও পরে ১৯৯৯ সালে ভারতীয় লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়। ২০০১ সালে ২৫ জুলাই দিল্লিতে তার বাসভবনের সামনে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।]

১৯৮১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি শনিবারের বিকেল। বসন্তের পথ করে দিয়েছে শীতকাল। যতদূর দৃষ্টি যায় পাকা গমক্ষেতের সমুদ্র এবং সরিষার দিগন্ত বিস্তারী হলুদ ফুলের মাঝে মাঝে ডালের সবুজ ক্ষেত। মাটি থেকে বিরাটাকৃতির পাখি উড়ে নীল আকাশে ডানা বিস্তার করে দিয়ে নিচে মাটির দিকে তাকিয়েই চিৎকার করে ডাকে। মহান আল্লাহ তার বেহেশতে বাস করছেন এবং বেহমাই এ সবকিছু শান্তি ও অবসাদে আচ্ছন্ন।

যমুনা নদীর তীরে ছোট জনপদ বেহমাই। প্রধানত ঠাকুর গোত্রের প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের বাস সে গ্রামে। যাদের মধ্যে অনেকে গবাদিপশু পালন করে এবং কিছুসংখ্যক কামারও আছে। শিল্পনগরী কানপুর থেকে আশি মাইল দূরে অবস্থিত বেহমাই এর সঙ্গে কোন শহরের সাথে যোগাযোগের মতো সড়ক নেই। কেউ যদি বেহমাই এ যেতে চায় তাহলে ফসলের ক্ষেতের মাঝ দিয়ে ধূলিময় আলপথ ধরে তাকে যেতে হবে। অথবা সর্পপূর্ণ নদী তীরের সরু পথ দিয়ে এগুতে হবে নলখাগড়া ও কাশ ঝোপ দু'হাতে ফাঁকা করে। বিস্ময়ের কিছু নেই যে, সেবছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যবর্তী সময়ের পূর্ব পর্যন্ত খুব কম লোকই বেহমাই এর নাম শুনেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার যা ঘটেছিল তারপর থেকে মানুষের মুখে মুখে বেহমাই এর নাম উচ্চারিত হয়েছে।

বুনো শুয়োর এবং হরিণ তাড়ানো ছাড়া ফসলের মাঠে তখন তেমন কাজ নেই। তীরধনুকধারী কিছু বালক তীর ছুঁড়ে এবং চিৎকার করে এ কাজ করছিল, অন্যেরা নদীতীরে বালির উপর খেলছিল; আর তাদের মহিষগুলো কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। গ্রামের পুরুষরা তাদের খাটিয়ায় বসে বা হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে, মহিলারা গোল হয়ে বসে গম পিষছে অথবা তাদের বাচ্চাদের চুল থেকে উঁকুন বাছছে।

বেহমাই এর একজন লোকও লক্ষ্য করেনি যে, পুলিশের ইউনিফর্ম পরা একদল লোক নদী অতিক্রম করলো। দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছে কম বয়স্কা এক মহিলা, তার চুল খাটো করে ছাঁটা, পুলিশের ডেপুটি সুপারের তিনটি রৌপ্য তারকাখচিত একটি খাকি কোট ও নীল জিনসের প্যান্ট তার পরনে। পায়ের বুটে জিপার লাগানো। তার ঠোঁটে লিপস্টিক এবং নখ পলিশ করা। বেল্টে বুলেট এবং বেল্টের সাথে সংযুক্ত বাঁকানো একটি

গুর্খা ভোজালি-কুকরি। তার কাঁধে একটি স্টেনগান ঝুলছে এবং হাতে ব্যাটারি চালিত একটি মেগাফোন। ধ্বংসের দেবতা শিবের প্রতীক ত্রিশূল খচিত পতাকা শোভিত মন্দিরের পাশে এসে দলটি বসলো।

দলের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি কুখ্যাত ডাকাত সর্দার বাবা মুস্তাকিম। সে দলের সদস্যদের নির্দেশ দিল কিভাবে প্রত্যেককে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ডজনখানেক লোক গ্রামটিকে ঘিরে ফেলবে, যাতে একজন লোকও বের হতে না পারে। দলের অন্যেরা মহিলার নেতৃত্বে প্রতিটি বাড়িতে তল্লাশি চালাবে এবং তাদের যা খুশী লুট করবে। কিন্তু কেউ কোন মহিলাকে ধর্ষণ করতে পারবে না অথবা তারা যে দু'জন লোককে খুঁজছে তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করতে পারবে না। নীরবে তারা নির্দেশ শুনে সম্মতিতে মাথা ঝুঁকালো। আশির্বাদ প্রার্থনা করে তারা শিবের ত্রিশূলের বেদী স্পর্শ করে ছড়িয়ে পড়লো।

অফিসারের ইউনিফর্ম পরা মহিলা গ্রামের ইঁদারার প্রাচীরে উঠে মেগাফোনের সুইচ অন করলো এবং উচ্চকণ্ঠে বললো, 'গ্রামবাসীরা' আমার কথা শোনো। তোমাদের জন্ম নোংরা অঙ্গ থেকে। জীবনের প্রতি যদি মায়া থাকে তাহলে তোমাদের নগদ টাকা পয়সা, সোনা, রূপা যা আছে সব আমাদের হাতে তুলে দাও। আর শোনো! আমি জানি, ওই দুই মাদারচোদ রামলাল সিং ও শ্রীরাম সিং এই গ্রামেই লুকিয়ে আছে। তোমরা যদি ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে না দাও, তাহলে তোমাদের পাছার মধ্যে আমার বন্দুক ঢুকিয়ে চিড়ে ফেলবো। আমার কথা কি তোমাদের কানে ঢুকেছে? আমি ফুলন দেবী বলছি। আমার কথা অনুসারে যদি কাজ না হয়, তাহলে বুঝতেই পারো যে, ফুলন দেবী তোমাদের কি করতে পারে। জয় দুর্গা মাতা!' সে তার স্টেনগান উপরের দিকে তুলে একটি গুলি ছুঁড়লো; যার অর্থ, গ্রামবাসীদের বুঝানো যে, সে যা বলে তা করতে দ্বিধা করবে না।

ফুলন দেবী ইঁদারার কাছেই অবস্থান নিল, আর তার লোকজন ঠাকুরদের ঘরে লুটপাট শুরু করলো। মহিলাদের কানের দুল, নাকফুল, রূপার চুড়ি, বাজুবন্ধ খুলে নেয়া হচ্ছিল। পুরুষরা নগদ অর্থ ডাকাতদের হাতে তুলে দিচ্ছিল। অভিযান প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী হলো। কিন্তু রাম লাল সিং অথবা শ্রীরাম সিং এর টিকির খোঁজও পাওয়া গেল না। গ্রামবাসীরা কখনো তাদের দেখেছে বলে স্বীকার করলো না। ফুলন দেবী গর্জে উঠলো, 'তোমরা মিথ্যা বলছো। আমি তোমাদের সত্য বলতে শিক্ষা দেব।' সে গ্রামের সব যুবককে তার সামনে হাজির করার নির্দেশ দিল। প্রায় ত্রিশজনকে টেনে হিঁচড়ে তার সামনে আনা হলো। সে আবার বললো, এই যে মাদারচোদের দল, যতক্ষণ তোরা আমাকে না বলছিস যে, ওই দুই শুয়োরের বাচ্চা কোথায়, আমি তোদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো।' যুবকেরা তাদের কাতরতা প্রকাশ করলো এবং প্রতিজ্ঞা করলো যে, তারা কখোনাই লোক দু'টোকে দেখেনি।

'ওদেরকে সাথে নিয়ে চলো,' ফুলন দেবী তার দলের লোকদের নির্দেশ দিল। 'আমি ওদেরকে এমন শিক্ষা দেব যে, জীবনে আর ভুলবে না।' ডাকাতদল ত্রিশজন গ্রামবাসীকে

ঠেলে ধাক্কিয়ে বেহমাই এর বাইরে নদীমুখী পথ ধরলো। একটি বাঁধে পৌছে সে তাদেরকে থামার নির্দেশ দিয়ে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করালো। তাদের দিকে স্টেনগান তাক করে বললো, 'শেষবারের মতো বলছি, তোরা কি আমাকে বলবি যে, ওই দুই হারামজাদা কোথায়, নাকি তোদেরকে খুন করতে হবে?' যুবকেরা আবার তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ করলো, 'আমরা যদি জানতাম তাহলে অবশ্যই বলতাম।' ফুলন দেবী গর্জন করে বললো, 'ঘুরে দাঁড়া।' তারা মুখ ঘুরিয়ে সবুজ বাঁধের দিকে ফিরলো। 'নোংরা অঙ্গজাতের দল। এর দ্বারা তোরা পুলিশের কাছে না জানানোর বিষয়ও শিখতে পারবি। হারামজাদাদের গুলি করো।' সে তার সঙ্গীদের নির্দেশ দিয়ে চিৎকার করলো, 'জয় দুর্গা মাতা!' একযোগে কয়েকটি বন্দুকের গুলির শব্দ উঠলো। ত্রিশজন লোক মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। বিশজন নিহত হলো, অন্যদের আঘাত লেগেছিল পিঠে, পায়ে বা নিতম্বে। তারা মৃতের মতো রক্ত ভেজা মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। ফুলন দেবী এবং তার ঘাতক দল শ্লোগান দিতে দিতে ঢালুপথে এগিয়ে গেল। 'জয় দুর্গা মাতা! জয় বাবা মুস্তাকিম! জয় বিক্রম সিং! জয় ফুলন দেবী!'

পরদিন সকালে বেহমাই এর হত্যাযজ্ঞের কাহিনী সমগ্র ভারতে সংবাদপত্রে প্রধান শিরোনাম হিসেবে প্রকাশিত হলো।

ভারতে ডাকাতির ঘটনা ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। কোন কোন অঞ্চলে ডাকাতি এতোটাই আঞ্চলিক ব্যাধির মতো যে, কিছু দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে অন্যেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বেহমাই থেকে কয়েকশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের চম্বল নদী বরাবর পার্বত্য এলাকা দেশের কুখ্যাত ডাকাতদল অধ্যুষিত এলাকা। উত্তর প্রদেশের বুন্দেলখন্ড জেলা, যেখানে বেহমাই অবস্থিত সেখানে ডাকাতির ঘটনা সাম্প্রতিক ব্যাপার এবং রাজ্য পুলিশের সন্দেহ যে, যখন চম্বলের আশেপাশে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে, তখন কিছু ডাকাতদল বুন্দেলখন্ডে চলে আসে, যেখানকার ভৌগোলিক অবস্থা অনেকটা চম্বলের মতোই। যমুনা নদী হিমালয় পর্বত থেকে নেমে মন্থর সর্পিল গতিতে দিল্লি এবং আগ্রা অতিক্রম করে বুন্দেলখন্ডে প্রবেশ করে। যমুনা এখানে গভীর জঙ্গলে আচ্ছাদিত অনুচ্চ পর্বত শ্রেণীর ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায়। বর্ষার সময় শাখা নদীগুলো গভীর হয়ে যমুনার সাথে যুক্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদে পবিত্র গঙ্গার সাথে মিলিত হয়। বুনো এবং চমৎকার এলাকাঃ পাহাড়, গিরিখাত এবং জঙ্গলে ঘেরা ছবির মতো ছোট ছোট লোকালয়। দিনের বেলায় এসব স্থানে দেখা যায় ময়ূর এবং রং বেরং এর প্রজাপতি; রাতের বেলায় পতঙ্গভুক নিশাচর পাখি উড়তে উড়তে একে অন্যকে ডাকে সেসব পাখিকে হঠাৎ চোখে পড়ে জোনাকি পোকার আলোতে। নীল গাই, চিত্রা হরিণ, বুনো শুয়োর, হায়েনা, শিয়ালের সংখ্যা অগণিত। নানা ধরনের সাপেরও অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র এসব এলাকা এবং সবচেয়ে বিষধর গোখরো সাপও প্রচুর। চাষাবাদ পুরোপুরি বৃষ্টি নির্ভর। প্রধান ফসল ডাল এবং গম। এখানকার কৃষকরা দেশের মধ্যে সবচাইতে দরিদ্র। নদীতীর বরাবর দু'টি প্রধান সম্প্রদায় বাস করে মাল্লা (নৌকার মাঝি) এবং ঠাকুর। ঠাকুররা উচ্চবর্ণের এবং অধিকাংশ জমির মালিক।

মাল্লারা হিন্দুদের বর্ণপ্রথার মধ্যে সবচাইতে নিচু জাতের। তাদের জমিজমা সামান্য এবং মূলতঃ নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা মাছও ধরে এবং মদ চোলাই করে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও ডাকাত দলগুলো মিশ্র সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে গঠিত হতো–ঠাকুর, মাল্লা, যাদব (রাখাল), গুজ্জার (দুধ বিক্রেতা) এবং মুসলিম। কিন্তু এখন ডাকাতরাও বর্ণ বা জাতভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর এবং মাল্লাদের মধ্যে এককালের প্রীতির সম্পর্কের সামান্যই অবশিষ্ট আছে। বেহমাই ঠাকুরদের গ্রাম এবং ফুলন দেবী মাল্লা বর্ণের মহিলা।

ডাকাত হওয়ার জন্যে কোন চিহ্ন বা বিশেষত্বের প্রয়োজন নেই। নিজেদের এলাকায় তারা 'বাগী' বা বিদ্রোহী হিসেবে পরিচিত। হিন্দি সিনেমায়, বিশেষ করে সর্বকালের বক্স অফিস হিট সিনেমা 'শোলে'র নায়ক একজন ডাকাত, যা ডাকাতির পেশায় রোমান্টিকতা যোগ করেছে।

ডাকাত দলগুলো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসজ্জিত, যার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুলিভর্তি করার মতো রাইফেলও আছে, যেগুলো সংগৃহীত হয় কোথাও অবরোধ করে। ডাকাতি বিরোধী অভিযানের একটি পুলিশ রেকর্ড অনুসারে জ্বালাউন জেলায়, যার মধ্যে বেহমাইও পড়ে– এই অঞ্চলে পনেরটি ডাকাতদল আছে এবং প্রতিটি দলে সদস্য সংখ্যা দশ থেকে ত্রিশজন পর্যন্ত। ফুলন দেবী এবং তার বর্তমান প্রেমিক মান সিং যাদব এর দলে পনের জন সদস্য। বিগত ছ'মাসে ডাকাতদের সঙ্গে পুলিশের তিরানব্বই দফা সংঘর্ষ হয়েছে এবং এসব সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে ১৫৯ জন ডাকাত নিহত, ১৩৭ জন গ্রেফতার হয়েছে। সাতচল্লিশজন ডাকাত আত্মসমর্পণ করেছে। পার্বত্য জঙ্গল এবং উপত্যকায় ৪৩৯ জন ডাকাত ঘুরাফেরা করছে বলে পুলিশের ধারণা

আমি বেহমাই এ ইঁদারার পাঁচিলের উপর বসলাম, ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে ফুলন দেবী দেড় বছর আগে তার আগমন ঘোষণা করেছিল। আমার সামনে গ্রামের পুরুষ, নারী, শিশু এবং আমার নিরাপত্তার জন্যে দেয়া পুলিশের সদস্যরা বসা। এক বৃদ্ধ মহিলা বিলাপ করে উঠলো ; 'ওই মাল্লাহিন আমার স্বামী ও দুই ছেলেকে খুন করেছে। কুকুরের মতো মৃত্যু হোক তার।' একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে তার পেটে গুলির ক্ষত দেখালো। আরেকজন তার নিতম্বের কাপড় তুলে একটি টোল দেখালো, যেখানে গুলি লেগেছিল।

'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি বলতে পারো যে, ফুলন দেবী কেন এ গ্রামে এসেছিল এবং এতগুলো মানুষকে হত্যা করেছিল?' আমি জানতে চাইলাম।

কেউ উত্তর দিল না।

'একথা কি সত্য যে, লাল রাম সিং এবং শ্রী রাম সিং বেহমাই এ ছিল?'

সমস্বর অনেকে বলে উঠলো, 'না, আমরা কোনদিনই তাদের দেখিনি।'

'একথা কি সত্য যে, ডাকাতির ঘটনার কয়েক মাস আগে তারা ফুলন দেবীকে তাদের সাথে এনেছিল এবং সে পালিয়ে যাবার আগে বেশ কয়েক সপ্তাহ তাকে আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয়েছিল?'

'রাম! রাম!' কয়েকজন প্রতিবাদ করলো। 'ডাকাতির আগে আমরা ওই মাল্লাহিনকে কখনো এ গ্রামে দেখিনি।'

'তাহলে সে কি কারণে ওদের দু'ভাইকে চেয়েছে? সে কি করে এই গ্রামের পথ চিনলো?'

কেউ উত্তর দিল না।

'এদের কাছ থেকে আপনি কোন কিছু বের করতে পারবেন না', পুলিশ ইন্সপেক্টর আমাকে ইংরেজিতে বললেন। 'আপনি তো জানেন, এসব গ্রামবাসী কেমন লোক। তারা কখনো সত্য কথা বলে না।'

আমি জেরা বন্ধ করে বেহমাই এর চারপাশ ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। শিবের ত্রিশূল শোভিত গ্রামের মন্দির থেকে যাত্রা শুরু করলাম এবং ইঁদারার কাছে ফিরে এলাম এবং সেখান থেকে এগিয়ে গেলাম বাঁধের দিকে, যেখানে ফুলন বিশজন লোককে হত্যা করেছিল।

আমি মাটির একটি স্তূপে দাঁড়ালাম, যেখানে পুলিশ একটি সেন্ট্রি বক্স স্থাপন করেছে। সেখান থেকে গ্রাম, যমুনা নদী এবং তা ছাড়িয়ে আরো কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। পুলিশ সেন্ট্রি কয়েক সপ্তাহ যাবত এ গ্রামে কর্তব্যরত। সে স্বেচ্ছায় কিছু তথ্য দিল ঃ 'স্যার, আমার মনে হয়, ফুলন দেবী কেন একাজটা করেছে তা আপনাকে বলতে পারি। আপনি কি যমুনার অপর তীরের গ্রামটি দেখতে পাচ্ছেন? সে গ্রামের নাম পাল, একটি মাল্লা গ্রাম। মাল্লারা বেহমাই এ আসে ফেরী নিতে। ঠাকুরদের ছেলেরা মাল্লা মেয়েদের উত্যক্ত করে এবং তাদের পুরুষদের মারধর করে। আমি শুনেছে যে, মাল্লা মেয়েদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে নাচতে বাধ্য করার বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। মাল্লারা ফুলন দেবীর কাছে নালিশ করেছে ঠাকুরদের উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্যে। ফুলনের নিজেরও কারণ ছিল। তার প্রেমিক বিক্রম সিংকে লাল রাম সিং ও তার জমজ ভাই শ্রী রাম সিং হত্যা করেছিল। এরপর এ গ্রামে কয়েক সপ্তাহ আটকে রেখে তাকে ধর্ষণ ও মারপিট করেছিল। সে কোনভাবে পালিয়ে তার দলের সাথে মিলিত হয়। তার এমনও সন্দেহ ছিল যে, ওই লোকগুলো তার গতিবিধি সম্পর্কে পুলিশকে অবহিত করছে। অতএব এ ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপার।

'এই মেয়েটি যাদেরকে হত্যা করেছে তাদের প্রত্যেকের জন্যে সে অন্ততঃ দু'টি লোকের সাথে শয্যায় গেছে,' 'অপারেশন ফুলন দেবী'র দায়িত্বে নিয়োজিত সাব-ইন্সপেক্টর বললেন। পুলিশের ধারনা ফুলন দেবী অথবা তার দলের লোকদের হাতে গত দেড় বছরে ত্রিশজনের বেশি লোক নিহত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কতো লোককে সে হত্যা করেছে বা কতো লোকের সাথে সে শুয়েছে সে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কোন হিসাব পাওয়ার কোন উপায় নেই। কিন্তু একটি ব্যাপার নিশ্চিত যে, সবগুলো হত্যাকান্ড অথবা সঙ্গম পুরোপুরি তার ইচ্ছায় হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সে গুলি করতে পারলেই সন্তুষ্ট এমন ডাকাতদের সাথে কাটিয়েছে এবং একডজন বা আরো কিছু বেশিসংখ্যক সদস্যের একটি দলে ফুলন একমাত্র মহিলা ছিল বলে সে তাদের সকলের অভিন্ন সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়েছে। তার দেহ ভোগ করার বিষয়কে সে ক্রীড়ার রীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং পালাক্রমে দলের সদস্যদেরকে সে দেহদান করতো। এটাকে ধর্ষণ হিসেবে বিবেচনার চাইতে বরং তার অতৃপ্ত যৌনাকাংখার পরিণতি বলা যেতে পারে।

ফুলন দেবীর বাবা, মা, বোন এবং তার প্রেমিকদের একজনের সাথে আলোচনা করার পর আমি তার অতীতকে কোনভাবে পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং ১৯৭৯ সালের ৬ জানুয়ারি প্রথম দফা গ্রেফতার হওয়ার পর সে পুলিশের কাছে যে বয়ান দিয়েছিল তার সাথেও আমার সংগৃহীত বিবরণের মিল খুঁজতে চেষ্টা করেছি। তার চাচাতো ভাই এর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় সে গ্রেফতার হয়েছিল, যার সাথে তার বাবার জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। লুটের কিছু মাল তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। পুলিশের হেফাজতে সে দু'সপ্তাহ কাটায়। তার জবানবন্দির শুরুতে পুলিশ অফিসার ভূমিকায় উল্লেখ করেছে ফুলন দেবী সম্পর্কে 'বয়স প্রায় বিশ বছর, গায়ের রং খানিকটা ফর্সা, গোলগাল মুখ, খাটো এবং গাট্টাগোট্টা গঠন।" ফুলন দেবী জবানবন্দি দিয়েছে, "ছয় সন্তানের পরিবারে আমি দ্বিতীয় এবং ছ'জনের মধ্যে পাঁচজনই মেয়ে। সবার ছোটটি ছেলে। শিব নারায়ণ সিং। আমরা মাল্লা জাতের অন্তর্ভুক্ত এবং গুরহ-কি-পুরওয়া গ্রামে বাস করি। আমার বয়স যখন বার বছর তখন আমাকে পুট্টি লাল নামে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক এক বিপত্নীক লোকের সাথে আমাকে বিয়ে দেয়া হয়।' এরপর সে কানপুরের কৈলাশের সাথে তার দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলেছে। ফুলনের জীবনের অবশিষ্ট কাহিনী বর্ণনা করেছে তার মা মুলি। "বিয়ের ধকল সহ্য করার মতো বয়স ফুলন দেবীর হয়নি। ফলে বিয়ের কয়েকদিন পরই সে আমাদের কাছে ফিরে আসে। এক বছর পর, দু'বছর পরও হতে পারে; আমরা আবার তাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেই। এবার স্বামীর সাথে কয়েক মাস কাটালেও সে অসুখী ছিল। স্বামীর অনুমতি ছাড়াই সে চলে আসে এবং স্বামীর কাছে পুনরায় ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারে সংকল্প ব্যক্ত করে।' সে যে দৈহিকভাবে মিলিত হয়েছে এবং তার সতীচ্ছদ্য ছিন্ন হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারে তার মা। তার মা বর্ণনা করে যে, সে 'পরিপূর্ণ' হয়েছে– কোন মেয়ে যৌন সম্ভোগের শিকার হলে তার স্তন এবং নিতম্ব দেখেই বুঝা যায় বলে এ ব্যাপারে ভারতীয় গ্রামীণ মহিলাদের বিশ্বাস। তার ব্যাপারে আরো বক্তব্য যে, ফুলনের মধ্যে এতো যৌনক্ষুধার সৃষ্টি হয়, যে ক্ষুধা মেটানো তার স্বামীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফুলনের প্রতি তার বাবা মাও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে; কারণ কোন মেয়ে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে পিত্রালয়ে ফিরে এলে তা পরিবারের জন্যে অত্যন্ত নিন্দনীয়। 'আমি তাকে মরে যেতে বলি,' তার মা বলে। 'আমি তাকে কূয়ায় ঝাপিয়ে পড়ে অথবা যমুনা নদীতে ডুবে মরতে বলি। একবার বিয়ে দেয়া মেয়েকে আমরা বাড়িতে রাখতে পারি না। পুট্টি লাল এসে ফুলনকে দেয়া তার রূপার গয়নাগুলো নিয়ে যায় এবং আরেক মহিলাকে বিয়ে করে। আমাদের আর কি করার ছিল? আমরা তার জন্যে আরেকজন স্বামী খুঁজতে শুরু করি। কিন্তু কোন মেয়ের একবার বদনাম হয়ে গেলে তার জন্যে আরেকটি স্বামী পাওয়া সহজ নয়।' ফুলন দেবী পরিবারের মহিষগুলো মাঠে চড়াতে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বাবা মা'র কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরে দূরে থাকতে চেষ্টা করতো। গ্রামের সর্দারের পুত্রের সাথে তার দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এভাবেই। (ভারতের গ্রামে অবিবাহিত যুবক যুবতি ডাল ক্ষেত বা ইক্ষুখেতে যৌনমিলনে লিপ্ত হয়)। গ্রাম সর্দারের পুত্র একদিন বন্ধুদেরকেও আমন্ত্রণ জানায় ফুলনকে

ভোগ করতে। তাদের ইচ্ছায় সাড়া না দিয়ে ফুলন দেবীর আর কোন উপায় ছিল না। গ্রামে গুজব ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয়নি যে, ফুলন যে কারো সাথে শুতে রাজী। 'পরিবারের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের নাক কাটা পড়েছে। নিরূপায় হয়ে আমরা তাকে নদীর ওপরে তিওনগা গ্রামে তার বোন রামকলির বাড়িতে পাঠিয়ে দেই।'

ফুলনের পক্ষে তিওনগাতে আরেকজন প্রেমিক খুঁজে পেতে খুব বেশি সময় লাগেনি। সে তার দূরসম্পর্কের ভাই কৈলাশ। সে বিবাহিত এবং চার সন্তানের পিতা। একটি ডাকাত দলের সঙ্গে কৈলাশের সম্পর্ক ছিল। ফুলন দেবীর প্রতি কিভাবে সে বিমোহিত হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ সে দিয়েছে। 'একদিন যমুনার তীরে আমি কাপড় কাঁচছিলাম। মেয়েটি তার বোনের মহিষ চরাতে চরাতে নদীর ঢালুতে নেমে আসে। আমরা কথা বলতে শুরু করি। সে আমার কাছে সাবান চেয়ে নেয় স্নান করার জন্যে। আমার সামনেই সে কাপড় ছেড়ে নগ্ন হয়। যখন সে শরীরে পানি ছিটাচ্ছিল এবং স্তনও নিতম্বে সাবান মাখছিল তখনো সে আমার সাথে কথা বলে চলছিল। এ অবস্থায় তাকে দেখে আমি উত্তেজিত হয়ে পাড়ি। স্নান সেরে কাপড় পরার পর আমি তাকে অনুসরণ করে ডাল ক্ষেতে যাই। তাকে সেখানে মাটিতে ফেলে তার উপর উপগত হই। আমি খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাই। আমি তাকে অনুনয় করি আবার আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে। পরদিন সে একই সময়ে একই স্থানে আসবে বলে সম্মত হয়।'

'আমরা অনেকবার মিলিত হয়েছি। কিন্তু কখনোই তা যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু এক পর্যায়ে সে শক্ত অবস্থান নিয়ে নেয়। 'আমাকে যদি পেতে চাও, তাহলে অবশ্যই আমাকে বিয়ে করতে হবে। তখন তুমি যা চাও, আমি সব দেব,' ফুলন বলে। আমি তাকে বলি যে, আমার স্ত্রী এবং বাচ্চা আছে এবং তাকে শুধু রক্ষিতা হিসেবেই রাখতে পারি। কিন্তু তাকে বিয়ে করতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত সে আমাকে তার শরীর স্পর্শ করতে না দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল। এতএব আমিও বেপরোয়া হয়ে উঠি। তাকে সাথে নিয়ে কানপুরে যাই। একজন আইনজীবী আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে এক টুকরা কাগজে কি সব লিখে দেয় এবং বলে যে, এখন থেকে আমরা স্বামী-স্ত্রী। আমরা দু'দিন কানপুরে কাটাই। দিনের বেলায় আমরা সিনেমা দেখতাম, আর রাতে দৈহিকভাবে মিলিত হতাম এবং একে অন্যের হাতে মাথা রেখে ঘুমাতাম। আমরা তিওনগাতে ফিরে এলে আমার বাবা-মা আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আমরা এক রাত মাঠে কাটাই। পরদিন আমি ফুলন দেবীকে বলি তার বাবা-মা'র কাছে ফিরে যেতে। কারণ আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ফুলন ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে হত্যা করার শপথ উচ্চারণ করে। এরপর থেকে আমি তাকে আর দেখিনি। কিন্তু আমি এখনো ভয়ে ভয়ে থাকি যে, একদিন সে আমাকে ধরে ফেলবে।'

'তোমার ফুলন দেখতে কেমন?' আমি কৈলাশের কাছে জানতে চাই। 'আমি শুনেছি যে, দেখতে সে তার বোন রামকলির মতোই।'

'ফুলন একটু বেঁটে, ত্বক ফর্সা এবং দেহের গড়নটা সুন্দর। রামকলির চাইতে সে দেখতে সুন্দরী।'

'আমি একথাও শুনেছি যে, সে খুব নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করে।'

'আমার সাথে সে কখনো কঠোরভাবে কথা বলেনি। আমার সাথে সে শুধু ভালোবাসার কথাই বলেছে।'

ফুলন দেবী নিজেকে আয়ত্তে রাখতে সচেষ্ট ছিল। কৈলাশ তাকে ছেড়ে বিদায় নেয়ার কিছুদিন পরই গ্রামের এক মেলায় কৈলাশের স্ত্রী শান্তির সাথে ফুলনের দেখা হয়। শান্তি ফুলনের উপর চড়াও হয়। তার চুল ছিঁড়ে ফেলে, মুখ খামচে দেয় মেলাভর্তি লোকের সামনে। শান্তি তাকে বেশ্যা, কুত্তী ইত্যাদি নোংরা গালি দেয়। যে বিষয়গুলো মাত্র কয়েক ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা এখন সবার সাধারণ জ্ঞানে পরিণত হয় যে, ফুলন একজন বেশ্যা। যেন এটাও যথেষ্ট নয়। গ্রামের সর্দারের ছেলে ভাবতো যে, ফুলন শুধুমাত্র তার সম্পত্তি, সে কৈলাশের সাথে ফুলনের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা জানার পর ফুলনকে বাড়িতে তলব করে জুতা দিয়ে তাকে পিটালো। এভাবে মাত্র আঠার বছর বয়সেই ফুলন নিজেকে সবার কাছ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেল। তার বাবা-মা তাকে চায় না, বৃদ্ধ স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে, দ্বিতীয় বিয়েও মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। যাদের সাথে সে শুয়েছে তাদের কেউই তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। তার মনে হলো যে, এ পৃথিবীতে একজন লোকও নেই যে তার সাথে কিছু করতে চায়। তার সামনে দু'টি পথ খোলা ঃ দূরের কোন শহরে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করা অথবা আত্মহত্যা করা। এমন সময়ও গেছে যখন সে কূয়ায় ঝাপিয়ে পড়তে চেয়েছিল।

সহসা, তার সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন তার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করলো। এটি ছিল তরুণ বিক্রম সিং। সে কৈলাশের বন্ধু এবং বাবু গুজ্জার নামে এক ব্যক্তির পরিচালিত ডাকাত দলের সদস্য। বিক্রম সিং ফুলনকে গ্রামের আশেপাশে দেখা ছাড়াও ডাল ক্ষেতে তার দৈহিক মিলনের কীর্তিকলাপের কাহিনী শুনেছে। একদিন বিকেলে সে তার দলের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে গুরহ-কি-পুরওয়া গ্রামে এল এবং ফুলনের বাবা-মা'র কাছে গিয়ে স্পষ্টভাবে বললো যে, সে তাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু ফুলন কিছুতেই যাবে না। সে মাটিতে থুথু ফেলে বললো, 'আমার স্যান্ডেল দিয়ে পিটিয়ে তোর সাথে কথা বলবো। বিক্রম সিং তার চাবুক দিয়ে ফুলনকে আঘাত করলো। ফুলন গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়ে ওরাই নামক গ্রামে তার আরেক বোন রুক্মিনির সাথে বসবাস করতে লাগলো। সেখানে থাকতেই সে জানতে পারলো যে, চাচাতো ভাই এর বাড়িতে ডাকাতি করার অভিযোগে তার ও কৈলাশের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। যে লোকটি তাকে ধরে থানায় নিয়ে গেল পুলিশের কাছে হস্তান্তরের পূর্বে সে তাকে ধর্ষণ করলো। পনের দিন সে হাজতে কাটালো। সে বাড়ি ফিরে এলে বিক্রম সিং আবার তার সাথে সাক্ষাত করতে এলো। বিক্রম তাকে হুমকি দিল যে 'হয় তুমি আমার সাথে চলো, তা না হলে আমি তোমার ভাই শিব নারায়ণকে আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি।' ফুলন তার ভাইটিকে খুব ভালোবাসতো। তার বয়স এগার বছর এবং সে গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করে। কিছু বাকবিতন্ডার পর ফুলন বিক্রমের সাথে যেতে সম্মত হলো।

কৈলাশের বর্ণনা অনুসারে বিক্রম সিং ফর্সা, দীর্ঘ এবং শক্তিশালী। নিশ্চিতভাবেই ফুলনকে মনে ধরেছিল বিক্রমের। সে ফুলনের দীর্ঘ চুল ছেঁটে দেয়। তাকে একটি ট্রানজিস্টর রেডিও এবং ক্যাসেট রেকর্ডার দেয়। কারণ ফুলন সিনেমার গান শুনতে পছন্দ করতো। সে তাকে খাকি শার্ট এবং জিনসের প্যান্ট কিনে দেয়। তাকে বন্দুক চালানো শিখায়।

নিজেকে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বলে প্রমাণ করে ফুলন শিগগির গুলি করে লক্ষ্যভেদ করতে শিখে।

জীবনে প্রথমবারের মতো ফুলন নিজেকে কারো কাংখিত বলে অনুভব করলো। বিক্রম সিং এর প্রেমে সাড়া দিল সে এবং নিজেকে বিক্রমের প্রেমিকা হিসেবে বর্ণনা করতো। নিজের জন্যে একটি রাবার স্ট্যাম্প তৈরি করিয়ে নিয়েছিল সে, যা সে চিঠি লিখার সময় ব্যবহার করতো। এতে শব্দগুলো ছিল ঃ 'দস্যু সুন্দরী, দস্যু সম্রাট বিক্রম সিং কি প্রেমিকা।' বিক্রম সিং এর প্রেমিকা হওয়া সত্ত্বেও ফুলন দেবীর বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না। সে পছন্দ করুক আর নাই করুক, দলের অবশিষ্টদেরকেও তার দেহের স্বাদ গ্রহণ করতে দিতে হতো। তখন দল নেতা ছিল বাবু গুজ্জার এবং সে নিষ্ঠুর প্রকৃতির যৌনলিপ্সু। দলের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের নিজস্ব পদ্ধতি ছিল তার। প্রকাশ্য দিবালোকে এবং সকলের সামনেই সে যৌন সম্ভোগ পছন্দ করতো। অতএব প্রকাশ্যে বাবু গুজ্জারের দ্বারা ধর্ষিত ও নিগৃহীত হওয়ার জন্যে নিজেকে নিবেদন করা ছাড়া ফুলনের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্যই ছিল না। ফুলনকে সঙ্গম করতে যখন বিক্রম সিং এর পালা আসতো তখন ফুলন এই অমর্যাদাকর অবস্থা সম্পর্কে বিক্রমের কাছে অভিযোগ করতো। ততোদিনে ফুলনের উপর অধিকার সম্পর্কে বিক্রমের মধ্যে প্রবল বোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু তা স্বীকার করার মতো সাহস তার ছিল না। কিন্তু এক রাতে বাবু গুজ্জার যখন ঘুমিয়ে ছিল বিক্রম সিং তখন তার মাথায় গুলি করে। সে দলের নেতা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে এবং ফুলন দেবীর পীড়াপীড়িতে বিক্রম দলের অন্য সদস্যদের নিষেধ করে যাতে তারা ফুলনকে আর স্পর্শ না করে। এ নিয়ে দলে খুব একটা অসন্তোষ দেখা দেয়নি। কারণ দলটি শিগগির কুসুম নয়ন নামে আরেকজন মেয়েকে সংগ্রহ করেছিল। কুসুম দেখতে ফুলনের চাইতে সুন্দরী এবং ঠাকুর জাতের। সে লাল রাম সিং ও শ্রী রাম সিং– দু'ভাই এর সাথে কাটাতে পছন্দ করতো। দু' মহিলা পরস্পর ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল।

পুরুষদের সাথে বহু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ফুলন দেবী পুরুষ নাচানোর অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। সে জানতো যে, তার সুপুষ্ট স্তন এবং গোলাকৃতির নিতম্ব পুরুষের মনে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তবু সে তার দলের লোকদের উপস্থিতিতেই স্নান করতো। পুলিশ হেফাজতে থাকা তার দলের এক সদস্য যে কুসুম নয়ন ও মীরা ঠাকুরকেও জানতো, তার মতে, 'অন্য মেয়ে দু'টিও ফুলনের মতোই কঠোর। কিন্তু তারা পুরুষের সাথে দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রে অথবা স্নানের সময় গাছ বা ঝোপের আড়ালে যেত। কিন্তু ফুলন আমাদের সামনে তার জামা-কাপড় এমনভাবে খুলতো, যেন আমরা অস্তিত্বহীন। অন্য মেয়েরা যে ভাষা ব্যবহার করতো তা মেয়েদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু

আমি যতোবার ফুলনকে দেখেছি তার মুখে নোংরা কথা ছাড়া আর কিছু শুনিনি। সে মুখ খুললেই নোংরা গালি বেরুতো ঃ 'গান্ডু, মাদারচোদ, বেটিচোদ।'

পুলিশ ইন্সপেক্টরের ফাইলে তাকে উদ্দেশ্য করে ফুলন দেবীর পক্ষ থেকে লিখা এক গুচ্ছ চিঠি। শোভন ও অমার্জিত শব্দ মিশিয়ে লিখা চিঠিগুলো। আমাকে একটি চিঠি পাঠ করে শোনানো হলো, যা শুরু করা হয়েছে দেবী মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। চিঠিটি অনেকটা এরকম ঃ "সন্মানিত এবং শ্রদ্ধেয় ইন্সপেক্টর জেনারেল সাহেব, আমি বিভিন্ন হিন্দি পত্রিকা থেকে জানতে পেরেছি যে, আপনি আপনার বক্তৃতায় বলে বেড়াচ্ছেন যে, আপনি আমাদের ডাকাতদের নেড়িকুত্তার মতো গুলি করে মারবেন। আমি আপনাকে হুশিয়ার করে দিচ্ছি যে, আপনি যদি এ ধরনের 'বাকওয়াস' বন্ধ না করেন, তাহলে আমি আপনার শ্রদ্ধেয়া মাকে অপহরণ করাবো এবং আমার লোকদের দ্বারা এমন ভাবে সঙ্গম করাবো যে, তার ভালোরকম চিকিৎসার প্রয়োজন পড়বে। অতএব কথাটা মনে রাখবেন।"

বিক্রম সিং ফুলন দেবীকে পুরোপুরি নিজের এখতিয়ারে রাখা ছাড়াও দলের নেতা হিসেবে কুসুম নয়নকে উপভোগ করার অধিকারও দাবী করে। এর ফলে ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়। তারা বিক্রম সিং এর দল ত্যাগ করে এবং তাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ১৯৮০ সালের ১৩ আগস্ট রাতে তারা বিক্রম সিংকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করে। ধারনা করা হয় যে, এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল বেহমাই এ এবং তার মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করার আগে ঠাকুররা মৃতদেহের উপর লাথি দেয়া ছাড়াও নানাভাবে অপমানজনক আচরণ করে।

লাল রাম সিং এবং শ্রীরাম সিং এ ঘটনার পর ফুলন দেবীকে বেহমাইতে আটকে রাখে। পুরো গ্রামবাসীর সামনে তার উপর নিপীড়ন চালায় এবং অপমান করে। এক রাতে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে যাওয়ার ভান করে সে অন্ধকারে মিশে যায়। যমুনা নদী অতিক্রম করে সে মাল্লাদের গ্রাম পাল এ যায়। সেখান থেকে সে মুসলিম ডাকাত সর্দার বাবা মুস্তাকিমের সংস্পর্শে আসে এবং বিক্রম সিং এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে তার কাছে আবেদন জানায়। বাবা মুস্তাকিম এতে রাজী হয়। এভাবেই ১৯৮১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বেহমাই এর হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ফুলন দেবী তার প্রেমিক হত্যার প্রতিশোধ নেয়।

গায়রুন্নিসা হাফিজ

আমার বয়স যখন সতের বছর তখন হায়দরাবাদের গায়রুন্নিসা হাফিজ আমার জীবনে আসে। সে আমার চাইতে বয়সে কয়েক বছরের বড় এবং দিল্লিতে এসেছিল লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে যেখানে তার বড় বোন পড়তো।

চিকিৎসা শাস্ত্রে এক বছর পড়াশুনার পর সে লেডি আরউইন কলেজে ভর্তি হয় গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে ডিগ্রি নেয়ার জন্যে। আমার ছোট বোন সেই কলেজের ছাত্রী ছিল। তারা দু'জন ঘনিষ্ঠ বান্ধবীতে পরিণত হয়। একবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে তাকে আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সে আসে বোরখা পরে। আমার বোনের পীড়াপীড়িতে সে বোরখা খুলে ফেলে এবং পরিবারের সবার সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। আমার জন্যে এটি আজব অভিজ্ঞতা। বোরখা খুলে মুখ উন্মোচন একটি নাটকীয় ঘটনা, ঠিক থিয়েটারে পর্দা তুলে ফেলার পর রংবেরং এর আলোকসজ্জিত দর্শনীয় মঞ্চের অবিভার্বের মতো, রূপকথার কোন স্থানের মতো।

তাকে দেখে আমার প্রথম ধারণা হলো সে অতুলনীয় সুন্দরী। ছোটখাট গড়নের, ফোলা ফোলা মুখ, ফর্সা এবং হালকা বাদামী কোঁকড়া চুল। আঞ্চলিক টান ছাড়াই সে ইংরেজীতে কথা বলতো। দাক্ষিণাত্যের চমৎকার উর্দু উচ্চারণ তার। আমি বিস্মিত হলাম যে, বয়ঃসন্ধির এতোগুলো বছর সে পর্দার অন্তরালে অবস্থান করেও সে এতো আর্কষণীয়া ও অগ্রসর হতে পারে।

আমাদের বাড়িতে প্রথম বার আসার কয়েক দিন পর আমার বোন ও আমি তাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলাম। দু'জনের মাঝখানের আসনে বসলাম আমি। বাতি নিভে যাওয়া মাত্র সে আমার একটি হাত নিয়ে তার শাড়ির ভাঁজের নীচে ধরে রাখলো। বুনো আনন্দে আমি আত্মহারা হলাম।

একবার সে আমাদের বাড়িতে একটি সন্ধ্যা কাটানোর অনুমতি পেল। আমি তাকে আনতে গেলাম এবং সোজা বাড়িতে আনার পরিবর্তে তাকে দিল্লি এবং আশেপাশে লং ড্রাইভে নিয়ে গেলাম। তখন দিল্লিতে হালকা জনবসতি ছিল এবং এখানে সেখানে পাথুরে প্রকৃতি উদ্দাম আমন্ত্রণ জানাতো। আমরা কখনো পরস্পরের হাত ধরে রাখা এবং ভালোবাসার বাক্য বিনিময়ের অতিরিক্ত কিছু করিনি। অবিবাহিতরা একে অন্যকে জানতে কতোদূর পর্যন্ত এগুতে পারে সে সম্পর্কে সে অত্যন্ত দৃঢ় ছিল।

আমরা একে অন্যকে দীর্ঘ চিঠি লিখতাম। ইংল্যান্ডে অবস্থানের বছরগুলোতেও আমাদের পত্র বিনিময় অব্যাহত ছিল। কিন্তু তার চিঠি ক্রমে ছোট এবং এক সময়ে বন্ধ হয়ে গেল। আমার বোনের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে গায়রুন্নিসা এক মুসলিম সেনা আফিসারকে বিয়ে করেছে এবং তার স্বামীও হায়দরাবাদী।

গায়রুন্নিসার সাথে আমরা সংক্ষিপ্ত এবং কিছুটা-প্লেটোনিক সম্পর্ককে আমার জীবনে এতোটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করার কারণ এই সম্পর্ক মুসলমানদের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল।

আমার সময়ের সব হিন্দু ও শিখদের মতো আমি মুসলমানদের সম্পর্কে নিন্দনীয় ধারণা নিয়ে এবং মুসলিম বিদ্বেষ নিয়ে বড় হয়েছি। আমার উর্দু শিক্ষক মৌলভী সাইফুদ্দিন নায়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে আমার মধ্যে প্রথম চেতনার উদয় হয়। তার মতো দৃঢ়চেতা এবং আল্লাহ্‌ভক্ত লোক আমি শৈশবে আর দেখিনি।

এরপর আমার জীবনে এলো গায়রুন্নিসা হাফিজ, যে আমার কাছে প্রমাণ করেছিল যে, দু'টি সম্প্রদায়ের সদস্যরা একে অন্যকে ভালোবাসতে পারে। কেউ যদি অন্য সম্প্রদায়ের কারো প্রেমে পড়ে, তাহলে সে আসলে তার সম্প্রদায়ের সবার প্রেমেই পড়ে। এছাড়া ছিল মনজুর কাদির। এসব লোকের সাথে পরিচিত হবার পর আমি এক ধরনের নবিশী উপসংহারে উপনীত হয়েছিলাম যে, ভারতীয় মুসনলমানরা কোন খারাপ কাজ করতে পারে না।

ত্রিশ বছর পর গায়রুন্নিসা আমার জীবনে আবার আবির্ভূত হলো। আমার বোন বাবা মা'র বাড়িতে আমাকে নাশতা করার জন্যে ডেকেছিল। আমি সেখানে পৌছলে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি এই মেয়েটিকে চিনতে পারছো?' অবশ্যই! এটি তো গায়ুর-গায়রুন্নিসা। সে আর মেয়েটি নেই, মাঝবয়সী মহিলা। দু'জন স্বামী পরিত্যাগ করেছে। তার সাথে এক সুন্দরী তরুণী, ফারিসা; প্রথম স্বামীর তরফের কন্যা। ফারিসা লেডি আরইউন কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমাকে তার স্থানীয় অভিভাবক নিয়োগ করা হয়েছে। কলেজের ছাত্ররা ফারিসাকে খুব পছন্দ করে। যখনই সে ছেলেদের সাথে বাইরে যায়, তখন একটি নোট লিখে যায় যে, সে তার স্থানীয় অভিভাবকের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে কাটিয়েছে, এই মর্মে আমার কাছ থেকে চিঠি সংগ্রহ করতে তার কোন অসুবিধা ছিল না।

ফারিসা তার ইংরেজ স্বামীর সাথে তার প্রথম হানিমুন কাটায় আমার বাড়িতে। পরে সে ইংরেজ স্বামীকে তালাক দিয়ে এক সুইডিশ ব্যাংকারকে বিয়ে করে। হংকং এ সে রুচিসম্মতভাবে ব্যবসা করতো। আমি কখনো হংকং এ গেলে তার সাথে কাটাতাম। দুই স্বামীর তরফ থেকে তার দু'টি সন্তানের নানা ছিলাম আমি।

গায়রুন্নিসার সাথে পুনরায় যোগসূত্র স্থাপিত হবার পর আমি তা আর হারাইনি। যখনই আমি হায়দরাবাদে গেছি। আমাদের সন্ধ্যাগুলো একত্রে কাটিয়েছি। তার স্বাস্থ্য খুব ভেঙ্গে পড়েছিল এবং প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে অত্যন্ত ধর্মপরায়নও হয়েছিল। প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ আদায় এবং আল্লাহর কাছে তাকে ডেকে নেয়ার জন্যে প্রতিদিন একবার প্রার্থনা করতো। হায়দরাবাদে তাকে শেষ বার আমি বয়স্কা মহিলাদের

আবাসস্থল ওল্ড লেডিজ হোমে' খুজে পাই। সে আমাকে একটি দরগায় নিয়ে যায়, যেখানে তার বাবা মা ও বোনদের করবস্থ করা হয়েছে। নিজের কবরের জন্যে সে একটি জায়গা কিনে রেখেছে। 'পনের বছর আগে আমি দেড় হাজার টাকা দিয়ে জায়গাটা কিনেছি। এখন এর দাম পনের হাজার টাকার বেশি।' সে আমাকে বললো। 'তুমি তো এটা বিক্রি করে বেশ লাভ করতে পারো?' তাকে উৎফুল্ল করার জন্যে আমি বললাম। আমার পরামর্শ সে অগ্রাহ্য করলো। 'কবরের উপর আমি লবন ছিটিয়েছি। এটি হায়দরাবাদী রীতি এবং আমি ছাড়া এখানে আর কাউকে কবর দেয়া যাবে না।'

আমি যখন চলে আসছিলাম, গায়রুন্নিসা বলেছিল, 'এ পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার কথা ভাবার মতো আর কেউ নেই। ফারিসা তার নিজের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। খুব কম সময়ই আমাকে লিখে। আমার বাবা মা এবং বোনদের সবাই মারা গেছে। আল্লাহ্ কেন আমার মোনাজাত কবুল করে আমাকে তলব করছেন না? আমি আর বেঁচে থাকতে চাইনা।'

সাদিয়া দেহলভী

১৯৮৭ সালে আমিনা আহুজার ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তার সাথে প্রথম সাক্ষাত হয় আমার। 'আসুন, আসুন, সাদিয়া দেহলভীর সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি,' জনাকীর্ণ একটি রুমের কেন্দ্রস্থলে মোড়ার উপর বসা একটি মেয়ের দিকে আমার হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন আমিনা আহুজা। মেয়েটি উঠে দাঁড়ানোর সৌজন্যও দেখালো না। তার বড় বড় কামনাপূর্ণ চোখে শুধু আমাকে দেখলো। তার কুচকুচে কালো চুল কোকড়ানো অবস্থায় তার গোলগাল মুখের উপরও ছড়ানো। 'তুমি এতো সুন্দরী কেন?' এ কথাটা মুখ দিয়ে বের করা ছাড়া তাকে আর কিছু বলার কথা ভাবতে পারলামনা।'

আমি তার সাথে কথা বলে ঘণ্টা খানেক কাটাই। তাকে আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাই আমার পরিবারের সবার সাথে পরিচিত হতে। সেদিন থেকে রেজা পারভেজের সাথে তার বিয়ে এবং পাকিস্তানে চলে যাওয়া পর্যন্ত সাদিয়া আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। আমাদের উভয়ের বয়সের ব্যবধান বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অথবা সে যে উত্তর ভারতের অতি পরিচিত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার থেকে এসেছে এবং আমি একজন বয়স্ক শিখ, যাকে কুৎসা রটনাকারী সংবাদপত্রগুলো প্রায়ই 'দিল্লির নোংরা বৃদ্ধ লোক' বলে বর্ণনা করে থাকে, এসবের কোনকিছুই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। যদিও আমি বরাবর আমাদের এ বন্ধুত্ব শুধু আমাদের মধ্যেই টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম, কিন্তু সাদিয়া তা করেনি। সে তার বাড়ির ছাদ থেকে এবং বোম্বের গুজব ছড়ানো সংবাদপত্রে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করে গেছে যে, 'খুশবন্ত সিং আমার জীবনে একমাত্র পুরুষ।'

সাদিয়া দেহলভী আবেগের দিক থেকে ছিল সম্পূর্ণ বাছবিচারহীন এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। ঘণ্টা ধরে সে আমাকে তার জীবনে আগত পুরুষদের কথা বলেছে। তার একটি বিপর্যয়পূর্ণ বিয়ে হয়েছিল কলকাতার প্রভাবশালী উর্দু দৈনিক পরিচালনায় নিয়োজিত তাদের পরিবারেরই ছিটকে পড়া একটি অংশে। তার স্বামী ছিল মাতৃ-অনুগত এবং সহিংস। সাদিয়া তাকে তালাক দিয়ে বাবা মার কাছে চলে আসে। অস্থির চরিত্রের মেয়ে সে, বারবার চাকুরি বদল এবং বন্ধু ও ভক্ত বদল করে একদিন সে একটি বুটিক চালু করে, কয়েক মাসের মধ্যে লাখ লাখ টাকা আয় করবে বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এবং কয়দিন পরই বুটিক বন্ধ করে দেয়। এর ক'দিন পর সে আসবাবপত্রের ব্যবসা শুরু করে। রেস্টুরেন্ট চালু করে অধিক মুনাফার আশায়; কিন্তু ক'দিনের মধ্যে তা গুটিয়ে কার্পেট রফতানি করে আরো অধিক অর্থ কামানোর স্বপ্ন দেখতে থাকে।

একসময় তার মাথায় ঝোঁক চেপেছিল রাজনীতি করার। মিরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে সে একটি দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সেখানে যায় এবং দাঙ্গা উপদ্রুত মিরাটের মুসলিম প্রধান এলাকা জামিয়া নগর ও জাকিরবাগে পরিস্থিতি শান্ত করতে চেষ্টা করে। বেশ ক'বার সে বিদেশে যায়। একবার ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তার অর্থ ফুরিয়ে যায় এবং একটি পাবে বারমেইড হিসেবে গ্রাহকদের বিয়ার পরিবেশন করে। তার কৃত পাপ মোচনের জন্যে ভারতে ফেরার পথে মক্কা ও মদিনায় যাত্রা বিরতি করে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্য। লেখার ব্যাপারে তার নৈপুণ্য ছিল অনেকটা সহজাত এবং 'ইন্ডিয়া টুডে' এবং 'দি টাইমস অব ইন্ডিয়ায়' সে নিয়মিত লিখার জন্যে কলাম চালু করেছিল। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে হয়নি। তার উৎসাহ মাত্র কয়েক সপ্তাহ টিকে ছিল। সে যাই করতো তাতেই যথাশীঘ্র বিরক্ত হয়ে পড়তো। এবার সে ঘোড়া চালনা শিখতে লাগলো, এরপর সিদ্ধান্ত নিল বিমান চালনা শিখবে। সাদিয়া একজন মৌলভীকে ঠিক করলো তাকে ফারসি ও আরবি শিখানোর জন্যে। এরপর তার জীবনের প্রতি আকাংখা বৃদ্ধি পেল এবং পন্ডিত হওয়ার আগ্রহ জন্মালো। সে প্রাণী ভালোবাসতো এবং একবার সে ছোট্ট স্প্যানিয়েল কুকুর কিনেছিল। এরপর একদিন সে কুকুরটিকে তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কামনা প্রসাদের বাড়িতে রেখে এল এই বলে যে, সন্ধ্যায় সে কুকুরটিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তিনদিন পর কামনা কুকুরছানাটিকে সাদিয়ার বাড়িতে রেখে আসে।

সাদিয়া দেহলভীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অনেকটা ফড়িং এর মতো বলা যেতে পারে। সবকিছুর উপরে সে ভালবাসতো নিজেকে। একবার সে রাজীব গান্ধীর সফর সঙ্গী হিসেবে বিদেশে গিয়েছিল সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে। প্রধানমন্ত্রীর পর তার চেহারাই সবচেয়ে ফটোজেনিক ছিল বলে সে টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমকে বেশী আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। কিছুদিনের জন্যে তার মাথায় কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেয়ার চিন্তা কাজ করেছে, যাতে পার্লামেন্টের কোন না কোন হাউসের সদস্য হওয়া যায়। কিন্তু শিগগির তার বিরক্তি ধরে গেল।

একটি বিষয়ে সাদিয়া অটল ছিল, তা হচ্ছে বিয়ে করার ব্যাপারে। বরং বলা যায়, সে একজন মা হতে চেয়েছিল। তার স্বামীকে একজন মুসলিম হতে হবে। তার সন্তানের পিতাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। যখন মরহুম ইসমত চুগতাই তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সাহসী হয়ে একটি 'বেজন্মা'কে জন্ম দিতে; সাদিয়া দেহলভী তাতে আতংকিত হয়ে পড়েছিল।

বহু সুযোগ্য পুরুষ তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল বিয়ে করার জন্যে। সে তাদেরকে আশ্বস্ত করলেও বিয়ের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত তার চাইতে বিশ বছরেরও বেশি বয়স্ক রেজা পারভেজকে সে বিয়ে করে। তালাকপ্রাপ্ত রেজা পারভেজের দু'টি বয়স্ক সন্তান ছিল এবং সে শিয়া গোত্রভুক্ত (সাদিয়া ছিল সুন্নী)। সাদিয়ার মা বিয়ের দিন পর্যন্ত তাকে বলছিলেন যে, সে যদি এখনো তার সিদ্ধান্ত বদলাতে চায় তাহলে সে নিকাহনামা স্বাক্ষর করার আগেই তা করতে পারে। সে তার সিদ্ধান্ত পাল্টায়নি। রেজাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তার সম্মতিদানের সাক্ষী হিসেবে আমিও নিকাহনামায় স্বাক্ষর করি। আমি

ভেবেছিলাম' সাদিয়া পাকিস্তানী নাগরিকত্ব গ্রহণ করবে এবং আমার জীবন থেকে বেরিয়ে যাবে। আরো একবার তার ব্যাপারে আমার ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

সাদিয়া এবং রেজা বিয়ে করার কয়েক মাস পর তারা ইসলামাবাদ বসবাস শুরু করার পর আমার মনে হয় তাদের দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উপর মনজুর কাদির স্মারক বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণে আমি পাকিস্তান সফরে গেলে তারা আমার সাথে সাক্ষাত করতে লাহোরে আসে। সাদিয়া অনুষ্ঠানে এসেছিল জাঁকজমকপূর্ণ শাড়ি পরে। বহু পাকিস্তানী মহিলা অপরিবর্তনীয়ভাবে সালোয়ার-কামিজ পরে না। সে কপালে লাল টিপ পরেছিল। পাকিস্তানে টিপ পরাকে কুফরীর চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং শুধু বিধর্মীরাই টিপ ধারণ করে বলে মনে করা হয়।

সে এমন একটি দেশে নিজেকে ভারতীয় হিসেবে রেখেছিল যেখানে ভারতকে এক নম্বরের শত্রু দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক পর্যায়ে ছিদ্রান্বেষী এক পাকিস্তানী সাদিয়াকে ভারতীয় গোয়েন্দা বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। পাকিস্তানী সমাজে তাকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত করা হয়। রেজা পারভেজ তার চাকুরি হারায়। সাদিয়া দেহলভী দ্বিধাগ্রস্ত ও অসুখী হয়ে পড়ে। গৃহলক্ষ্মী হওয়া দূরে থাক, সে স্বামীর জন্যে দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। দিল্লিতে ফিরে এসে সে চাকুরির সন্ধান করতে থাকে। পাশাপাশি স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হয়ে সে জানতে চায়, তার গর্ভসঞ্চার হচ্ছে না কেন। সাদিয়া আমাকে একান্তে বলেছে যে, রেজা তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। দম্পতিটি পাকিস্তানে ফিরে যায়। সংসার নির্বাহের জন্যে রেজাকে তার করাচির বাড়ি বিক্রয় করে ফেলতে হয়। ধীরে ধীরে ভাগ্যের চাকা তাদের অনুকূলে ফিরে। রেজা একটি চাকরি লাভ করে। সাদিয়া গর্ভবতী হয়। তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়। তারা পুত্রের নাম দেয় আরমান। ছ'মাস পর সাদিয়া আরমানকে তার আসল দাদা অর্থাৎ আমাকে দেখাতে নিয়ে আসে। আমার কোন বই তার নামে উৎসর্গ না করায় সাদিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করে। অতএব আমি আমার 'নট এ নাইস ম্যান টু নো' বইটি তার নামে উৎসর্গ করি। 'টু সাদিয়া দেহলভী হু গেভ মি মোর অ্যাফেকশন এন্ড নটোরিয়ারিটি দ্যান আই ডিজার্ভড।' (সাদিয়া দেহলভীকে, যার কাছে আমি আমার প্রাপ্যের চাইতেও অধিক ভালোবাসা ও কুখ্যাতি পেয়েছি।)

আনিস জং

সবচেয়ে বাকপটু এবং বৈঠকী আলোচনায় পারদর্শী যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলা হলে আনিস জং এর নামই তালিকার শীর্ষে স্থান পাবে। যদিও আমি কখনো নিশ্চিত হতে পারিনি যে, সে আমাকে যা বলেছে তা সত্য ছিল নাকি ফ্যান্টাসির অংশবিশেষ।

রসিকতা করে সে যে কাউকে আকৃষ্ট করতে পারতো এবং পরক্ষণেই অন্যদের সাথে আলোচনায় লিপ্ত হয়ে তাকে আর আমলেই আনতো না। তাকে কেউ মোকাবিলা করলে সে সোজা অস্বীকার করে বসতো যে, কখনো সে এমন বলেনি। আমার সাথে সব সময় সে এমনই করেছে, তবুও আমি তার সাথে সময় কাটানোর জন্যে এখনো অপেক্ষা করি। সে অত্যন্ত সেবাপরায়ণ, মজার মজার খাবার এবং পুরনো মদ পরিবেশন করে বন্ধুদের। অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে প্রায়ই সে গান গায়। সে সহজে লোকদের নাম বিস্মৃত হয়, কিন্তু বিস্ময়কর সত্য হচ্ছে, যেসব নাম ভুলে যাওয়ার ভান সে করে আসলে সবই তার মনে থাকে।

তার বাড়িতে দেশের প্রেসিডেন্ট, কেবিনেট মন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা, গভর্ণর, জাতীয় ব্যক্তিত্ব, কবি, লেখক, রাষ্ট্রদূত ও কাউন্সিলরদের আগমন ঘটে।

তার মতে মানুষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, 'রেনেসার ভদ্রলোক, চমৎকার পোশাক পরিহিত, সুচারু, শিল্পরুচিসম্মত, সাহিত্য-বোদ্ধা। তার নিজস্ব প্রতিমূর্তিও ছিল রেনেসাঁ যুগের ভদ্রমহিলার, যাকে ঘিরে রাখতো পুরুষের দল। তার চিন্তারাজ্যের পরিকল্পনায় কোথায় নিজেকে খাপ খাওয়াবো?

যাহোক আমিই তাকে প্রথম একটি চাকুরি দিয়েছিলাম। ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে আমি তাকে জানি। এবং যদিও প্রায়ই লোকদের আড়ালে তাদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য ও ছন্নছাড়া ভাব দেখিয়ে বাড়াবাড়ি করতো কিন্তু আমি তাকে ছেড়ে দেইনি। সে আমার প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখতো, যা আমি কখনো রাখতে পারিনি।

১৯৬০ এর দশকের প্রথমদিকে আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ডিগ্রি নিয়ে সে ফিরে আসে। আমার স্ত্রীকে এটা জানাতে ফোন করে যে, বোম্বেতে আমাদের ছেলের সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে এবং সে তাকে পরামর্শ দিয়েছে যখন সে দিল্লিতে যাবে তখন তার বাবা মা'র সাথে যোগাযোগ রাখে। তাকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয় আমরা দু'জনই তার সাথে পরিচিত হয়ে ও আলাপ করে মুগ্ধ হই। তার নামের সাথে অভিজাত হায়দরাবাদী পদবী যুক্ত ছিল 'জং'।

সে ইংরেজী বলতো সামান্যতম আমেরিকান টান ছাড়াই এবং হিন্দুস্থানীয় কথা বলতো কিছুটা দাক্ষিণ্যাত্যের উচ্চারণে এবং কথা বলার সময় লিঙ্গ মিলিয়ে ফেলতো, যা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হতো। সে একটি চাকুরির তালাশে ছিল। তাকে দেয়ার মতো সাময়িক একটি কাজ ছিল আমার তত্ত্বাবধানে। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছে এমন একদল আমেরিকান ছাত্রদের পরিচালনা করছিলাম আমি। তারা দু'মাস ভারতে কাটাবে। ইতোমধ্যে আমরা দিল্লিতেই একমাস কাটিয়ে দিয়েছি। দ্বিতীয় মাস কাটাতে হবে হায়দরাবাদে। ছাত্র-ছাত্রীগুলোকে হায়দরাবাদের বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে এবং মাঝে মাঝে থাকবে বক্তৃতামালা।

আনিস জং একজন হায়দরাবাদী, যে শহরের ভালো পরিবারগুলোর সঙ্গে পরিচিত। কাজটি সে গ্রহণ করলো, যার সম্মানী বেশ ভালো ছিল। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সে ভালোভাবে পালন করলো। সবগুলো ছাত্র-ছাত্রীর থাকার জন্যে ভালো বাড়ি খুঁজে পেল এবং তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার জন্যে প্রফেসর রশীদউদ্দিন এমপি'র মতো শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদদের সংগ্রহ করেছিল। একই সময়ে সে দিল্লি-হায়দরাবাদ-দিল্লি এয়ার টিকেটের পরিবর্তে সে আমাকে তিনটি টিকেটের দাম দিতে বাধ্য করলো। যে পরিবারটির সাথে সে বাস করছিল তাদের সাথে তার কিছু একটা ঝামেলা হওয়ায় অসৌজন্যমূলকভাবে তাকে বের করে দেয়া হয়। বিপর্যস্ত হওয়ার পরিবর্তে সে তার সহজাত জীবনে ফিরে আসে এবং নগরীতে পরিচিতজনদের তার উপস্থিতি অনুভব করতে দেয়।

যখনই সে আমার সাথে কোন হোটেলে সাক্ষাত করতে আসতো, সে আমেরিকান কনসাল জেনারেলের বিরাট লিমোজিনে চড়ে আসতো। এই কূটনীতিকের দেয়া এক ডিনারে সে অন্যান্যের উপস্থিতিকে ম্লান করে দেয়। আগত অনেক অতিথির ধারণা জন্মে যে, হায়দরাবাদের নিজাম পরিবারের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

আসলে আনিস জং এর পূর্বপুরুষরা হায়দারাবাদের ছিলেন না, তারা ছিলেন লক্ষ্ণৌর। তার পিতা হোসিয়ারজং হায়দরাবাদে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং শিগগিরই নিজামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত বিচক্ষণ লোক এবং কথার যাদুকর ছিলেন। তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সরকারী মর্যাদা দেয়া না হলেও 'নওয়াব' খেতাব দেয়া হয় এবং মাসাহিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সহযোগীতে পরিণত হন তিনি এবং তার বসবাসের জন্যে বিশাল এক প্রাসাদ ও শহরে আরো কিছু বাড়ি দেয়া হয়।

পরিবারটি সামন্ত জাঁকজমকের মধ্যে কাটাচ্ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে রাজ আনুকূল্য থেকে তাকে বঞ্চিত করে তার যা কিছু ছিল তা নিয়ে নেয়া হয়। নওয়াব হোসিয়ার জং এর সম্পদের কোন কিছুর অবশেষ আর ছিল না। যাহোক, আনিস জং এর পিতা হায়দরাবাদের মন্ত্রী-এমনকি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আনিস জং এর এই বিশ্বাসের কারণে তাকে ক্ষমা করা যায়।

বাড়াবাড়ি করা আনিস জং এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট। একবার আমাকে গৌহাটিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এক কানাডীয় মহিলা (ছ'ফুটের বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট) স্যু

ডেক্সটার, যার ইচ্ছা ছিল দু'সপ্তাহের মধ্যে ভারতের যতো বেশি জায়গা দেখা সম্ভব সে দেখবে আমাকে বললো যে, আমার সাথে সে আসতে পারে কিনা। আমি সম্মত হলাম যে সে যেতে পারে। কিন্তু গৌহাটিতে আমার অনেক কাজ থাকবে এবং আমার পক্ষে তাকে খুব একটা ঘুরিয়ে দেখানো সম্ভব হবে না। তাছাড়া তাকে তার নিজস্ব থাকার জায়গা খুঁজে নিতে হবে, কারণ আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সার্কিট হাউজে। সে আনিসকে বললো তার সাথে যেতে। ব্যয়ভার বহন করার স্যু ডেক্সটার। আমরা গৌহাটি পৌছলাম। খালসা হাই স্কুল আমাকে গার্ড অব অনার দিল এবং ব্যান্ডে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হলো। দু'মহিলা আমার সাথে সার্কিট হাউজে এল। স্যু ডেক্সটার ছোট এক হোটেলে একটি রুম পেয়েছিল। আনিস জং আসামের গভর্ণর বি কে নেহরুকে ফোন করে বললো যে, সে তার পুত্রের বন্ধু এবং গৌহাটিকে ভালো থাকার জায়গা সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। তাকে রাজভবনে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো।

পরবর্তী তিনদিন আমাদের তিনজন গভর্ণরের গাড়িতে উঠে ব্রহ্মপুত্রের তীরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ফিরেছি।

বোম্বেতে ভারতীয় নৌবাহিনী পরিদর্শন করতে আসা প্রেসিডেন্ট জৈল সিং এর উপর তার প্রভাব খাটানোর প্রয়াস আরো বেশি ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল। আমি যখন তাকে বললাম যে, জ্ঞানীজি আমাকে তার সাথে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সে রাষ্ট্রপতি ভবনে ফোন করে প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারীকে বললো যে, সেও অনুষ্ঠানে যোগ দেবে।

আমরা প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট প্লেনে বোম্বে গেলাম। আমি যেক্ষেত্রে একটি হোটেলে ছিলাম, আনিস মহারাষ্ট্রের গভর্ণর আলী ইয়ার জং এর অতিথি হিসেবে ছিল। একই প্লেনে সে দিল্লিতে ফিরে এল। প্রেসিডেন্ট জৈল সিং অভিজাত বংশে আনিসের জন্ম এবং তার নিখুঁত আচরণে বিক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু প্রতি ঈদে তার ফ্ল্যাটে প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে পাঠানো ফলের ঝুড়ি তার ফ্ল্যাটেও যেত।

ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া'র সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আনিস জংকে দেখার বহু সুযোগ হয়েছে। বেনেট কোলম্যান কোম্পানির বোর্ড যুবসমাজের জন্যে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে উদ্যোগ নিয়েছিল। ম্যাগাজিনের সম্পাদক বাছাই করার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমিও জড়িত ছিলাম। দিল্লি ভিত্তিক ইয়ুথ টাইমসের সম্পাদক হিসেবে আমি আনিস জংকে পছন্দ করলাম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আনিস জং বোর্ডের সদস্যদের প্রিয়পাত্রীতে পরিণত হলো; বিশেষ করে জেনারেল ম্যানজার মি. রাম তারনেজা তাকে খুবই পছন্দ করতো।

তার ইচ্ছামতো সে বোম্বে যাওয়া আসা করতো। প্রতি সন্ধ্যায় তাকে পোর্টিকোতে পার্ক করা তারনেজার গাড়ির পিছনে বসা অবস্থায় দেখা যেত। ঘরমুখো সকল স্টাফ তাকে টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপের সম্পাদকদের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাভোগী বলে কানাঘুষা করতেন।

আমি নিজেকে গুটিয়ে নিলাম এবং তার সাথে আর মেলামেশা করবো না বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া থেকে আমাকে বাদ দেয়ার পর বেশ

ক'বছর আমি তার সাথে কথা বলতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছি। পাকিস্তানী হাই কমিশনারের দেয়া এক সম্বর্ধনায় সে আমার কাছে বসার জন্যে এলো। আমি উঠে গিয়ে অন্য একটি আসনে বসলাম। 'তাহলে এখনো ব্যাপারটা তেমনই আছে;' মন্তব্য করে সে গোমড়ামুখে চলে গেল।

ইয়ুথ টাইমস টিকে থাকেনি। আনিস জং আরেকবার চাকুরিচ্যুত হলো। তখন সে কিছু সিরিয়াস বিষয় নিয়ে লিখার কথা ভাবলো। সবাই দেখে বিস্মিত হলো যে, আনিস জং এর মধ্যে ভালো, সরাসরি এবং স্মৃতি জাগানিয়া বিষয় নিয়ে লিখার মেধা আছে। তার সাথে আবার কি করে আমার সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হলো তা আমার মনে নেই। কিন্তু ১৯৮৪ সালের জুন মাসে ভারতীয় সৈন্যদের পরিচালিত 'অপারেশন ব্লু স্টার' এর ধ্বংসলীলা দেখার জন্যে আমি অমৃতসর গেলে সে আমার সাথে ছিল। আমি শিখ হলেও গোঁড়া নই, শিয়া মুসলিম আনিস জং আমাদের পরিদর্শন করা প্রতিটি শিখ তীর্থে ফুল, অর্থ এবং প্রসাদ দিচ্ছিল।

আনিস জংকে একজন মতলববাজ মহিলা হিসেবে বর্ণনা করলে বা সুযোগ সন্ধানী বললে অন্যায় হবে। দি টাইমস অব ইন্ডিয়ায় তার কলাম তাকে ভারতব্যাপী ভক্ত পাঠকের মধ্যে খ্যাতি দিয়েছিল। তার বেশকিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং 'আনভেইলিং ইন্ডিয়া' গ্রন্থটির বেশ কিছু সংস্করণও বেরিয়েছে, যার ফলে তার গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে গিয়েছিল। বহু পথ খুলে গিয়েছিল তার জন্যে। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সে একটি লোভনীয় কাজের দায়িত্ব লাভ করে– এশিয়ায় নারীদের অবস্থার উপর একটি গ্রন্থ রচনা। কায়রোতে জনসংখ্যা বিষয়ক জাতিসংঘের সম্মেলনে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে সে ইউনেস্কোর সঙ্গে কাজ করছে এবং এশিয়ার মহিলাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে।

আনিস জং এর মতো বৈশিষ্টের আর কোন মহিলার সাথে আমার সাক্ষাত হয়নি এবং তাকে প্রধান চরিত্র হিসেবে রেখে একটি উপন্যাস রচনার ইচ্ছা আমার আছে।

কামনা প্রসাদ

১৯৮০ সালের কোন এক সময়, দি হিন্দুস্থান টাইমসের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই স্টাফদের মধ্যে আমার প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছিল যে কুমকুম চাড্ডা, সে বললো, 'স্যার, আমার ঘনিষ্ট বন্ধুদের আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।' চৌদ্দ বছর ধরে আমরা একে অন্যের বাড়িতে যাতায়াত করে আসছি এবং আমার আপত্তি সত্ত্বেও কুমকুম আমাকে 'স্যার' বলেই সম্বোধন করতো। কামনাও তাই করতো। সে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। এমনকি সে তৃতীয় পক্ষের সাথে আলাপকালেও কখনো আমার নাম ব্যবহার করতো না। সে সবসময় বলতো, 'আমি কি স্যারের সাথে কথা বলতে পারি?'

পরদিন কুমকুম আমার অফিসে কামনাকে নিয়ে এল এবং তাকে রেখে গেল, যাতে আমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারি। ক্ল্যাসিক্যাল ইন্ডিয়ান গড়নের চাইতেও বেশি সুন্দরী সে। ঠিক অজন্তার প্রাচীরে খোদিত চিত্রের মতো।

আমার চাইতে কয়েক ইঞ্চি উঁচু সে। দীর্ঘ, কামনাময় ঘনকালো চুল তার নিতম্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। সে খুব ফর্সা নয়, আবার কালোও নয়। হালকা কফি রং এর গায়ের রং তার। সুন্দর গলা, মাঝারি আকৃতির স্তন, সরু কোমর এবং পেট চেপ্টা ও নাভি সহজে চোখে পড়ার মতো করে কাপড় পরে। নিতম্ব অস্বাভাবিক রকমের প্রশস্ত; যেন বহুসংখ্যক সন্তানের স্থান দিতে পারবে।

আমি জানতে পারলাম, তার বাড়ি পাটনায়, তার পিতা বিশিষ্ট উর্দু কবি এবং সে নিজেও অনর্গল উর্দু ও হিন্দি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারে। তার মা বিহার সরকারের একজন মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে তাকে রাজনীতি থেকে অবসর নিতে হয়েছে।

কামনা প্রসাদ তার বাবা মা'র সাথে খুব ঘনিষ্ট ছিল না। কিন্তু ছোট ভাই রাজুর প্রতি ভীষণ দুর্বল ছিল। তার বড় ভাই বিয়ে করেছিল বাবু জগজীবন রামের কন্যাকে। কিন্তু সে তাকে খুব একটা দেখেনি। দিল্লিতে সে একা থাকতো এবং অলংকার তৈরির পাথরও তৈরি পোশাক রফতানিতে নিয়োজিত একটি গুজরাটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতো।

আমাদের প্রথম সাক্ষাতেই আমি এতোসব ঘটনা জানতে পারিনি। বহু দফা বৈঠকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এসব আহরিত হয়েছে। কারণ, কামনা খুবই অন্তর্মুখী ধরণের ব্যক্তিত্ব এবং ছোটখাট বিষয়ও অহেতুক গোপন রাখতে চায়।

আমি তাকে আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাই কুমকুমের সাথে। আমি জানি যে, আমার বাড়ির নিয়মিত দর্শনার্থী হতে হলে তাকে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। সে এল এবং শিগগির চাকরবাকরসহ পুরো পরিবারের ভালোবাসা জয় করে নিল।

কিন্তু শুধুমাত্র আমার সাথেই সে তার গোপন বিষয়ে মত বিনিময় করতো। ক্রমে ক্রমে আমি তার পিতৃতুল্য ব্যক্তিতে পরিণত হলাম। সে প্রায় আমার চেয়ারের পাশে ফ্লোরে বসতো। আমি তার রেশমি তুলতুলে কাঁধে হাত রাখতাম যখন সে মুখ খুলে কথা বলতো। সে কখনো তার কথা শেষ করতো না, সবসময় পরবর্তী সাক্ষাতে বলার জন্যে কিছু কথা উহ্য রাখতো।

পুরুষ বা মহিলা যেই হোক না কেন তাদের সাথে মেলামেশার নিজস্ব পদ্ধতি ছিল কামনার। যে কারণে লোকজন তার প্রতি আকৃষ্ট হতো। কিছু বিষয় সম্পর্কে সে খুব স্পর্শকাতর ছিল এবং আপত্তিকর বলে মনে না হলেও সে আপত্তিকর বিবেচনা করে তার অবস্থান নিয়ে নিত। সে যে সুন্দরী, আকর্ষণীয়, একাকী বাস করে এবং নিজেকে কিছুটা রুচিশীল ভাবে সে সম্পর্কে তার সচেতনতা ছিল অনেক বেশি। সেজন্যে নিজের সম্পর্কে অন্যদের ভিন্ন ধারণা দিয়ে থাকতে পারে।

সে প্রায়ই সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে উপস্থিত থাকতো, যখন পানীয় পরিবেশন করা হতো। আমি সোজা তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম সে যখন আমার স্কচ তৈরি করে দিত। যদিও সে কখনো মদ্যপান করতো না, কিন্তু জানতো যে, আমার জন্যে এটি কতোটা ভালো। একবার আরো কিছু লোকের উপস্থিতিতে আমি তাকে মদ দিতে বলে তাকে আমার 'সাকী' বলে উল্লেখ করি। এতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। তখন সে আমাকে কিছু না বললেও পরদিন আমার সামনাসামনি হয়ে সুনির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলে। সে আমাকে অভিযুক্ত করে যে, আমি তাকে এক ধরনের বারবনিতা হিসেবে দেখছি। আমি প্রতিবাদ জানিয়ে তাকে বলি যে, তাকে আদর করেই আমি কথাটা বলেছি, ঠিক যে ভাবে হরজিৎ ও সাদিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, যারা আমাকে স্কচ ও সোডা তৈরি করে দেয়।

সে অনড় এবং সান্ত্বনাহীন রইলো। আমি তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম যে, এভাবে হঠাৎ করেই সে যদি আমার স্নেহের প্রকাশকে ভুল বুঝে বসে তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সে আমাকে ক্ষমা করে দিল এবং শান্তি পুনঃস্থাপিত হলো।

কামনা আমার বন্ধুদের কাছেও প্রিয়পাত্রে পরিণত হলো। কিন্তু সবাই তাকে আমার মতো করে গ্রহণ করলো না। আনিস জং বুঝতে পারতো না যে, আমি কামনাকে পছন্দ করি কেন এবং তাকে খুব হালকা মাপের মেয়ে বলে অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করলাম। একবার আমি এবং আনিস জং বোম্বেতে যে হোটেলে উঠেছিলাম; কামনা ও কুমকুম সেই হোটেলেই পাশাপাশি রুমে ছিল। বরেণ্য অভিনেত্রী স্মিতা পাতিল আমাকে ফোন করে জানায় যে, সে আমার সাথে সাক্ষাত করতে চায়।

দি ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক হিসেবে আমি স্মিতার ছবি প্রচ্ছদে ছেপেছিলাম তার প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবি দেখার পর এবং তাকে ভবিষ্যতের তারকা

হিসেবে উল্লেখ করেছিলাম। স্মিতা আমার কাছে এসে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছিল। আনিস ঘটনাক্রমে আমার রুমে ছিল এবং স্মিতার সাথে সাক্ষাতের সময় সেও থাকবে বলে জানালো। কামনাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, স্মিতা আমার সাথে একা সাক্ষাত করুক। দু'জনের মধ্যে একটি প্রাণবন্ত অশিষ্ট ভাষার প্রয়োগ শুরু হলো।

কামনার উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে আনিস তার দিকে ফিরে বললো, 'তুমি তোমার রুমে ফিরে যাচ্ছো না কেন?' কামনা পাল্টা আক্রমণ করলো, 'আমি কেন যাবো? তুমি কেন স্যারকে একা থাকতে দিচ্ছ না? স্মিতা তোমার সাথে দেখা করতে চায় না। তিনি স্যারের সাথে দেখা করতে চান।' আমার ঠিক স্মরণে নেই যে কি করে উভয়ের বিতন্ডা মিটেছিল। স্মিতা আমার রুমে এসে কয়েক মিনিট আমাদের সাথে কাটিয়ে চলে যায়। এর কয়েক মাস পরই তার মৃত্যু হয়।

আগে যেমন উল্লেখ করেছি, কামনা অতুলনীয় সুন্দরী এবং চেতনাগতভাবে উদার হওয়ার কারণে বহু নারী-পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হতো। মেয়েরা আসতো এবং যেতো। প্রথমে ছিল কুমকুম, এরপর চৌধুরী অতঃপর সাদিয়া।

পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশি। তাকে আকাংখা করার বহু পাত্র ছিল। কিন্তু তাদেরকে সম্মানজনক দূরত্বে রাখতো। কারণ সে বিয়ে করতে বা সন্তানের মা হতে চায়নি। কুয়েতে বসবাসরত দাড়িমুন্ডিত এক সরদারের সাথে ভগ্নহৃদয়ে তার বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি, কামনা ভারত ত্যাগ না করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল বলে।

এরপর তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এক জার্মান। তার আগের বিয়ে সুখকর হয়নি এবং দু'সন্তানের পিতা ছিল সে। বেপরোয়াভাবে সে কামনার প্রেমে পড়ে এবং প্রতিজ্ঞা করে যে তাকে বিয়ে করার জন্যে সে তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দেবে।

আরেকটি বিয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠান হিন্দু রীতি অনুসারে সম্পন্ন হয় তার অ্যাপার্টমেন্টে। কয়েক সপ্তাহ সে জার্মানিতেও কাটায় এটা দেখার জন্যে যে, একজন গৃহবধু হিসেবে সে নিজেকে কতোটা মানাতে পারবে। সে বিভ্রান্ত মোহমুক্ত হয়ে দিল্লিতে ফিরে আসে।

শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের প্রতি আকৃষ্ট হয় কামনা এবং তার প্রতি শিল্পীর মনোযোগকে উপভোগ করে। তিনি তার কয়েকটি পোর্ট্রেট আঁকেন এবং তার পীড়াপীড়িতে আমারও দু'টি পোর্ট্রেট অংকন করেন। তার পোর্ট্রেটগুলোর সঙ্গে আমার একটি পোর্ট্রেট কামনা প্রসাদ তার অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে সাজিয়ে রাখে।

এরপর শিল্পী তাকে অর্থ দিতে শুরু করেন। সে তার কাছে যাওয়া কমিয়ে দেয় এবং এক পর্যায়ে তার সাথে কথা বলতেও অস্বীকৃতি জানায়। এম এফ হোসেন আমার কাছে মিনতি করেন সে যাতে তাকে ক্ষমা করে দেয় সেকথা বলতে। সে তার নিজের শর্তেই তাকে ক্ষমা করে। শিল্পী তার আত্মজীবনী কামনা প্রসাদের নামে উৎসর্গ করেন। এরপর তারা আবার বন্ধুতে পরিণত হয়।

আমি কামনাকে যতোটা ভালোবাসতাম, ততোটাই চাইতাম তাকে বিবহিতা ও সন্তান ধারণ করতে দেখতে। আমার বাড়ির একটি মনোরম বিশাল চিত্রের উপর তার দৃষ্টি পড়ে এবং আমাকে বলে সেটি তাকে দিয়ে দিতে। আমি তাকে বলি, 'আমি তোমাকে এটা দেব তোমার বিয়ের উপহার হিসেবে।' কিন্তু বিয়ে না করেই সে চিত্রটি নিয়ে যায়। আমাকে দেয়া অনুপ সরকারের একটি বিরাট টেরাকোটা গনেশ মূর্তি তার পছন্দ হয়। পুনরায় আমি বিয়ের উপহার হিসেবে মূর্তিটি তাকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেই। আবারও সে মূর্তি নিয়ে যায় বিয়ে না করেই।

শেষ পর্যন্ত যখন সে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সে এটিকে সারপ্রাইজ হিসেবে প্রকাশ করলো। তার এক বিশেষ নতুন বন্ধুর সাথে পরিচয় উপলক্ষে আমাকে ভোজে আমন্ত্রণ করলো। লোকটি দীর্ঘ, হ্যান্ডসাম, দাড়িওয়ালা ইংরেজ। রয়টার বার্তা সংস্থার মাইকেল বেটাঈ। আমি আড় চোখে দেখেই বুঝতে পারি যে লোকটি কামনার প্রেমে এবং কামনা তার প্রেমে গভীরভাবে মগ্ন। তাদের বিয়ের ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল, কারণ কামনা লোকটি সম্পর্কে এবং তার পেশার সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। পেশার দিকটি সে আমার উপর ছেড়ে দিল। আমি লোকটিকে আমন্ত্রণ করলাম। পরদিন আমি তাকে যা জিজ্ঞাসা করলাম, যা কোন কনের পিতা তার সম্ভাব্য জামাতা সম্পর্কে জানতে চায়।

মাইকেলের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি অথবা উল্লেখ করার মতো ব্যাংক ব্যালান্স ছিলনা। রয়টারের শীর্ষ পদগুলোর একটিতে পৌঁছার ভালো সম্ভাবনা থাকলেও সেজন্যে তাকে ভারতের বাইরেও অনেক স্থানে কাজ করে অবশেষে ইংল্যাণ্ডে স্থিতু হতে হবে।

আমি কামনাকে লন্ডনের শহরতলীতে একজন সেবাপরায়না, ফ্লোর ঝাড়ু দেয়া, রান্না ও থালাবাসন পরিষ্কার করার মতো কাজে নিয়োজিত থাকা দেখতে কল্পনা করি না। যিনি একজন শ্বশুর হবেন তিনি তার সম্ভাব্য জামাতাকে শারীরিক যোগ্যতা বিষয়ক সার্টিফিকেট পেশ করার জন্যে বলতে পারেন। কাজটি বেশ জটিল এবং মাইকেলের স্বাস্থ্য ও ধোপদুরস্তপনায় কোন ঘাটতি ছিলনা।

আমি কামনাকে বললাম যে, মাইকেলকে আমি অনুমোদন করেছি, কিন্তু আমি নিশ্চিত নই যে, কামনা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে থাকতে পারবে কিনা। যাহোক, বিয়ের একটি দিন নির্ধারণ করা হলো। আমি কন্যাদানের দায়িত্ব পালনে সম্মত হলাম।

আমাকে আসামের শিবসাগরে শিক্ষা বিষয়ক একটি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সাইকিয়া আমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করলেন যে, বৈবাহিক দায়িত্ব পালনের জন্যে আমাকে যথাসময়ে তিনি দিল্লিতে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। এই নিশ্চয়তা পেয়ে আমাকে আসামে যেতে হয়েছিল। কিন্তু ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ভিন্নরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কলকাতা থেকে আমার দিল্লির ফ্লাইট ছয় ঘণ্টা বিলম্বিত হলো।

আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন হিন্দু রীতি অনুযায়ী কামনা-মাইকেল বিয়ের লগ্ন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কামনার বাবা মা'কে পাটনা থেকে এসে তাকে তার ইংরেজ বরের কাছে তুলে দিতে হয়েছে।

এক সপ্তাহ পর আমার অ্যাপার্টমেন্টে সামাজিক বিয়ে সম্পন্ন হলো। যেখানে মাইকেলের বাবা মা'ও উপস্থিত ছিলেন। রানি জেঠমালিনী এবং আমি সার্টিফিকেটে সাক্ষী হিসেবে সই করেছি।

কামনা তার খোলামেলা অ্যাপার্টমেন্ট তাদের ছেড়ে রয়টার কর্তৃক ভাড়া করা আরো বড় একটি বাংলোয় গিয়ে উঠলো। মাইকেলের সঙ্গে সে ইংল্যাণ্ডে গেল। স্বামীর বাবা মা ও বোনদের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ কাটালো। উত্তর লণ্ডনের বেলসাইজ পার্কে তারা একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনলো।

এরপরও আমি নিজেকে আশ্বস্ত করতে পারছিলাম না যে, কামনা দিল্লি ছাড়া অন্য কোথাও বাস করছে এবং আমার জীবন থেকে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে।

কামনা প্রসাদের জন্যে আমার স্নেহ ভালোবাসা বিশ্লেষণ করতে আমি অপারগ। এটি তার দৈহিক সৌন্দর্যের চাইতে ভিন্ন কিছু। সে শুধু দিতে জানে, নিতে জানে না। আমি তাকে যা দিয়েছি (অথবা সে আমার কাছ থেকে নিয়েছে, তার চাইতে দ্বিগুণের বেশি করে প্রতিদান দিয়েছে আমার স্ত্রী, কন্যা ও নাতনির জন্যে। (আমার স্ত্রী কিছু করতে চাইলে সে কামনার উপর নির্ভর করতো এবং সে কাজে কোন ব্যয় জড়িত থাকলে তা অনেক কষ্টে কামনাকে দিতে পারতো। সম্ভবত কামনার জন্যে আমার ভালোবাসার সবচেয়ে বড় কারণ আমার উপর তার বিশ্বাস ও আস্থা। আমি উৎকণ্ঠার সাথে সেদিনের অপেক্ষা করছি যেদিন মাইকেল অন্য কোন দেশে বদলীর নির্দেশ লাভ করবে।

কামনাকে ছাড়া দিল্লি আগের মতো থাকবে না।

অমৃতা শেরগিল

আমার জীবনে আসা মহিলাদের মধ্যে অমৃতা শেরগিলকে গণ্য করার যথার্থতা প্রমাণ করা আমার জন্যেই কঠিন। মাত্র দু'বার তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। দু'টি সাক্ষাতই আমার জীবনে অটুট ছাপ রেখে গেছে। চিত্রশিল্পী হিসেবে তার খ্যাতি, সুন্দরী মহিলা হিসেবে তার গ্ল্যামার, যা তার কিছু আত্মপ্রতিকৃতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তার বাছবিচারহীন মেলামেশার জন্যেও যে খ্যাতি আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং যে কারণে আমি তাকে আমার তালিকায় রাখার অজুহাত খুঁজে পেয়েছি।

এক গ্রীষ্মে তার শেষ স্বামী, যিনি হাঙ্গেরীয়ান ডাক্তার বলে আমি শুনেছি, তারা লাহোরে একটি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছেন, যেখানে রাস্তার ঠিক ওপারেই আমি বাস করতাম। ডাক্তার সেখানে প্রাকটিস শুরু করবে এবং অমৃতা তার শিল্পকর্মের স্টুডিও দেবে। তারা কেন লাহোরে বাস করার সিদ্ধান্ত নিল, সে সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। অমৃতার বহুসংখ্যক বন্ধু এবং অনুরাগী ছিল লাহোরে। তার শিখ পিতার তরফের অনেক ধনবান, জোতদার আত্মীয়স্বজন ছিল, যারা নিয়মিত লাহোরে বেড়াতে যেত। তাদের জন্যে লাহোরও ভারতের মতোই জীবন শুরু করার চমৎকার স্থান।

১৯৪১ সালের জুন। আমার স্ত্রী আমাদের সাত মাস বয়সী পুত্র রাহুলকে নিয়ে গ্রীষ্মকাল কাটাতে সিমলা ছাড়িয়ে সাত মাইল দূরে মাশোব্রা'য় আমার বাবা মা'র বাড়ি 'সুন্দরবনে' গেল। আমি আমার সকালগুলো হাইকোর্টে আইনজীবীদের সঙ্গে কফি পান করতে করতে অথবা বিচারকদের সামনে মামলার যুক্তিতর্ক শুনে কাটাচ্ছিলাম। আমার নিজের লড়ার মতো তেমন মামলা ছিলনা। তবু আমি অন্যদের কাছে নিজেকে ব্যস্ত আইনজীবী হিসেবে প্রমাণ করার জন্যে কালো কোট পরে, কলারে সাদা ট্যাব লাগিয়ে হাতে কালো গাউনটা বহন করতাম। লাঞ্চের জন্যে আমি বাড়ি ফিরে আসতাম এবং কসমোপলিটান ক্লাবে টেনিস খেলতে যাওয়ার আগে দীর্ঘ সময় শুয়ে থাকতাম।

একদিন বিকেলে আমি বাড়ি ফিরে দেখলাম ঘর দামি ফরাসি পারফিউমের সুগন্ধে ভরপুর। আমার সিটিং রুম-কাম-লাইব্রেরীর টেবিলের উপর রূপালি গ্লাসপূর্ণ ঠান্ডা বিয়ার। পায়ে পায়ে আমি কিচেনে গেলাম। বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করলাম অতিথি সম্পর্কে। 'শাড়ি পরা একজন মেমসাহেব;' সে আমাকে জানালো। সে তাকে বলেছে যে, আমি যে কোন মুহূর্তে লাঞ্চের জন্যে এসে পড়বো। অতিথি আমার ফ্রিজ থেকে এক বোতল বিয়ার বের করে গ্লাসে ঢেলে বাথরুমে গেছে হাতমুখ ধুঁতে। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, আমার অনাহুত অতিথি অমৃতা শেরগিল ছাড়া আর কেউ নয়।

তার লাহোরে পৌঁছার বেশ ক'সপ্তাহ আগেই আমি তার হাঙ্গেরিয়ানকে বিয়ে করার আগে শহরটিতে তার পূর্ববর্তী সফরের সময়ের কিছু ঘটনা সম্পর্কে শুনেছি। সে সাধারণতঃ উঠতো ফ্যালেটিস হোটেলে। প্রতি দু'ঘণ্টার বিরতিতে সে তার প্রেমিকদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি দিত– একদিনে ছয় থেকে সাতজনকে, রাতে শুতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এটা যদি সত্য হয় (পুরুষদের গুজব মেয়েদের চাইতে কম নির্ভর যোগ্য) তাহলে অমৃতার জীবনে প্রেমের অংশ খুব সামান্য। যৌন সম্পর্কই বরং তার কাছে প্রধান। মাত্রাজ্ঞানহীন যৌন বাতিকের প্রকৃত দৃষ্টান্ত সে এবং তার ভাগ্নে বিভান সুন্দরমের প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে সে একজন লেসবিয়ান। বদরুদ্দিন তাইয়েবজি তার স্মৃতি কথায় অমৃতা শেরগিলের মানসিক চিত্র বিস্তারিত ফুটিয়ে তুলেছেন। এক শীত মওসুমে তাইয়েবজি সিমলায় অবস্থানকালে অমৃতাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানান। শীত থেকে বাঁচতে তিনি আগুন জ্বালান, গ্রামোফোনে ইউরোপিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক বাজছিল। সাহিত্য ও সঙ্গীতের উপর আলোচনা করে তিনি তার প্রথম সন্ধ্যা বরবাদ করেন। আবার তাকে আমন্ত্রণ জানান তিনি। আবার তিনি আগুন জ্বালান এবং একই মিউজিক বাজান। কি ঘটতে যাচ্ছে তাইয়েবজি তা বুঝে উঠার আগেই অমৃতা তার যাবতীয় বস্ত্র উন্মোচন করে নগ্ন অবস্থায় কার্পেটের উপর শুয়ে পড়ে। সে সময় নষ্ট করার বিশ্বাসী নয়। বদরুদ্দিন তাইয়েবজিও তা বুঝতে পারেন।

বেশ ক'বছর পর খ্যাতিমান লেখক ম্যালকম মাগারিজ আমাকে বলেছেন যে, তিনি গ্রীষ্মাবাস সিমলায় অমৃতার পিতার বাড়িতে এক সপ্তাহ কাটিয়েছেন। ম্যালকমের তখন ভরা যৌবন–বিশের সামান্য উপরে তার বয়স। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি ছিন্ন ন্যাকড়ার মতো হয়ে গিয়েছিলেন। 'আমি ওর সাথে পেরে উঠিনি,' তিনি স্বীকার করেছেন। 'আমি কলকাতায় ফিরে যেতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম।'

এ ধরণের খ্যাতির অধিকারী অমৃতা শেরগিল পুরুষদের তার দিকে আকৃষ্ট করাকে উপভোগ করতো চুম্বক দিয়ে লোহাকে আকৃষ্ট করার মতো। আমিও ব্যতিক্রম ছিলাম না। সে রুমে প্রবেশ করতেই আমি তাকে শুভেচ্ছা জানাতে উঠে দাঁড়ালাম। 'আপনি নিশ্চয়ই অমৃতা শেরগিল?' আমি বললাম। সে মাথা ঝুঁকালো। আমার বিয়ার নেয়ার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করে সে আমাকে তার আগমনের কারণ বললো। সবই ফালতু ব্যাপার, যা আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সব রোমান্স কেড়ে নিয়েছিল। সে আমার কাছে কাঠমিস্ত্রী, ধোপা, বাবুর্চি, বেয়ারার ইতাদি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল যে কাদেরকে সে তার কাজের জন্যে বাছাই করতে পারে। সে যখন কথা বলছিল, আমি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম। বেঁটে, শ্যামলা রং, ঘন কালো চুল নিখুঁতভাবে মাঝখানে সিঁথি কাটা, পুরু কামুক ঠোঁট উজ্জ্বল লাল লিপস্টিক দিয়ে ঢাকা, সেটা নাকের উপরটা দৃশ্যমান কালো। সে দেখতে ভালো, কিন্তু কোন মতেই সুন্দরী নয়।

তার আত্ম প্রতিকৃতি খোলামেলা ধাঁচের। সম্ভবতঃ তার ফিগার আকর্ষণীয় ছিল, ঠিক যেভাবে সে নিজের নগ্ন চিত্র এঁকেছে। কিন্তু তার শাড়ির নিচে সে কি গোপন করে রেখেছে তা জানার কোন উপায় আমার ছিল না। তার যা আমি ভুলতে পারি না, তা

হচ্ছে তার উচ্ছলতা। কথা শেষ করে সে আমার রুমের চারদিকে তাকালো। আমি কয়েকটি চিত্রের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, 'এগুলো আমার স্ত্রীর আঁকা, সে একজন সৌখিন শিল্পী।' সে চিত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকালো, 'তাতো বুঝাই যায়।' আমি যেন হোঁচট খেলাম তার অবজ্ঞায়। কিন্তু আমার জানা ছিলনা যে কি করে প্রতিবাদ করবো। আমার জন্যে আরো কিছু অপেক্ষা করছিল।

কয়েক সপ্তাহ পর আমি মাশোব্রায় আমার পরিবারের সাথে মিলিত হলাম। অমৃতা শেরগিল চমন লালদের সাথে অবস্থান করছিল, যারা আমার পিতার উপরের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। আমি তাদেরকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ করলাম– চমন লাল, তার স্ত্রী হেলেন এবং অমৃতা। দুপুরে তারা এলো। একটি ওক গাছের ছায়ায় টেবিল পেতে দু'পাশে চেয়ার সাজিয়ে দেয়া হয়েছে, যেখান থেকে পার্বত্য পরিবেশ এবং বিস্তীর্ণ উপত্যকা দেখা যায়। আমার সাত মাস বয়সী পুত্র নিজে নিজে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কোকড়া চুল এবং প্রশ্নপূর্ণ বড় বড় চোখের আদুরে শিশু। সবাই নিজ নিজ সুযোগ মতো তার সাথে কথা বলছে এবং এতো সুন্দর একটি শিশুর জন্ম দেয়ার জন্যে আমার স্ত্রীকে অভিনন্দিত করছে। অমৃতা তার বিয়ারের মগের গভীরে হারিয়ে গেছে। সবার মন্তব্য শেষ হলে অমৃতা শিশুটির দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, 'কি কুৎসিত ছোট্ট বালক!' সবাই তার মন্তব্যে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এমন নির্দয় মন্তব্যের জন্যে কেউ কেউ প্রতিবাদ করলো। কিন্তু অমৃতা নিস্পৃহ অবস্থায় আবার বিয়ার পান করতে লাগলো। অতিথিরা সবাই বিদায় নিলে আমার স্ত্রী আমাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে বললো, 'ওই জঘন্য কুত্তীটাকে আমি আর বাড়িতে ঢুকতে দেবনা।'

অমৃতার অসদাচরণের বিষয়টি সিমলার সামাজিক মহলে ছড়িয়ে পড়লো। একইভাবে তার উদ্দেশ্যে আমার স্ত্রীর মন্তব্যও। অমৃতা জানতে পারলো যে আমার স্ত্রী কি বলেছে এবং লোকদেরকে বলে বেড়ালো যে, 'আমি ওই বেজন্মা মহিলাকে এমন শিক্ষা দেব যে সে আর ভুলবে না। তার স্বামীকে আমি পটাবো।'

আমি আগ্রহের সাথে তার মধ্যে মগ্ন হতে অপেক্ষা করেছি। কিন্তু সে দিন কখনো আসেনি। আমরা শরৎকালে লাহোরে ফিরে এলাম। অমৃতা এবং তার স্বামীও তখন আসে। এক রাতে তার চাচাতো ভাই গুরচরণ সিং (চান্নি), গুজরানওয়ালার কাছে যার বিশাল কমলার বাগান আছে ; সে রাতটা আমাদের সাথে কাটাতে পারে কিনা। কারণ অমৃতা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার সাথে সাপ্তাহিক ছুটির দিনটা কাটানোর জন্যে ডেকে পাঠিয়েছে। পরদিন অমৃতার আরো কিছু বন্ধুর আগমণ ঘটলো। তারা আমাদের বললো যে, অমৃতার অবস্থা খুব খারাপ, তার বাবা মা গ্রীষ্মাবাস থেকে আসছেন তার সাথে থাকার জন্যে। সে খুব ভালো ব্রিজ খেলতো এবং অর্ধ অচেতন মুহূর্তে ব্রিজ খেলার সময় ব্যবহৃত শব্দগুলো বিড়বিড় করছিল। পরদিন সকালে আমি শুনলাম যে, অমৃতা শেরগিল মারা গেছে।

আমি তড়িঘড়ি তার অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম। তার পিতা সরদার ওমরাও সিং শেরগিল দরজার পাশে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন। তার হাঙ্গেরীয় মা

একবার ভিতরে প্রবেশ করছে, আবার বাইরে বের হয়ে আসছে ; কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না, যা ঘটে গেছে। সেই বিকেলে শ্মশান পর্যন্ত তার শবযাত্রায় অংশগ্রহণকারী লোকের সংখ্যা এক ডজনের অধিক ছিল না। তার স্বামী চিতায় আগুন দিল। আমরা যখন তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম, তখন পুলিশ তার স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। নাৎসি জার্মানির মিত্র হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বৃটেন। অতএব, অমৃতার স্বামী তার জাতীয়তার কারণে বৃটেনের শত্রু বলে বিবেচিত এবং তাকে কারাগারে থাকতে হবে।

পুলিশী হেফাজতে থাকায় তার ভাগ্য ভাল ছিল বলতে হয়। কারণ কয়েকদিন পর তার শাশুড়ি অর্থাৎ অমৃতার মা তার বিরুদ্ধে তার কন্যাকে হত্যার অভিযোগ তুললেন। পরিচিত সবার কাছে তিনি চিঠি লিখে তার কন্যার আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত অনুষ্ঠনের দাবি জানাতে লাগলেন। যাদের কাছে তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন, আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। নিশ্চয়ই এটা খুন নয়, হতে পারে অবহেলা। আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ রঘুবীর সিং এর কাছে আমি বিস্তারিত জানতে সক্ষম হই, যিনি অমৃতাকে জীবিত অবস্থায় দেখা সর্বশেষ ব্যক্তি। তিনি আমাকে জানান যে, তাকে ডাকা হয়েছিল মাঝরাতে। সম্ভাবতঃ জটিল গর্ভপাতের কারণে অমৃতার খিঁচুনি এসেছিল। তার ভীষণ রক্তপাত হয়েছিল। তার স্বামী ডাঃ রঘুবীর সিংকে রক্ত দিতে বলেন। কিন্তু রোগীকে পুরোপুরি পরীক্ষা না করে ডাক্তার রক্ত দিতে অস্বীকার করেন। দুই ডাক্তার যখন একে অন্যের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করছিলেন, তখন অমৃতা চুপচাপ জীবনের পরপারে চলে যায়। কিন্তু তার খ্যাতির ঘাটতি ছিল না।

বোম্বের ভিখারিনী মেয়েটি

'দি ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়ার' সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর কয়েক মাস পর্যন্ত আমি চার্চগেটে এক তরুণ পার্সি দম্পতির ফ্ল্যাটে পেয়িং গেস্ট হিসেবে ছিলাম। আমি খুব বেশি সংখ্যক লোককে জানতাম না। অতএব আমার সামাজিক জীবন বলতে সামান্যই ছিল। প্রতিদিন সকালে আমি হেঁটে অফিসে যেতাম এবং বিকেলে হেঁটেই ফিরতাম। আমার জন্যে দেয়া গাড়ি ও ড্রাইভার ব্যবহার করতে আমি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম।

প্রথম দিকে যাদের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল তাদের মধ্যে এ জি নুরানী আইন ব্যবসার পাশাপাশি সাংবাদিকতাও করতো। সে অবিবাহিত ছিল, এখনো চিরকুমার। আমরা একসাথে আমাদের সন্ধ্যা কাটাতে শুরু করলাম। আমরা মেরিন ড্রাইভ পর্যন্ত যেতাম এবং আমার ফ্ল্যাটে ফিরে আসতাম।

আমি সন্ধ্যায় স্কচ হুইস্কি পান করতাম; নুরানী বরাবর মদপান বর্জন করে চলা লোক, সে এক গ্লাস পানি পান করতো। এরপর আমরা আশেপাশের বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের উদ্দেশ্যে বের হতাম। ডিনারের পর এক এক দিন ভিন্ন ভিন্ন পানওয়ালার পানের স্বাদ নিয়ে আমরা বিদায় নিতাম। বোম্বেতে বর্ষার আগমনের সাথে এই রুটিন এলোমেলো হয়ে গেল। তখনই আমি ওই মহিলার সাথে জড়িয়ে পড়ি, যার সম্পর্কে আমি লিখছি।

একটানা বর্ষণ থেমেছে। রেস্টুরেন্ট থেকে যখন বাইরে পা দিলাম, তখন আমি একা। আমার বাড়ির পথে একটি পেট্রোল পাম্প এবং কয়েকটি দোকান পড়ে। একটি পান কিনতে থামলাম এবং ভেলপুরিওয়ালার কাছে জানতে চাইলাম, বৃষ্টির মধ্যে তার ব্যবসা কেমন চলছে। 'খুব ভালো নয়,' সে স্বীকার করলো। কাছের দোকানের সিঁড়িতে বসা এক মহিলাকে দেখিয়ে বললো, ' কিন্তু এর কপাল খুলে যায়। আমি যা বেঁচতে পারি না, সেগুলো তাকে দিয়ে দেই। সে ভিখারিণী। কিছুটা পাগল।' আমি মহিলার দিকে তাকালাম। ভেলপুরি খাচ্ছে। বেশ সুন্দরী সে। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। ফর্সা, মুখটা সুন্দর, এলো চুল সারা মুখে ছড়িয়ে আছে। একটি ময়লা ধুতি দিয়ে আলুথালুভাবে তার শরীর পেঁচানো। তার দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম এবং বিস্মিত হলাম যে, এমন একটি আকর্ষণীয় চেহারার তরুণী পাপে ভরা এই নগরীতে কি করছে। সে রাতে দীর্ঘ সময় ধরে মেয়েটির চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খেল। এরপর থেকে আমি রাতের খাবারের পর পেট্রোল পাম্পের পাশের পানওয়ালার কাছ থেকে পান কেনাকে একটি নিয়মে পরিণত করলাম। বন্ধ দোকানের সিঁড়িতে বসে থাকা ভিখারিণী মেয়েটির দিকে

তাকিয়ে ভেলপুরিওয়ালার সাথে দু'চারটি বাক্য বিনিময় শুরু করলাম। প্রায়ই দেখতাম মেয়েটি আপন মনেই কথা বলছে। মেয়েটিকে দেয়ার জন্য ভেলপুরি কেনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু দোকান মালিক তাতে রাজী হলো না। তার কাছে অনেক অবিক্রিত ভেলপুরি রয়ে যায় এবং মেয়েটিকে খাওয়ানো যেন তার একচেটিয়া অধিকার।

এক সন্ধ্যায় আমি যখন রেস্টুরেন্ট বসে খাচ্ছিলাম, তখন আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি শুরু হলো এবং প্রবল বর্ষণের ফলে চার্চগেটের পাশেপাশের সব রাস্তা জলমগ্ন হয়ে গেল। আমি আমার প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটুর উপর তুলে স্যান্ডেল হাতে নিলাম, পাগড়ি বাঁচাতে ছাতা খুললাম এবং কর্দমাক্ত পানির মধ্য দিয়ে যেতে লাগলাম। পানওয়ালা এবং ভেলপুরিওয়ালা দু'জনই দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে। পানি থেকে ইঞ্চিখানেক উপরে হতে পারে মার্বেলের সিঁড়িতে মেয়েটিকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। বৃষ্টির ছাঁট তার গায়ে পড়ছে। রাতের জন্যে সে হয়তো কিছুই খেতে পায়নি। আমি তাকে কিছু অর্থ দেয়ার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠলাম, কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম না যে, তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। আমি বাড়ি ফিরতে ফিরতে মেয়েটি সম্পর্কে ভাবছিলাম এবং গভীর রাতেও তার কথা মনে পড়লো।

সারারাত ধরে বৃষ্টিপাত হলো। ঘুম ভাঙ্গার পর আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, রাজাভাই ক্লক টাওয়ার সংলগ্ন ময়দান পর্যন্ত চোখে পড়লো। তখনো বৃষ্টি থামেনি। ময়দান পানিতে প্লাবিত। আমি ছায়ার মতো একটি নারীর অবয়ব দেখলাম টিনের একটি টুকরা হাতে নিয়ে ময়দান অতিক্রম করছে। সে তার ধুতি উঁচু করে তুলে ধরেছে এবং নিতম্বের মাঝে পানির ঝাপটা দিচ্ছে। আমার ছোট বাইনোকুলার দিয়ে তার উপর দৃষ্টি স্থির করলাম। সে আশেপাশে তাকালো, কেউ আছে কিনা দেখতে। সে যখন নিশ্চিত হলো যে, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না, তখন সে তার ধুতি খুলে ফেললো এবং বৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়ালো। এটি সেই ভিখারিণী মেয়ে। ময়লা পানি দু'হাতে তুলে শরীরে ঝাপটা দিচ্ছে, স্তন, কোমর, হাত ও পা ডলছে। 'স্নান' সম্পন্ন হলো। ভিজা ধুতি আবার শরীরে পেঁচালো এবং চার্চগেটের দিকে ফিরে চললো।

দিল্লি থেকে আমার বাইরে অবস্থানের দিনগুলোতে বোম্বের সেই ভিখারিণী মেয়েটির স্মৃতি আমাকে তাড়া করে ফিরতো, যেন সে সমুদ্র থেকে ভেনাসের প্রতিমূর্তি ধরে এসেছিল। এরপর আমি যখনই বোম্বে যেতাম, তখন রাতের খাবার শেষ করে চার্চগেটে যাওয়া নিয়ম করে নিয়েছিলাম। পানওয়ালা ও ভেলপুরিওয়ালা সেখানে আছে। কিন্তু সেই ভিখারিণী নেই। ভেলপুরিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করেছি, মেয়েটির কি ঘটেছে। তার চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হয়েছে এবং রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছে, বেশ্যার দালালেরা ওকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।'

আমার স্ত্রী কার্ভাল

যারা আমাকে এবং আমার পরিবারকে জানে না তাদের অধিকাংশের ধারনা যে, আমার স্ত্রীর কোন অস্তিত্ব নেই অথবা তাকে আমাদের বহু নেতার স্ত্রীদের মতো কোন গ্রামে রেখে আসা হয়েছে। এটি অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারনা ; কারণ আমার স্ত্রী চমৎকার বৈশিষ্টের মহিলা, যে দৃঢ়তার সাথে গৃহ পরিচালনা করে , ঠিক ইন্দিরা গান্ধী যেমন কঠোর হাতে ভারত শাসন করেছেন। এখনকার আধুনিকাদের মতো বব কাট চুল, টি-শার্ট, জিন্স পরা এবং চি চি করে হিন্দি ইংরেজী মিশিয়ে কথা বলা মেয়েরা যেমন বিয়ের সময় অত্যন্ত নিরীহের মতো নিজেদের অধিকার সমর্পণ করে দেয় তাদের বাবা মা'র পছন্দের উপর, সেক্ষেত্রে আমার স্ত্রী তার নিজের স্বামীকে পছন্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ষাট বছরের বেশি সময় আগে।

শিগগির আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমি আমার স্ত্রীর প্রশংসা করতে পারবো না। সে যদি আমার কোন বন্ধুকে পছন্দ না করে তাহলে সে তাদের মুখের উপর তা বলে দেবে এবং কোন অস্পষ্টতা রাখবে না। আমার চেনাজানা মহিলাদের মধ্যে সে সবচেয়ে দৃঢ়তাসম্পন্ন। তার মা যখন জানতে পারলো যে, তার মেয়ে হুইস্কি পান করে তখন খুবই দুঃখ পেলেন। এক সন্ধ্যায় তার মা ঝড়ের বেগে রুমে প্রবেশ করে তার হুইস্কির গ্লাসটি তুলে মার্বেল ফ্লোরের উপর ছুঁড়ে মারলো। গ্লাসটি ভাঙ্গলো না, কিন্তু ফ্লোর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া হুইস্কি ছড়িয়ে পড়লো। আমার স্ত্রী চটজলদি গ্লাসটি তুলে নিয়ে আবার হুইস্কি ঢাললো। 'আমি এখন প্রাপ্ত বয়স্কা এবং বিবাহিতা মহিলা। আমার উপর খবরদারি করার কোন অধিকার তোমার নেই।' সে তার মাকে বললো। তার মা যখন ক্যান্সারে ভুগছিলেন, তখন তিনি তাকে প্রতিজ্ঞা করতে বলেন যে, সে নিয়মিত প্রার্থনা করবে। মরণাপন্ন মায়ের কাছে 'হ্যাঁ' বলার জন্যে আমার অনুনয় সত্ত্বেও সে প্রতিজ্ঞা করতে অস্বীকৃতি জানালো 'আমি এমন কোন প্রতিজ্ঞা করবো না, যা আমি পালন করতে পারবো না বলে জানি।' অনেক ক'টি মাস সে তার অসুস্থ মায়ের সেবা করেছে, তার কোলে মায়ের মাথা রেখে সারারাত ধরে বসে টিপে দিয়েছে। যখন তার মারা যান তখন সে পাশে ছিল। সে সকালে স্নান করে কফি হাউজ গেল নাশতা করতে। সেখানে কিছু বন্ধু তার মায়ের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিল, উনি ভালো আছেন।'এরপর বাড়ি ফিরে এসে চাকরদের বললো, শোক জানাতে আসা কোন দর্শনার্থীর সাথে সে দেখা করবে না। এক ফোটা অশ্রুও ফেলেনি সে। মায়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান অথবা পরবর্তী ধর্মীয় আনুষ্ঠানাদির একটিতেও সে যোগ দেয়নি। অন্যদিকে, আমাদের কুকুর সিম্বা যখন

অসুস্থ হয়ে পড়লো, তখন সে সারারাত জেগে কুকুরের সেবাযত্ন করেছে এবং পরিপূর্ণ চৌদ্দ বছর বয়সে কুকুরটি মারা গেলে সে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল।

আমাদের বাড়িতে সময়ের ব্যাপারে কঠোর শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারটি পুরোপুরি আমার স্ত্রীর কারণে। আমি শুধু সম্প্রতি নিজেকে শিখিয়েছি যে, কি করে দীর্ঘ সময় কাটাতে আসা দর্শনার্থীদের দ্রুত বিদায় করা যায়। সে তাদেরকে অল্প সময় দেয়। পূর্বানুমতি ছাড়া কেউ আমাদের বাড়িতে আসে না। আমাদের কোন আত্মীয় যদি সকালের দিকে বাড়িতে চলে আসে, তাহলে সে তাদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে গৃহস্থালির কাজ চালিয়ে যায় এবং মনে মনে দিনের খাদ্য তালিকা ঠিক ঠিক করে। আমরা মিশ্র খাবারে অভ্যস্ত– ফেঞ্চ, ইটালিয়ান, চাইনিজ, সাউথ ইন্ডিয়ান এবং কখনো কখনো পাঞ্জাবি খাবার। রন্ধন প্রণালীর বই দিয়ে তার দু'টি শেলফ সাজানো। বাবুর্চি চন্দনের সাথে মেনু নিয়ে আলোচনার আগে সে বই পড়ে নেয়। চন্দন ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের সাথে আছে। সময় পেলে সে চাকরদের সন্তানদের পড়ায় এবং তাদের ঘরের কাজে সাহায্য করে। আমরা লাঞ্চ বা চায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করি না বা কাউকে সেজন্যে আমন্ত্রণও জানাই না। যখন ডিনারের জন্যে বন্ধুদের আমন্ত্রণ করি, তারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত যেই হোক না কেন, তাদেরকে সময়ের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় এবং বলে দেয়া হয় যে, রাত ন'টার পর অতিথিরা থাকুক, আমরা তা আশা করি না। একবার জার্মান রাষ্ট্রদূত ও তার স্ত্রী ডিনারে এসেছিলেন। রাত সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ হলো। পানীয় পরিবেশন করা হলো। তখন রাত পোনে ন'টা। রাষ্ট্রদূত সিগার বের করে আমার স্ত্রীকে বললেন. ' মিসেস সিং, আমি জানি যে, আপনার অতিথিরা ন'টার মধ্যে বিদায় নিক, আপনি তা পছন্দ করেন। সেক্ষেত্রে যাওয়ার আগে আমরা কি সিগার টানতে পারি। আমার স্ত্রী ঝটপট উত্তর দিলো, 'মি. অ্যামবেসেডর, গাড়িতে বসে সিগার টানলেই মনে হয় আপনার ভালো লাগবে।' তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ' আমি বুঝেছি।' এবং আর কথা না বাড়িয়ে বিদায় নিলেন।

অনেক সুন্দরী মেয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসে। আমার স্ত্রীকে তারা যমের মত ভয় পায় এবং জানে যে, আমাদের বাড়ি আসা অব্যাহত রাখতে চাইলে তাদেরকে তার ডান পাশে থাকতে হবে।

আমার স্ত্রী সম্পর্কে এতো কমসংখ্যক লোকের জানার কারণ কি ? ফটোগ্রাফার এবং সাংবাদিকদের সে সহ্য করতে পারে না। কেউ এসে তার ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার রেডি করলে অথবা কলম বের করলে সে তখনই তাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেবে। এ ব্যাপারটি আমার পরিবারের সব মহিলার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য। আমার কন্যা এবং নাতনিও একই উপায়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

ইংল্যান্ডে আমার প্রথম বছরে আমি যখন উয়েলিয়ান গার্ডেনে অবস্থান করছিলাম, তখন কাভাল মালিক নামে এক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আমার সাথেই সে মডার্ন স্কুলে পড়তো। তার চেহারা সবসময় সুন্দর, গায়ের রং ফর্সা। ছেলেদের সঙ্গে হকি, ফুটবল খেলে। আমি যখন স্কুল ত্যাগ করি, তখনো সে সাদাসিধে বালিকা মাত্র, আমার চাইতে বেশ ক'বছরের ছোট। আমি লাহোরে ফিরে এলে তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে যখন তার সাথে আমার যোগসূত্র ছিল, তখন সে সুন্দরী হিসেবে প্রস্ফুটিত এবং আমার পরিচিত অনেকের দারুণ কাংখিত। তাদের কেউ কেউ ভারতের সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলোর ও ছিল। তার পরিবার গোঁড়া শিখ এবং তাদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, সিভিল সার্ভিসে যোগ দেয়া কোন শিখ যুবকের সাথেই তাকে বিয়ে দেবে। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল। তার এক চাচা, যিনি সিভিল সার্ভিসে ছিলেন তাকে বীর হিসেবে পূজা করা হতো। তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিখ ছেলেদের বাবা মা'র সাথে কথা বলছিলো। যে মেয়েটির সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে সে এখন তরুণীতে পরিণত হয়েছে। তাকে দেখে আমি বিমুগ্ধ , তার প্রেমে পড়লাম অনেকটা বেপরোয়ার মতো; একই সাথে আমার মনে হলো তাকে জয়ের সম্ভাবনা খুব সামান্য। অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে একটি ছিল, তার পিতা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আর আমার পিতা একজন ঠিকাদার, যাকে তার পিতার কাছ থেকে কাজ পেতে হয়। তাছাড়া আমি আইন শাস্ত্র পড়াশুনা করছিলাম এবং বিয়ের বাজারে আইনজীবীদের তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় আনা হয় না। তার বাবা মা আমার সম্পর্কে বেশ চিন্তাভাবনা করলেন। এক বছর আগে তারা আমার অবস্থানস্থল দেখে গেছেন। আমার বালিশের নিচে শিখদের একটি প্রার্থনা গ্রন্থ দেখে তার মা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। আমি তাদের সাথে আবার লেক ডিস্ট্রিক্টে সাক্ষাত করি। তারা বাউনেসের একটি সুন্দর হোটেলে অবস্থান করছিলেন; আর আমি ছিলাম উইন্ডারমেরির এক লজিং হাউজে। তাদের সাথে নাশতা করার জন্যে আমি সাত মাইল দূর থেকে এলাম। আমি জানতাম যে, আরেকটি ভালো শিখ যুবকের সন্ধান না পেলে তাদের কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিতে সম্মত হবেন।

আমার জন্যে সর্বোত্তম সুযোগ ছিল তার বাবা মাকে এড়িয়ে সরাসরি তার কাছে প্রস্তাব দেয়া। ক্রিসমাসের ছুটি ঘনিয়ে আসছে এবং সে কোথাও যাবে না। আমি তাকে আমার সাথে বাকিংহামশায়ারে কোয়াকার হোস্টেলে আসতে পরামর্শ দিলাম। সে তার বাবা মাকে লিখলো তাদের অনুমতি নেয়ার জন্যে। আমি খুব বিস্মিত হলাম যে, আমার সাথে যেতে দেয়ার ব্যাপারে তারা সম্মতি জানিয়েছেন। ট্রেন লন্ডন ছাড়া মাত্র আমি তার সাথে প্রেম বিনিময় শুরু করলাম এবং কোয়াকার হোস্টেলে পনের দিন অবস্থানকালেও তা অব্যাহত ছিল। লন্ডনে ফেরার পথে আমি তাকে বললাম যে, এবার আমার বাবা মাকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তার বাবা মার কাছে যাওয়ার জন্যে বলতে পারি কিনা। সে মাথা ঝুঁকিয়ে তার সম্মতি দিল।

কয়েকদিন পরই আমাদের এনগেজমেন্টের কথা জানানো হলো। এতে তার প্রণয়াকাংখীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মধ্যে অতি আগ্রহী একজন, যার বোনকে বিয়ে দেয়া হয়েছিল আমার প্রেমিকার ভাইএর সাথে, সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো, ' ব্যাংক ব্যালান্সের বিজয় হলো।' তখন আমার পিতা প্রচুর সম্পদের মালিক হিসেবে পরিচিত। যদিও তাদের অধিকাংশই আমাকে ঈর্ষা করতে লাগলো, শুধুমাত্র একজন মেয়েটিকে বিয়ে করা থেকে আমাকে বিরত রাখতে চেষ্টা করলো, সে, আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ই এন মানগত রায়। মেয়েটি সম্পর্কে তার নেতিবাচক মতামত ছিল। পরবর্তীতে সে গভীরভাবে মেয়েটির প্রেমে পড়লো যে, আমাদের বিয়ে ভাঙ্গতে প্রায় সফল হয়েছিল।

আইনের ডিগ্রি নিতে আমার নির্ধারিত সময়ের চাইতে এক বছরের বেশি লাগলো এবং আমি ইনার টেম্পলের ব্যারিস্টার হলাম। ইতিমধ্যে আমি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছি। সাফল্যের সম্ভাবনা ক্ষীণ দেখে আমি একটি বিষয় বাদ দিয়েছি। যখন ফলালফল ঘোষণা করা হলো, আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম যে, অল্পের জন্যে আমি উত্তীর্ণ হইনি। বৃটিশ এবং ভারতীয় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কেবলমাত্র আমাকেই মৌখিক পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর দেয়া হয়েছে। আমার লিখিত বিষয়ের পরীক্ষকদের চাইতে ইন্টারভিউ বোর্ডকে আমি অধিক প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ১৯৩৯ সালে গ্রীষ্মে আমি সমুদ্রপথে দেশে ফিরে এলাম। যুদ্ধ বেধে যেতে পারে বলে আলোচনা চলছিল। আমি যখন দিল্লি পৌছলাম, জার্মান বাহিনী তখন তার প্রতিবেশী দেশগুলো জয় করে ফেলেছে।

১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে আমি বিয়ে করলাম। অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিয়ে হলো। আমার স্ত্রীর পিতা তখন পিডব্লিউডি'র প্রধান প্রকৌশলী, সেই পদে উন্নীত প্রথম ভারতীয়। আমার পিতা দিল্লির সবচেয়ে বড় বিয়েল এস্টেট মালিক বলে স্বীকৃত। পাথর এবং মার্বেলে নির্মিত বিরাট এক ম্যানসনে আমরা বাস করতাম। যেখানে এক ডজনের অধিক বেডরুম ছিল। সেগুন কাঠের বুক শেলফ দেয়াল জুড়ে, লিভিং রুম ও ডাইনিং রুমে ঝাড়বাতি। আমাদের বিয়ের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এম এ জিন্নাহসহ দেড় হাজারের অধিক অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে শ্যাম্পেনের প্রবাহ ছিল বন্যার সময় যমুনা নদীর মতো। আমার স্ত্রী এতো উপহার পেয়েছিল যে পঞ্চাশ বছর ধরে বিলিবন্টন করার পরও সেগুলো শেষ হয়নি। আমার পিতা আমাকে নতুন গাড়ি এবং লাহোরে হাইকোর্টের কাছে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ও অফিস ভাড়া করে দিয়েছিলেন। রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে সংক্ষিপ্ত হানিমুন কাটিয়ে আমরা দু'জন আমাদের নতুন ফোর্ড গাড়িতে উঠে লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

শিখ সরদারজি এবং অভিনেত্রী

আমার দু'টি তত্ত্ব রয়েছে যা আমি প্রায় পুরোপুরি সত্য এই ছোট গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার ইচ্ছা পোষণ করছি। প্রথমটি হচ্ছে ঈশ্বর যাদেরকে সুন্দর চেহারা দিয়ে পুরস্কৃত করেননি তাদের সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছেন তার নিজস্ব রহস্যজনক উপায়ে। সাদামাটা দর্শন ঘরোয়া ধাঁচের একটি মেয়ের জন্যে তার রূপসী বোনদের ঈর্ষা করা উচিত নয়, কারণ পুরুষরা মেরিলিন মনরোর মতো দেখতে মেয়েদের চাইতে তার উদ্দেশ্যেও মন্তব্য করে। একজন পুরুষ রূপসী মেয়েদের প্রতি অশ্লীল বাজে মন্তব্য করে এবং বখাটে শ্রেণীর লোকরাই তাদেরকে প্রস্তাব দিয়ে থাকে। সেজন্য দেখা যায়–সাদামাটা দর্শন মেয়েদেরই পুরুষের সাথে ভালো সময় কাটে এবং সুন্দরী মেয়েদের চাইতে তাদের ভালো বিয়ে হয়। সুন্দরী মেয়েদের যৌনজীবন প্রায়ই সুখকর হয় না এবং বিয়ে বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় তত্ত্বটি কিছুটা গতানুগতিক ঃ শুধুমাত্র সাহসীরাই এই নিয়মের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত এবং সমভাবে প্রতিযোগিতার যোগ্য। অর্থাৎ কোন উদ্যোগ নেয়া না হলে অর্জিত হওয়ার প্রশ্নও আসে না।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমি লন্ডনের হাইগেটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ফ্ল্যাটে বাস করতাম। তখন আমি সবেমাত্র আমার কূটনৈতিক চাকুরি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু তখনো আমার বিরাট আমেরিকান লিমোজিনটি ছিল ডিপ্লোমেটিক নাম্বার প্লেটসহ। এছাড়া আমার মজুতে ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ডিউটি-ফ্রি শ্যাম্পেন, স্কচ, ওয়াইন এবং অন্য পানীয়। আমার পরিবার ভারতে ফিরে গেছে। আমার হাতে তিনমাস সময় ছিল আমি যে বইটির উপর কাজ করছিলাম তা শেষ করার জন্যে এবং স্বাধীনভাবে নিজেকে উপভোগ করার জন্যে। আমার উপরের অ্যাপার্টমেন্টটির ভাড়াটে ছিল একটি স্টেনোটাইপিং এজেন্সী, যারা সন্ধ্যায় তাদের কাজ বন্ধ করে দিতো। তার উপরের অ্যাপার্টমেন্টে থাকতো এক তরুণী মহিলা; আমি শুনেছি, মঞ্চাভিনেত্রী। সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হয়ে যায় সে এবং সেকেন্ড শো শেষ করে মধ্যরাতের পর ফিরে। তিনটি ফ্ল্যাটের জন্যে প্রবেশ পথ একটিই। যেহেতু আমাদের খোলা জায়গা সংলগ্ন একমাত্র গ্যারেজটি আমার লিমোজিনের জায়গা দেয়ার জন্যে ছোট, সেজন্যে সেটি পার্ক করতে হতো বাইরে। আমার বেসমেন্টের ফ্ল্যাটে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশের একমাত্র উৎস

একটি বড় জানালা, যার অর্ধেকটা বাইরের মাটির উচ্চতা পর্যন্ত এবং একটি বাসস্টপেজের পাশেই। আমার আর্মচেয়ারে বসে আমি বাসে উঠার জন্যে লাইনে দাঁড়ানো যাত্রী ও বাস থেকে অবতরণকারী যাত্রীদের পা দেখতে পেতাম।

দিনের অধিকাংশ সময় আমি বইএর উপর কাজ করতাম। আমার সেক্রেটারী হিসেবে ইন্ডিয়া হাউজে কাজ করতো যে মেয়েটি, সন্ধ্যায় সে এসে সারাদিন আমি যা লিখতাম তা নিতে আসতো এবং চলে যাওয়ার আগে আমার সাথে চা পান করতো। সে চলে যাওয়ার পর হ্যাম্পস্টীড হীথের দিকে হাটতে যেতাম এবং ফিরে এসে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে পানীয় নিয়ে বসতাম, গান শুনতাম, রাতের খাবার হিসেবে একটি স্যান্ডউইচ খেতাম এবং চোখে ঘুম না আসা পর্যন্ত পড়তাম। ঘুমোতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে যেত। শোয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেই সামনের দরজা খোলার এবং সেই অভিনেত্রী তরুণীর পদশব্দ শুনতে পেতাম সিঁড়িতে।

কিছুদিন পর আমি তার পরিচয় উদঘাটনে সক্ষম হলাম। যে মহিলা আমার ফ্ল্যাট পরিস্কার করতে আসতো উপরের দু'টি অ্যাপার্টমেন্টও সেই পরিস্কার করতো। একদিন এমনিতেই আমি তাকে উপরের তলার তরুণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। ' উনি মিস ডাউসন' সে উত্তর দিলো, ' জেনিফার ডাউসন, ছবির মতো সুন্দর। এছাড়া তিনি বেশ ভালো ভদ্রমহিলা। তার নাটকের জন্যে আমাকে দু'টি টিকেট দিয়েছিলেন। নাটকে তার খুব ছোট ভূমিকা ছিল। কিন্তু আমার কথা মনে রাখবেন, তিনি বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবেন। তার জন্যে কাজ করেছি বলে আমি নিজেই গর্ববোধ করবো।'

এরপর থেকে আমি আমার ফ্ল্যাটের পাশের বাস স্টপেজে শেষ বাসটির আগমন প্রতীক্ষা করতাম। শিগ্‌গিরই একজোড়া সুন্দর পা বাস থেকে অবতরণ করলে তা চিনতে শিখলাম এবং তা উপরে উঠার শব্দও। পাঠাগার ডট নেটের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এক রোববার সকালে আমি তার সাথে পরিচিত হতে ইচ্ছুক হলাম। আমি লক্ষ্য করেছি যে, সে সকালের দিকে একটি শো এর জন্যেও যায়। যেহেতু রোববারে কোন শো থাকে না, সেদিন বিকেলে অ্যাপার্টমেন্টেই কাটায়, সম্ভবত; কাপড় চোপড় পরিস্কার করে। নির্ধারিত রোববার যখনই আমি তার নেমে আসার পদশব্দ শুনলাম, আমি আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হলাম। সে তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ' আমরা প্রতিবেশী, কিন্তু কখনো আমাদের সাক্ষাত হয়নি। আমি জেনিফার ডাউসন। মিসেস মার্কহ্যাম আমাকে বলেছেন, আপনি মি. সিং। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আমি আনন্দিত।

আমি তার নরম কমনীয় হাতটি আমার হাতে নিয়ে বললাম, 'মিসেস মার্কহ্যাম আমাকে বলেছে যে, তুমি সুন্দরী, কিন্তু কতো সুন্দরী, তা বলেনি। একজন খ্যাতিমান অভিনেত্রীর নিচে বাস করে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। '

'খ্যাতিমান, ঘোড়ার ডিম।' সে হেসে বললো। ' আমি তো মাত্র একজন এক্সট্রা। আপনি যদি দেখতে চান যে, আমি কেমন এক্সট্রা, তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাকে আমার শো এর একটা টিকেট দেব। ওটুকুই করার সাধ্য আছে আমার। সেটা আমি বিনে পয়সায় পাই। '

আমি গাড়ির সামনের দরজা তার জন্যে খুলে দিয়ে বললাম, 'আমি কি আপনাকে কোথাও নামিয়ে দিতে পারি। গাড়িতে উঠিয়ে হাওয়া খাওয়ানোর চাইতে বেশী কিছু করার নেই আমার।'

সে আমার রথ আকৃতির লিমোজিনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বার ব্লিমি! নিশ্চয়ই গ্যালন গ্যালন পেট্রোল খায়! আমি সামনের কোনার দিকে যাচ্ছি। আপনার আমেরিকান রোলস-রয়েসে উঠে যেতে আমার আপত্তি নেই।

আমি তাকে চার্চে নামিয়ে দিলাম। ' ফেরার পথে তোমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারি। প্রার্থনা কতোক্ষণ ধরে চলবে ? আমি জানতে চাইলাম।

' আপনার অশেষ অনুগ্রহ! 'সে উত্তর দিল। 'এক ঘন্টার মধ্যে আমি বের হয়ে আসবো। আপনি সত্যিই কিছু মনে করবেন না তো ?'

'এই পবিত্র দিবসের সকালে ইংলিশ হাওয়া সেবন ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই। আল্লাহ্ তার বেহেশতে আছেন এবং পৃথিবীতে সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলছে।'

আমি নিজেকে ঝরঝরে করতে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেলাম। এরপর আবার গাড়ি নিয়ে চার্চের বাইরে উপস্থিত হলাম। রেডিও অন করলাম। আমার ভাগ্য ভালো, বিটোফেনের নাইনথ সিম্ফোনি। আমার পরিচিত পাশ্চাত্যের একমাত্র সুর। সে সুর ভেসে আসছিল তার সমস্ত সুরময় সৌন্দর্য নিয়ে।

চার্চের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা প্রথম লোকগুলোর মধ্যে ছিল সে। একজনের সাথে হাত মিলিয়ে সে গাড়ির দিকে দৌড়ে এল। সত্যিই সে অসাধারণ সুন্দরী। স্বর্ণাভ-ধূসর চুল তার কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, কপাল প্রশস্ত, বড় বড় বাদামি চোখ, সুন্দর গলা এবং ফিগার এতো চমৎকার যেন সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ কোন সুন্দরী। সিম্ফোনি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকি।' সে বললো।

আমি ধীর গতিতে গাড়ি চালিয়ে হীথ মোড় ঘুরে স্প্যানিয়ার্ড ইন রোড এবং ভেল অফ হীথ বরাবর যাচ্ছিলাম। সে সুরের সাথে গুনগুন করছিল এবং মাথা নাড়ছিল, যেন আমার অস্তিত্ব পুরোপুরি ভুলে গেছে। সিম্ফোনি যখন প্রবলভাবে বেজে সমাপ্ত হলো তখন আমরা কীটস গ্রোভ অতিক্রম করছিলাম। 'বিস্ময়কর সুর' সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো। 'আমার জন্যে ঝামেলা সহ্য করেছেন, সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার গুরুত্বপূর্ণ সকালটা আমি বরবাদ করে দিয়েছি।'

'আমি যথার্থই উপভোগ করেছি।' আমি উত্তর দিলাম। ' আমার মনে হয়, তুমি এ সময়গুলো আরো বরবাদ করতে পারো। প্রতিদিন মিসেস মার্কহ্যাম ও আমার সেক্রেটারীর সাথে সামান্য কয়েক মিনিট কথা বলা ছাড়া সারাদিন কারো সাথে আমার কথা হয় না। বাদবাকি সময় কাটে বই নিয়ে এবং নিরবতায়।'

সে আমার টোপ গিললোও না, অথবা গ্রহণও করলো না। ' আমার কাপড় চোপড় কে ধোবে বা ইস্ত্রি করবে, মায়ের কাছে সপ্তাহে একটি চিঠি কে লিখতে অথবা রাতের খাবার তৈরি করে দেবে ?' আমার কাঁধের উপর মৃদু চাপড় দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

পরের রোববার আমি তার দরজার নিচ দিয়ে একটি চিরকুট ঢুকিয়ে দিলাম সন্ধ্যায় আমার সাথে মদপানের আমন্ত্রণ জানিয়ে যে, সে যাতে দিনের কাজ সেরে চলে আসে। সে কোন উত্তর জানালো না, কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে যখন রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠলো সিঁড়িতে আমি তার পদশব্দ শুনলাম এবং দরজার উপর হাতের আলতো চাপড়। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা খুলে স্বাগত জানালাম। ' আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার কথা ভেবেছেন বলে আমি আনন্দিত ' সে বললো। সে মৃদু আলোকিত রুমের চারদিকে চোখ বুলালো। একটি মাত্র টেবিল ল্যাম্প জ্বলছিল। আমি রুমের বাতি জ্বলিয়ে তার ওভারকোট খুলতে সহায়তা করলাম। ' জমে যাওয়ার মতো ঠান্ডা। দয়া করে এটি ঝুলিয়ে রাখতে কিছু মনে করবেন না।'সে বললো।

মিসেস মার্কহ্যাম সবসময় ফায়ার প্লেসে কয়লা দিয়ে রাখে। আমি একটি জিনের বোতল খুলে কয়লার উপর ছিটিয়ে দিয়াশলাই এর কাঠি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দিলাম। নীল শিখা তুলে কয়লা জ্বলে উঠলো এবং শিগগির রুম উষ্ণ হতে শুরু করলো। ' কেউ কেউ কেমন অপব্যায়ী হতে পারে।' সে বিস্ময় প্রকাশ করলো। ' জিন দিয়ে কেউ আগুন জ্বালায় , এমনটা কখনো শুনিনি।

' ডিউটি-ফ্রি ডিপ্লোমেটিক সুবিধা আর কি, 'আমি উত্তর দিলাম। 'এ জন্যে আমার ব্যয় খুব সামান্য এবং এতে কাগজ বা কাঠের টুকরার চাইতে দ্রুত আগুন জ্বলে। তুমি কি পান করবে ? স্কচ, জিন, শেরি, ভদকা, শ্যাম্পেন ?

সে কাঁধ থেকে ওভারকোট নামিয়ে রেখে ফায়ার প্লেসের সামনে হাত গরম করলো। 'আপনার কাছে যদি পানীয়ের এতো প্রবাহ থাকে, তাহলে শ্যাম্পেন পান করতেই আমার ভালো লাগবে। ' সে উত্তর দিল। আমি ফ্রিজ থেকে মাউন্টেন রথশিল্ডের একটি বোতল বের করে পেশাদারী ঢং এ কর্ক খুলে গ্লাসে ঢাললাম। দামী গ্লাসে ঢালা শ্যাম্পেন থেকে বুদবুদ উঠছিল। আমি গ্লাস তুলে টোস্টের জন্যে অপেক্ষা করলাম, 'বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের জন্যে! ' উচ্ছ্বাসে তার মুখমন্ডল লাল হলো এবং তার গ্লাস তুলে আমার গ্লাসের সাথে স্পর্শ করে উত্তর দিল , 'বিশ্বের চমৎকার বৃদ্ধ এবং মহা মিথ্যুকের জন্যে।'

একটি চেয়ারে বসে সে শ্যাম্পেনে চুমুক দিল। আমি কয়েক বার তার গ্লাস পূর্ণ করে দিলাম। ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের আভা তার মুখের উপর পড়েছে এবং কোঁকড়া চুলও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ' জেনিফার, নিশ্চয়ই তোমার অনেক ভক্ত এবং বয়ফ্রেন্ড আছে। আমি বললাম।

'আপনি একথা বলছেন কেন ?' সে জানতে চাইলো।

'এখন তো তুমি মাছ শিকার করছো। যখনই আয়না দেখবে প্রতিবার তোমার আয়না নিশ্চয়ই তোমাকে বলবে যে, কেন ?'

'আপনি সত্যিই চমৎকার মানুষ। ' সে বললো। বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, আমার কখনো কোন বয়ফ্রেন্ড ছিল না। তবে কিছু ভক্ত অবশ্যই আছে। তারা আমাকে শুভেচ্ছা জানায়, অভিনন্দিত করে। বাস্ , ও পর্যন্তই।'

আমি তাকে আরো বেশি শুভেচ্ছা জানালাম, প্রশংসা করলাম। সুন্দরী নারীর প্রশংসা করতে আমার জানা ইংরেজ কবিদের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি ছিলো। উজ্জ্বল ফায়ার প্লেসের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সে কবিতার লাইনগুলো শুনলো। আমি মিউজিক অন করলাম। সে চোখ বন্ধ করলো।

আমি স্যান্ডউইচ ও কফি তৈরি করে একটি ট্রেতে তুলে তার জন্যে আনলাম। তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'ঘুমিয়ে পড়েছো?' একটু চমকে সে সোজা হলো। 'না, না তা নয়। মিউজিক শুনতে শুনতে খানিকটা দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম। আরে এসব তো আমারই করা উচিত ছিল, আপনার নয়, ট্রের দিকে তাকিয়ে সে বললো। 'আপনি দেখছি আমাকে অলস করে দেবেন।

আমরা নিরবে স্যান্ডউইচ খেলাম এবং কফি পান করলাম। আমার উপর নিবদ্ধ তার প্রশ্নপূর্ণ আয়ত চোখ। আমি কি সাহস করে আরো একটু এগুবো? না, আমার পছন্দ করার সাধ্যেরও অতিরিক্ত সুন্দরী সে এবং আমি একটি ভুল পদক্ষেপ নিয়ে তার বন্ধুত্ব হারাতে চাই না। কিছুক্ষণ পর সে উঠে দাঁড়ালো। 'আমি যেতে চাই না, কিন্তু আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। সুন্দর নিদ্রা এবং ওসব – কোনকিছুই মঞ্চের সাথে সঙ্গতি বিধানের মতো নয়।' সে আমার নাকের উপর তার ঠোট ছোঁয়ালো। ' চমৎকার এই সন্ধ্যার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।' সে চলে গেল এবং আমি দরজা বন্ধ করলাম।

আমি একটা সুনাম অর্জন করে ফেললাম যে, আমি যথার্থই একজন ভদ্রলোক এবং তার সাথে কোন ধরনের অবাঞ্ছিত স্বাধীনতার সুযোগ নিতে চাই না। আমি সময়ের উপর সব ছেড়ে দিয়েছি এবং তার উপরও। তার সাথে তার মিলাতে আমি কাজের সময় বদলে ফেললাম।

প্রতি রাতে সে থিয়েটার থেকে আসতো। আমি ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাতাম, ফ্রিজ থেকে শ্যাম্পেন বের করতাম, একটি ট্রেতে স্যান্ডউইচ ও ধুমায়িত কফি পট। শুতে যাবার আগে সে আমার সাথে মদপান করতো। রোববারগুলো আমরা একসাথে কাটাতাম। সে আমাকে বলেছে যে, সে চার্চে যায়, কারণ এর চাইতে ভালো কিছু করার থাকে না তার। গ্রামের দিকে বেড়াতে যেতে ভালো লাগে তার, জঙ্গলের মাঝে হাঁটতে এবং আমার ফায়ার প্লেসের পাশে পবিত্র দিনের সমাপ্তি ঘটাতে। আমরা কেনউড এবং কিউ এ গেলাম। বার্সহ্যামবীচ, কাটসওল্ডস এবং স্ট্রাটফোর্ড -অন-অ্যাভন এ বেড়ালাম। প্রথম রাতে তার যতোটা কাছে ছিলাম, তার চাইতে ঘনিষ্ঠ হলাম না।

লাহোরে আমার কলেজ জীবনের এক বন্ধু লন্ডনে এল। তার কাছে অর্থকড়ি তেমন ছিল না এবং কৃতজ্ঞতার সাথে আমার সাথে অবস্থানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। সে দেখতে ছোটখাট, নারীসুলভ সরদারজি, যার প্রধান যোগ্যতা ছিল, সে একজন ভালো শ্রোতা। তাকে কেউই নারীদের কাছে প্রিয় বলে সন্দেহ করবে না অথবা এক্ষেত্রে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলেও বিবেচনা করবে না। জেনিফারের ব্যাপারে তাকে বললাম, তার দেবীসুলভ সৌন্দর্যের কথা এবং জেনিফারের প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণ করতে বললাম।

প্রথমবার যখন তাদের সাক্ষাত হলো তখন সরদারজি তার সাথে অত্যন্ত শোভনীয় ব্যবহার করেছে। জেনিফার তাকে তার শো এর একটি টিকেট দিল। শো শেষে একসাথে তারা ফিরে এল। পরবর্তী রোববার আমরা কিছু ভারতীয় বন্ধুকে সস্ত্রীক আমন্ত্রণ করলাম, যাদেরকে আমরা লাহোরে , জানতাম। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, প্রধান আকর্ষণ ছিল জেনিফার। পার্টি অত্যন্ত সফল হলো। জেনিফার আমন্ত্রণকারীর ভূমিকায় এবং সব মহিলার সাথে সে কথাবার্তা বললো। অতিরিক্ত যেভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল তাতে আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে, তারা জেনিফারকে আমার মহিলা বলেই মনে করছে এবং আমার পরিবার যখন আমার সাথে নেই, তখন আমি খুব ভালো সময় কাটাচ্ছি। তাদের ভাবনা থেকে দূরে সরাতে চাইলাম না।

পার্টি গভীর রাত পর্যন্ত চললো এবং অতিথিরা বিপুল পরিমাণ স্কচ ও শ্যাম্পেন গলধ:করণ করলো তারা। সবাই বেশ উচ্ছ্বাসের মধ্যে, বিশেষ করে আমার আশ্রিত অতিথি। সে তার মাত্রার অতিরিক্ত পান করলো। মাঝরাতের দিকে অতিথিরা বিদায় নিল, জেনিফার ও সরদারজিকে আমার সাথে রেখে। আমি যখন শূন্য গ্লাস ও অ্যাশট্রেগুলো সরিয়ে নিচ্ছিলাম তখন ওরা দু'জন গা এলিয়ে বিশ্রাম করছিল। আমার সরদারজি বন্ধু জেনিফারের পদপ্রান্তে কার্পেটে বসে পড়েছে এবং কুকুরের মতো দৃষ্টিতে আত্মমগ্ন হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মাথা জেনিফারের উরুর উপর রেখে তার সুন্দর পা দু'টো টানতে লাগলো।

'দয়া করে আপনার বন্ধুকে বলুন ভদ্র আচরণ করতে,' জেনিফার আমাকে বললো। আমি পাঞ্জাবি ভাষায় সরদারজিকে বললাম। সে এতোটা মগ্ন যে আমার কোন ভাষাই তার কানে প্রবেশ করবে না। জেনিফার তার চেয়ার ছেড়ে অন্য একটি চেয়ারে গিয়ে বসলো। একটু পর সরদারজিও নিজেকে টেনে তুললো এবং জেনিফার যে চেয়ারে বসেছে সে চেয়ারের হাতলে বসে তার চুল আকর্ষণ করতে শুরু করলো। এবার আমি কণ্ঠ উচু করে তাকে ধমক দিলাম। কিন্তু তাতে কাজ হলো না। 'জেনিফার, আমার মনে হয়, তোমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে যাওয়া উচিত।' আমি পরামর্শ দিলাম।

জেনিফার আরেকবার চেয়ার পরিবর্তন করলো। সরদারজি তাকে অনুসরণ করে তার অভদ্র আচরণ অব্যাহত রাখলো। আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। 'ঈশ্বরের দোহাই, জেনিফারকে বিরক্ত করো না। তুমি মাতাল হয়ে পড়েছ। এর চেয়ে ভালো, তুমি বিছানায় যাও।'

আমার কথার কোন পাত্তাই দিল না সে। দু'জনের মধ্যে যেন লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। আর আমি রেফারির দায়িত্ব পালন করছি।

দু'জনের কেউই তাদের নিজনিজ বিছানায় যাওয়ার ব্যাপারে আমার পরামর্শ গ্রহণ করলো না। পিছনে ধাওয়া করার এই খেলায় সরদারজি বেসামাল হয়ে পড়ে গেল। তার পাগড়ি খুলে পড়লো এবং কার্পেটের উপর সে বমি করলে আমি খুব রেগে গেলাম। জেনিফার ক্ষমা প্রার্থনা করে তার অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেল। সরদারজিকে তার বমির মধ্যে রেখে আমিও আমার বেডরুমে গেলাম।

পরদিন সকালে আমি সরদারজি বন্ধুকে বললাম, অন্য কোথাও থাকার জায়গা খুঁজে নিতে। সে কোন আপত্তি বা ক্ষমা প্রার্থনা না করে চলে গেল। জেনিফারকে একটি চিরকুটে লিখলাম সরদারজির আচরণের জন্যে ক্ষমা করতে এবং আশা করতে থাকলাম যে, যা ঘটেছে সেজন্যে সে আমার প্রতি বিরূপ হবে না। আমি ভাবলাম যে, সে থিয়েটার থেকে ফিরলে তাকে স্বাগত জানাতে দরজা খোলা না রাখাই ভালো হবে এবং সে চাইলে দরজায় টোকা দিতে পারে। আমি একটি চিরকুট পেলাম, যাতে সে আমাকে উদ্বিগ্ন না হতে বলেছে। কিন্তু সে আমার দরজায় টোকা দিল না। রাতের পর রাত আমি তার পা দেখি বাস থেকে নামতে। সামনের দরজার তালা খোলার এবং সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাওয়ার পদশব্দ শুনি। নিজেকে খুব নিগৃহীত এবং বিনাদোষে শাস্তিপ্রাপ্ত বলে ভাবতে থাকি। এবং নিঃসঙ্গ। আমার কাজে মন বসাতে পারছি না। আমার মনের শান্তি দূর হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছিল যে, সরদারজি বন্ধুটির সঙ্গে আবার যদি সাক্ষাত হয়, তাহলে একটি চমৎকার বন্ধুত্ব ধ্বংস করার কারণে তার নাকের উপর ঘুষি লাগাবো।

এরপরের রোববার এলো। উজ্জ্বল, সূর্যালোকিত দিন, চার্চের দূরাগত ঘন্টাধ্বনি থেকে জেনিফার যে চার্চে যায় সেখানকার সর্বোচ্চ ধ্বনি আমার কানে ভেসে আসে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না। আমি উপরে তার অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আগে সে কখনো আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। আমার ইচ্ছা, আগের মতোই তাকে নিয়ে গ্রামের দিকে বেড়াতে যাব। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, সে অবশ্যই যাবে।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে আমি উপরের তলায় উঠলাম। ডোরবেলের সুইচের পাশে একটি কাগজে লিখা 'জেনিফার ডাউসন'। আমি বেল বাজালাম। আমি জেনিফারের উচ্চ কণ্ঠ শুনলাম, 'যাও, দেখ, কে এসেছে ? হয়তো কোন টেলিগ্রাম বা অন্যকিছু।' দরজা খুললো। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে পাজামা পরা আমার সরদারজি বন্ধুটি।

লেডি মোহনলাল

রেলস্টেশনের প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমের আয়নায় স্যার মোহনলাল নিজের দিকে তাকালেন। আয়নাটি স্পষ্টত ভারতে তৈরি। আয়নার পিছনে বিভিন্ন অংশের রেড অক্সাইড উঠে গেছে এবং উপরিভাগে দীর্ঘ দাগ কাটা। স্যার মোহন আয়নার দিকে দয়া প্রদর্শন ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখলেন। 'তোমার দশাও দেখছি এদেশের অন্য সবকিছুর মতোই; অদক্ষ, নোংরা, নৈর্ব্যক্তিক।' তিনি বিড়বিড় করলেন।

আয়নাও যেন স্যার মোহনকে হাসি ফিরিয়ে দিল, ' আপনি অনেকখানি যথার্থ বলেছেন, বৃদ্ধ মহোদয়। আপনি তো মর্যাদাবান, দক্ষ – এমনকি হ্যান্ডসাম। সুচারু করে ছাঁটা গোঁফ, গোলাপি লাল বোতামশোভিত সেভিল রো থেকে কেনা সুট, ডি কলোনের সুবাস, ট্যালকম পাউডার, সুগন্ধি সাবান, সব আপনার জন্যে। জি,জি, বৃদ্ধ মহোদয়, আপনি কিছুটা ঠিকই বলেছেন।'

স্যার মোহন তার বুকটা টান করে তার বেল্লিওল টাই সমান করে আয়নার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। হাত ঘড়ির পানে তাকালেন তিনি। আরো খানিকটা সময় আছে, চটজলদি কিছু পান করা যাবে। 'কৌঈ হ্যায়।'

তারের দরজা ঠেলে সাদা পোষাক পরিহিত বেয়ারারের আবির্ভাব ঘটলো।

'ছোট্ট এক পেগ দাও,' স্যার মোহন নির্দেশ দিয়ে বিশালাকার বেতের চেয়ারে এলিয়ে বসলেন পান করতে এবং স্মৃতি রোমন্থন করতে। ওয়েটিং রুমের বাইরে দেয়ালের পাশে স্যার মোহনলালের লাগেজের স্তূপ। ধূসর বর্ণের একটি ছোট স্টিলের ট্রাংকের উপর বসে লছমি অর্থাৎ লেডি মোহনলাল পান চিবুচ্ছেন এবং সংবাদপত্র দিয়ে নিজেকে বাতাস করছেন। তিনি বেঁটেখাটো মোটা মহিলা এবং বয়স চল্লিশোর্ধ। লাল পাড়ের একটি ময়লা সাদা শাড়ি তার পরনে। নাকের এক পাশে হীরার নাকফুল জ্বলজ্বল করছে এবং দু'হাতেই বেশ ক'টি করে সোনার চুড়ি। স্যার মোহন বেয়ারারকে ওয়েটিং রুমে ডাকার আগে লেডি তার সাথেই কথা বলছিলেন। সে চলে গেলে তিনি তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী কুলিকে জিজ্ঞাসা করলো, 'মহিলাদের বিশ্রামের জায়গা কোথায় ?' 'প্ল্যাটফর্মের ওই প্রান্তে।'

কুলি তার পাগড়ি চ্যাপটা করে মাথার উপর বসিয়ে ট্রাংকটা তুলে প্ল্যাটফর্মের প্রান্তের দিকে চললো। লেডি মোহনলাল তার পিতলের টিফিন ক্যারিয়ার এবং পানের বাটা হাতে তুলে স্বচ্ছন্দ গতিতে তাকে অনুসরণ করলেন। পথিমধ্যে তিনি একটি পান

দোকানে থেমে তার রূপার পানের বাটা আবার পান দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে আবার কুলির সাথে যোগ দিলেন। কুলির নামিয়ে রাখা ট্রাংকের উপর বসে তিনি তার সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। 'এই লাইনের ট্রেনে কি খুব ভিড় হয় ?'

'এখন সব ট্রেনই যাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা থাকে। কিন্তু মহিলা কম্পার্টমেন্টে আপনি জায়গা পাবেন। '

'তাহলে ট্রেনে উঠে খেতে ঝামেলা হতে পারে।'

লেডি মোহনলাল তার পিতলের টিফিন ক্যারিয়ার খুললেন এবং ভাঁজ করে রাখা কিছু চাপাতি এবং আমের আচার বের করলেন। যখন তিনি খাচ্ছিলেন তখন কুলি তার বিপরীত দিকে পাছায় ভর করে বসে আঙ্গুল দিয়ে প্ল্যাটফর্মে আঁকিবুকি কাটছিল।

'আপনি কি একা সফর করছেন, দিদি ?'

'না, আমার কর্তাও সাথে আছেন। তিনি ওয়েটিং রুমে। প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন তিনি। তিনি দামী লোক এবং ব্যারিস্টার। ট্রেনে বহু অফিসার ও ইংরেজের সাথে সাক্ষাত হয় তার – আমি তো সামান্য দেশী মহিলা। আমি ইংরেজী বুঝি না, তাদের চালচলন সম্পর্কে জানি না। সেজন্যে আমি ইন্টার ক্লাসে মহিলাদের মধ্যে থাকি।'

লছমি খোশ গল্পে মেতে উঠেছেন। গালগল্প তার পছন্দ এবং বাড়িতে কথা বলার মতো কেউ নেই। তার জন্যে ব্যয় করার মতো সময় তার স্বামীর নেই। তিনি বাড়ির উপর তলায় থাকেন এবং স্বামী নিচতলায়। তার বাংলোতে এসে স্ত্রীর অশিক্ষিত দরিদ্র আত্মীয় স্বজনরা ঘুরাঘুরি করুক তা তিনি পছন্দ করেন না; অতএব তারা কখনো আসেন না। রাতে কখনো তিনি উপরে উঠে আসেন এবং স্ত্রীর সাথে সামান্য কয়েক মিনিট অবস্থান করেন। ইংরেজী উচ্চারণে হিন্দিতে তিনি শুধু স্ত্রীকে হুকুম করেন এবং তিনি নিরাসক্তভাবে হুকুম পালন করেন। এসব নৈশ বিচরণে তার গর্ভে কোন ফল সঞ্চার হয়নি।

সিগন্যাল ডাউন এবং বেল বাজার মধ্য দিয়ে ট্রেনের আগমনী বার্তা ঘোষিত হলো। লেডি মোহনলাল তড়িঘড়ি তার খাবার শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। তখনো তিনি আচারের আমের খোসাটা চাটছিলেন। মুখ হাত ধোয়ার জন্যে কলের কাছে যেতে যেতে তিনি দীর্ঘ সশব্দ ঢেকুর তুললেন। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ও হাত মোছার পর তিনি ঢেকুর তুলতে তুলতে এবং তৃপ্তি সহকারে খেতে পারায় ভগবানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে তার স্টিলের ট্রাংকের কাছে ফিরে গেলেন।

ট্রেন এলো। লছমি ট্রেনের শেষ প্রান্তে গার্ডের ভ্যানের পাশে প্রায় যাত্রীশূন্য ইন্টারক্লাস মহিলা কম্পার্টমেন্টে গিয়ে উঠলেন। বাদবাকী কম্পার্টমেন্টগুলো যাত্রীতে ঠাসা। জানালার পাশেই একটি আসন পেলেন তিনি। শাড়ির আঁচলের গিটে বাঁধা দু'আনার একটি মুদ্রা বের করে কুলিকে বিদায় করলেন। এরপর তিনি পানের বাটা খুলে দু'টি পান বের করলেন। তাতে খয়ের, চুন লাগালেন এবং এরপর সুপারির টুকরা ও এলাচ দানা দিয়ে মুখের মধ্যে ঠেলে দিলেন। দু'পাশের গালই ফুলে উঠলো। হাতের উপর থুতনি রেখে তিনি প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন অলসভাবে।

ট্রেনের আগমন স্যার মোহনলালের মধ্যে কোন তাড়ার সৃষ্টি করলো না। তিনি তখনো স্কচ হুইস্কি পান করছেন এবং বেয়ারারকে নির্দেশ দিলেন প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে লাগেজ তোলার পর তাকে জানাতে। উত্তেজনা, কোলাহল, তাড়াহুড়া হচ্ছে নিম্নজাত লোকদের প্রকাশ এবং স্যার মোহনলাল যথার্থই সদ্বংশজাত। তিনি সবকিছু টিপটপ, নিয়মমাফিক চান। বিদেশে পাঁচ বছর অবস্থান করে স্যার মোহন অভিজাত শ্রেণীর আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি আহরণ ও আয়ত্ত করেছেন। তিনি হিন্দিতে সচরাচর কথা বলেন না। যদি কখনো বলেন, তা ইংরেজদের মতো করে বলেন, শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় শব্দগুলো– তাও যথাযথ ইংরেজী উচ্চারণে। কিন্তু তার ইংরেজী চমৎকার, সুচারু ও পরিশীলিত।

তিনি সংস্কৃতিবান ইংরেজদের মতো কথা বলতে পছন্দ করেন এবং যে কোন বিষয় নিয়েই বলতে পারেন – বইপুস্তক, রাজনীতি, মানুষ। তিনি তো ইংরেজদের কাছে অহরহই শুনছেন যে, তিনি ইংরেজদের মতোই কথা বলেন।

স্যার মোহন বিস্মিত বোধ করলেন যে, তিনি কি এই ট্রেনে একাই ভ্রমণ করছেন! এটি একটি ক্যান্টনমেন্ট এবং কিছু ইংরেজ অফিসারের তো ট্রেনে থাকার কথা। সুখকর আলোচনার সম্ভাবনার কথা ভেবে তার হৃদয় উষ্ণ হয়ে উঠলো। অধিকাংশ ভারতীয় যেভাবে ইংরেজদের সাথে কথা বলার আগ্রহ দেখিয়ে থাকে, তিনি কখনো তেমনটি করেননি। কিংবা তাদের মতো করে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে তিনি কখনো উচ্চকণ্ঠও হননি। সব ব্যাপারে তিনি নৈর্ব্যক্তিক। তিনি কম্পার্টমেন্টের কোণার দিকে তার আসন নিয়ে লন্ডনের 'দি টাইমস' এর একটি সংখ্যা বের করবেন। পত্রিকাটি তিনি এমনভাবে রাখবেন যাতে তার ক্রসওয়ার্ড খেলার সময় অন্যদের কাছে পত্রিকার নামটি স্পষ্ট দেখা যায়। ' দি টাইমস' সবসময় মানুষের দৃষ্টি কাড়ে। তিনি যখন সৌজন্য দেখিয়ে বলবেন যে, ' আমি এটা পড়ে ফেলেছি' তখন পাশের যাত্রী সেটি ধার নিতে আগ্রহ প্রকাশ করবে। হয়তো কেউ তার ব্যাল্লিওল টাইটা দেখে এর অভিজাত্য সম্পর্কে ধারনা করতে সক্ষম হবে; যা তিনি ভ্রমণের সময় ব্যবহার করেন। সেটি তাকে রূপকথার অক্সফোর্ডের আলাপ শুরু করার সুযোগ করে দেবে। অক্সফোর্ডে থাকাকালে শিক্ষক, বন্ধুবান্ধবী, নৌকা বাইচ এবং অন্য খেলাধূলার প্রসঙ্গগুলো আসবে। 'দি টাইমস' আর 'টাই' দু'টোই যদি ব্যর্থ হয়, তখন স্যার মোহন তার বেয়ারারকে জলদ গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দেবেন স্কচ হুইস্কি বের করতে 'কৌঈ হ্যায়!' ইংরেজদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হুইস্কি কখনো ব্যর্থ হয় না। এরপর থাকবে বৃটেনের সিগারেটে পূর্ণ দৃষ্টি কাড়া সোনালী সিগারেট কেস। ভারতে বৃটেনের সিগারেট ? লোকটি কি করে এখানে এগুলো পেল ? এরকম মনে করায় তিনি রাগ করবেন না। স্যার মোহনের বোঝাপড়া তার মনের মতো বিবেচিত হলো। কিন্তু তার ছেড়ে আসা প্রিয় ইংল্যান্ডের ব্যাপারে ভাব বিনিময় করার মাধ্যম হিসেবে একজন ইংরেজকে ব্যবহার করতে পারবেন ? ধূসর ব্যাগ ও গাউনের সেই পাঁচটি বছর। স্পোর্টস ব্লেজার এবং টেনিস খেলা, ইনস অব কোর্ট এ ডিনার এবং পিকাডেলির

পতিতাদের সাথে রাত্রিযাপনের দিনগুলোর কথা। পাঁচ বছরের ব্যস্ত উজ্জ্বল দিনগুলোর মূল্য ভারতে তার নোংরা, অশ্লীল কথনে অভ্যস্ত দেশবাসী, বাড়ির উপরের তলায় যৌন যাত্রা এবং ঘাম ও পিঁয়াজের গন্ধযুক্ত মোটাসোটা বৃদ্ধা লছমির সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত যৌন কর্ম সম্বলিত পয়তাল্লিশ বছরের জীবনের চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান।

স্যার মোহনের চিন্তায় বাধা পড়লো , যখন বেয়ারার তাকে জানাতে এলো যে তার লাগেজ ইঞ্জিন সংলগ্ন ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে তুলে দেয়া হয়েছে, তখন তিনি ভারী পদক্ষেপে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি হতাশ হলেন। কম্পার্টমেন্ট পুরোই শূন্য। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি এক কোণায় বসে ইতোপূর্বে বহুবার পাঠ করা দি টাইমস এর সংখ্যাটি মেলে ধরলেন।

স্যার মোহন জানালা দিয়ে ভিড়পূর্ণ প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালেন। প্রত্যেকটি কম্পার্টমেন্টে স্থান খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসা দু'জন ইংরেজ সৈনিককে দেখে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাদের পিঠে হ্যাভারস্যাক বাধা এবং দু'জনই স্খলিত পায়ে হাঁটছে। স্যার মোহন তাদেরকে স্বাগত জানাতে সিদ্ধান্ত নিলেন, যদিও তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করার কথা। তিনি গার্ডের সাথে এ নিয়ে কথা বলবেন।

সৈনিকদের একজন শেষ কম্পার্টমেন্ট পর্যন্ত এসে জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলো। সে কম্পার্টমেন্টটি জরিপ করে নিয়ে যাত্রীশূন্য বার্থ লক্ষ্য করলো।

'হিয়ার, বিল' সে চিৎকার করলো, 'এখানে জায়গা আছে। '

তার সঙ্গীটিও এসে যোগ দিলো। কম্পার্টমেন্ট দেখলো এবং স্যার মোহনের দিকেও তাকালো।

'গেট দ্য ফিগার আউট,' বিড়বিড় করে সে তার সঙ্গীকে বললো। তারা দরজা খুলে অর্ধ হাসিমুখ-অর্ধপ্রতিবাদী স্যার মোহনের পানে তাকালো।

'এটি রিজার্ভ করা কম্পার্টমেন্ট।' বিল চিৎকার করে বললো।

'জানতা – রিজার্ভড্। আর্মি – ফৌজ,' জিম তার খাকি শার্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিস্ময়সূচক ধ্বনি তুললো।

'একদম যাও – গেট আউট!

'আই সে, আই সে, সিওরলি,' স্যার মোহন তার অক্সফোর্ডের উচ্চারণে প্রতিবাদ করলেন। সৈনিক দু'জন থামলো। উচ্চারণ তো প্রায় ইংলিশম্যানদের মতোই, কিন্তু তারা কানে যা শুনেছে তা বিশ্বাস করার চাইতেও বেশি কিছু জানে। ইঞ্জিনের হুইসেল বেজে উঠলো এবং গার্ড তার সবুজ ফ্ল্যাগ নাড়লো।

তারা স্যার মোহনের সুটকেস তুলে প্ল্যাটফর্মে ছুড়ে মারলো। এরপর একে একে ছুড়ে দিল তার থার্মোফ্লাস্ক, ব্রিফকেস, বিছানা এবং 'দি টাইমস'। স্যার মোহন রাগে নীল হয়ে গেলেন।

'অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব,' তিনি চিৎকার করলেন। তার কণ্ঠ রাগে গরগর করছে। 'আমি তোমাদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করবো। গার্ড, গার্ড! '

বিল এবং জিম আবার থামলো। লোকটির কথা ইংলিশের মতোই শোনাচ্ছে। কিন্তু এ ধরনের উচ্চারণ তাদের কাছে অভিজাতের ইংরেজী।

'তোমার লাল মুখ সামলাও!' জিম স্যার মোহনের মুখের উপর জোরে চড় কষালো।

ইঞ্জিন আরেকবার সংক্ষিপ্ত হুইসেল বাজালো এবং ট্রেন চলতে শুরু করলো। সৈনিকদ্বয় স্যার মোহনের দু'হাত আলগে ধরে ট্রেনের বাইরে ছুঁড়ে দিল। তিনি পিছনের দিকে তার নিক্ষিপ্ত বিছানার উপর পতিত হয়ে সুটকেসের উপর গড়িয়ে পড়লেন।

সৈনিক দু'জন একসাথে উচ্চারণ করলো, 'টুডলি-উ! '

স্যার মোহনের পা মাটির সাথে যুক্ত হয়ে গেছে এবং তিনি বাকশূন্য হয়ে পড়েছেন। দ্রুততার সাথে গতি তুলে ধাবমান ট্রেনের আলোকিত জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ট্রেনের লেজের দিকে একটি লাল বাতি জ্বলে আছে এবং গার্ড তার ভ্যানের দরজা দাঁড়িয়ে আছেন ফ্ল্যাগ হাতে।

ইন্টার ক্লাস মহিলা কম্পার্টমেন্টে লছমি। ফর্সা এবং মোটা, যার নাকে একটি হীরকের নাকফুলে স্টেশনের অপসৃয়মান আলো পড়ে জ্বল জ্বল করছে। পানের পিকে তার মুখ ভর্তি। ট্রেন স্টেশন ত্যাগ করলেই তিনি পিক ফেলবেন বলে মুখেই জমিয়ে রেখেছেন। প্ল্যাটফর্মের আলোকিত অংশ অতিক্রম করার সাথে সাথে লেডি মোহনলাল পিক ফেললেন এবং তা তীরের মতো বিচ্ছুরিত হলো।

মার্থা স্ট্যাক

'আমি মার্থা বলছি – মার্থা স্ট্যাক। তুমি কি আমাকে স্মরণ করতে পারছো ? ত্রিশ বছর আগে আমরা প্যারিসে একসাথে ছিলাম।' কণ্ঠে যেন ননীমাখা; কোন ভুল নেই কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান।

'মার্থা! তুমি!' বিস্মিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ব্যানার্জি। 'তোমাকে অবশ্যই মনে আছে আমার। পৃথিবীতে এতো জায়গা থাকতে তুমি দিল্লিতে কি করছো ? আমাকে কেন আগে জানাওনি যে তুমি আসছো ? '

'প্লেন নিউইয়র্ক ছাড়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি নিজেই জানতাম না। এখানে আমি অশোক হোটেলে উঠেছি। তোমাকে আবার দেখার জন্যে মরে যাচ্ছি। '

একটু ধরো মার্থা।' তিনি হাতের তালু রিসিভারে রেখে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলে আবার শুরু করলেন। 'রাতে আমার এখানে খাবে, আর আমার পরিবারের সাথে তোমার পরিচয়ও হয়ে যাবে। '

'চমৎকার! আমার খুব ভালো লাগবে। আমি জানতাম না যে, তোমার পরিবার আছে।'

'আমার স্ত্রী এবং বড় বড় ছেলেমেয়ে। ছেলে বিশ বছরের, মেয়ের বয়স পনের। দীর্ঘদিন কেটে গেছে – ত্রিশটি বছর। তোমার খবর কি ?'

'না, কোন পরিবার নেই। হবেও না আর। দু'জন স্বামীকে পেরিয়ে এসেছি। এখন একেবারে একা।' সে হাসলো। 'বেশ আছি।'

'সন্ধ্যা সাতটায় তোমাকে ফোন করবো। আশা করি তুমি আমাকে চিনতে পারবে। আমার চুলে পাক ধরেছে এবং খানিকটা মোটা হয়েছি।'

'তুমি কিচ্ছু ভেবো না, প্রিয়। আমাদের সবার বয়স বেড়েছে এবং আমরা মুটিয়ে গেছি।' সে উত্তর দিল। 'সাতটার দিকে দেখা হবে। নমস্তে। আমি কিন্তু এটা ভুলিনি।'

ব্যানার্জি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। তাকে খানিকটা ক্লান্ত, বিচলিত মনে হলো। তার স্ত্রী তাকে সে অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন। 'কে পুরনো গার্ল ফ্রেন্ড বুঝি ?' হেসে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

'না, না, গার্ল ফেন্ড হবে কেন। একজন মহিলা, যার সাথে ত্রিশ বছর আগে সরবনে সাক্ষাত হয়েছিল।'

'তুমি কিন্তু প্রথমে আমাকে একথা বলোনি! তোমার এলবামের ছবির মেয়েটিই তো। নিশ্চয়ই চোখ ধাঁধানো।'

'দেখতে খুব খারাপ নয়; কিন্তু নিগ্রো। মোটা ঠোঁট, কোকড়ানো চুল-এধরনের আর কি। ক্লাসে কালো বলতে আমরা দু'জনই ছিলাম। সেজন্যে আমরা উভয়ে খানিকটা একঘরে অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম বলা চলে।'

তিনি উপলব্ধি করলেন তার নিজের কণ্ঠ নিজের কাছে সত্য শোনাচ্ছে না। স্ত্রীর চোখের দিকে তাকালেন তিনি। 'ওকে অশোক থেকে তুলে আনতে হবে' বলে তিনি পড়ার ঘরে চলে গেলেন।

কেমন বেখাপ্পা ব্যাপার, তিনি নিজেকে বললেন। ত্রিশ বছর আগে মার্থার সাথে সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে তিনি বন্ধুদের মধ্যে একটা ভাব জাহির করতে চেষ্টা করেছেন। তার এলবামে মার্থার ফটো রাখা ছিল। বিশাল খড়ের হ্যাট পরা আকর্ষণীয় কালো মেয়েটির ছবিতে 'ভালোবাসাসহ, মার্থা' নিশ্চয়ই ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল। 'কে এই মার্থা ? ' তার বন্ধুরা এলবামের পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে জানতে চেয়েছে। 'কোন প্রশ্ন করো না, তোমরা আমার কাছ থেকে কোন মিথ্যা শুনবে না।' তিনি হেসে বলতেন। কিন্তু এখন তাকে ভান করতে হবে যে, তার সাথে চেনাজানার অতিরিক্ত সম্পর্ক ছিল। যা বিয়ের ফলে ঘটে থাকে; সবচেয়ে নিষ্পাপ সম্পর্কের ব্যাপারেও তাদেরকে মিথ্যা বলতে হয়।

নিষ্পাপ সম্পর্ক ? হ্যা, প্রায় ওরকমই। তার মন চলে যায় সরবোনে ছুটির সময়ে অনুষ্ঠিত সাহিত্যের ক্লাসগুলোতে। ক্লাসে জনা ত্রিশেক ছাত্রছাত্রী ছিল – অধিকাংশই আমেরিকান এবং গুটিকয়েক ওলন্দাজ ও স্ক্যান্ডেনেভীয়। ক্লাসে তিনি এবং মার্থাই শুধু শেতাঙ্গ বহির্ভূত – কালো।

প্রথম দিন থেকেই মার্থা সকলের আকর্ষণের পাত্রীতে পরিণত হয়েছিল। অন্য ছাত্রছাত্রীদের থেকে দূরে বসতো সে। অধিকাংশ ছাত্রের চাইতে সে দীর্ঘ, কৃষ্ণাঙ্গ এবং ব্যতিক্রমী ধরণের আকর্ষণীয়। দ্বিতীয় দিনে ছাত্রদের কয়েকজন নিজেরা যেচে তার সাথে পরিচিত হলো এবং তার পাশে বসলো। তৃতীয় দিনে সে নিজেই ব্যানার্জির কাছে এসে বসলো। "তোমার পাশে বসলে কি তুমি মনে কিছু করবে? আমি মার্থা স্ট্যাক, একজন আমেরিকান। সে তার হাত এগিয়ে দিয়ে বলল। 'আমার নাম ব্যানার্জি ,' তিনি বসা অবস্থা থেকে একটু দাঁড়িয়ে হাত মিলিয়ে বললেন। 'আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি।' এরপর থেকে ক্লাসে তারা পাশাপাশি বসতো।

ব্যানার্জি সাধারণতঃ ক্লাসে আগে পৌছেন। তিনি তার নোটবুক তার পাশের আসনে রেখে দেন এটা বুঝাতে আসনটিতে কেউ আছে। তিনি মার্থার জন্যে প্রতীক্ষা করেন। ছাত্রদের ভিড়ের উপর দিয়ে মার্থার কোকড়া চুল সবার দৃষ্টিতে পড়ে। সে আস্তে হাঁটে, তার নিতম্ব হাঁটার তালে তালে দোলে। সে ব্যানার্জির পাশের সিটে এসে বসে। 'আজ সকালে আমরা কেমন আছি? ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে দেখলে প্রতিবার তুমি উঠে দাঁড়িও না। ' তার শরীরে ছিটানো জেসমিনের সুগন্ধ ভেসে আসে। ওর বাবা মা কেন

ওর নাম 'ইয়াসমিন রাখলো না ? এ ধরণের একটি সুন্দর নামই ওর ক্ষেত্রে মার্থার চাইতে উপযুক্ত হতো। ক্লাস চলাকালে ব্যানার্জির চোখ তার পড়শিনীর উপর ঘুরাফিরা করতো – তার মোটা, শক্তিশালী কব্জিতে পরা ব্রেসলেটে সোনালী মুদ্রাগুলোর শব্দ উঠতো তার লিখার সময়ে। তার ঘন বাদামী হাত, তার স্তনের উপর চোখ পড়তো। স্তনযুগল তার অস্থিময় কাঠামোর তুলনার সুবিশাল এবং কাঁচা আমের মতো টানটান। সে বাইরে গেলে ব্যানার্জি তার আকর্ষণীয় ফিগার এবং নিতম্বের দোলনের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

ক্লাসের অন্য ছেলেগুলো মার্থার ব্যাপারে ব্যানার্জিকে খোঁচা দিয়ে কথা বলার পূর্ব পর্যন্ত তার বিমুগ্ধতা পুরোপুরিই নৈর্ব্যক্তিক ছিল।

'তোমার জোর বরাত! একমাত্র তোমাকেই পছন্দ করে সে।' কিন্তু ব্যানার্জি মার্থার ব্যাপারে তাদের কাছে কোন মন্তব্য করে না। তার তুলনায় মার্থা অনেক দীর্ঘ। তার পোশাকগুলো চড়া রং এর। তিনি যদি তাকে বাইরে নিয়ে যান তাহলে লোকজন অবশ্যই মন্তব্য করবে। তাছাড়া নিজের দেশ থেকে এতো দূর ইউরোপে এসে নিজের চাইতেও কালো মহিলাকে শয্যায় নেয়ার ব্যাপারে কিছুটা নির্বুদ্ধিতা।

মার্থাই উদ্যোগ নিল। একদিন সকালে তারা একসাথে ক্লাস থেকে বের হওয়ার সময় মার্থা বললো, 'আমার সাথে কি কফি পান করতে যাবে?' কফি পান শেষে ওয়েটার বিল নিতে এলে ব্যানার্জি পকেটে হাত দিল। কিন্তু মার্থা কঠিন হাতে ব্যানার্জির হাত ধরলো।

'না, এটা হতে পারে না। আমি তোমাকে ডেকেছি, অতএব দামটা আমিই দেব। তুমি যখন আমাকে বাইরে নিয়ে যাবে, তখন তোমাকে দাম পরিশোধ করতে দেব।' তার কাছ থেকে ওয়েটার দাম নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মার্থা ব্যানার্জির হাত ধরে রইলো। ব্যানার্জি তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা অনুভব করলো। এরপর প্রতিদিন একসাথে তারা কফি পান করতো। একদিন পর পর মার্থা কফির দাম পরিশোধ করতে পীড়াপীড়ি করতো। কিন্তু এতে ব্যানার্জির পকেটে হাত ঢুকানোর অভ্যাস দূর হয়নি। অথবা মার্থারও তার হাত ধরে বলা বন্ধ হয়নি যে, 'না, না, এবার তো আমার পালা।'

দ্বিতীয় পদক্ষেপটাও নিল মার্থা। 'ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করে আমাকে মিস স্ট্যাক বলে ডেকো না। আমার নাম মার্থা। তোমাকে কি বলে ডাকবো?'

'আমার আসল নাম হিরেন। তবে বাড়িতে সবাই আমাকে গুল্লু বলে ডাকে।'

মার্থা উষ্ণভাবে তার হাতে চাপ দিল। 'তাহলে তুমি আমার কাছে গুল্লু।'

ব্যানার্জি তাকে বললো যে, তিনি মনে মনে তার একটি ভারতীয় নাম দিয়েছেন। মার্থা আবার তার হাতে চাপ দিয়ে বললো, 'বেশ মধুর নাম তো। ইয়াসমিন নাম আমার পছন্দ হয়েছে। পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই আমাকে সে নামে ডাকবে।' সে তার ঘনিষ্ঠ হলো। ব্যানার্জি তার কপালের উপর মার্থার নিঃশ্বাস অনুভব করলো এবং তার বন্ধুদের কাছে যেমন শুনেছিল, সে ধরনের নিগ্রো নিগ্রো গন্ধ নাকে লাগলো। ভালোই বোধ হলো তার – উষ্ণ এবং যৌনতাপূর্ণ। শ্বেতাঙ্গ রমণীদের টক-দুধ গন্ধের চাইতে উত্তম।

মার্থাকে কিভাবে পটাবে তার উপায় খুঁজে ব্যানার্জি বহু ঘন্টা দিবাস্বপ্নে বরবাদ করলেন। প্রতিবার মার্থা যখন তাকে সুযোগ দেয়, ব্যানার্জি নিজেকে গুটিয়ে নেন। এভাবে তাদের পড়াশুনার মেয়াদ শেষ হবার আর মাত্র দশদিনে এসে ঠেকলো।

মার্থা তাকে আরো একটা সুযোগ দিল। 'আমাদের শেষ উইকএন্ড!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বিস্ময় প্রকাশ করলো। 'হ্যা, সময় শেষ হয়ে এলো।' ব্যানার্জি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল। 'সময় কিভাবে উড়ে যায়! ' মার্থা যেন তার পদক্ষেপে দৃঢ়। 'চলো কোথাও যাই। হয়তো আমাদের আর কখনো দেখা হবে না।' সে বললো। ' শহরের বাইরে খোলামেলা কোথাও যাই। ' মার্থার পরামর্শ। সেই নদীর কোথাও, যেখানে আমরা স্নান করে সূর্যালোকে শুয়ে থাকতে পারবো।' আগস্টের সূর্যালোকপূর্ণ উত্তপ্ত দিন। তারা প্যারিস থেকে সকালের ট্রেন ধরলো। প্রায় খালি ট্রেন। দু'জন একটি যাত্রীশূন্য কম্পার্টমেন্টে মুখোমুখি বসেছে। মার্থা বেশকিছু আমেরিকান ম্যাগাজিন সাথে এনেছে। ব্যানার্জি সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত হলো এবং মার্থা উৎসাহের সাথে তার পাঠ, তার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের মন্তব্য, প্যারিস নগরী এবং তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যে কথাবার্তা বলছিল তার প্রতি সামান্য মনোযোগ দিল। তারা ঘনিষ্ঠ না হয়েই গন্তব্যে পৌছলো। সেই নদীর তীরে তাদের নির্ধারিত স্থানটি স্নানার্থীতে পূর্ণ।

মার্থা সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। সাঁতারের পোশাকে তার দেহাবয়ব সুন্দরভাবে দৃশ্যমান। চাবুক দিয়ে যেন তৈরী তার দেহ। তার দেহে যেন গ্রীক দেবীদের আকর্ষণ এবং ক্ষমতা।

একদল তরুণ তার দিকে রাবারের বল ছুঁড়ে মারলো। ডিসকাস নিক্ষেপ কারীর মতো সে বলটা লুফে নিয়ে পাল্টা ছুড়ে দিল তাদের দিকে। তরুণদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে তাদের কয়েক ফুট দূরে গিয়ে পড়লো বল। মার্থা সাঁতার কাটালো, ওয়াটার স্কিতে অংশ নিল এবং বালির উপর শুয়ে সূর্যকে নিবেদন করলো তার দেহ। ব্যানার্জি ক্যানভাসের চেয়ারে বসে আমেরিকান ম্যাগাজিনের পৃষ্টা উল্টাচ্ছিলেন।

অবকাশ যাপনকারীদের ভিড়ে প্যারিসমুখী ফিরতি ট্রেন গাদাগাদি অবস্থায় ছিল। তারা ভাগ্যবান যে পাশাপাশি বসতে পেরেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে যাত্রীরা ট্রেনের কারিডোরে গিয়ে দাঁড়ালো। কম্পার্টমেন্টে হাসির উচ্ছ্বাস এবং সিগারেটের ধোয়ায় পরিপূর্ণ। মার্থার হাত ব্যানার্জির হাঁটুর উপর এবং দু'জনের হাতের আঙ্গুল হাতকে শক্তভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে।

শহরতলীর স্টেশনগুলোতে অনেক যাত্রী নেমে গেল। গারে ডি'অরলি স্টেশনের আগে মার্যা ও ব্যানার্জি ছাড়া কম্পার্টমেন্টে আর কেউ রইলো না। দু'জন পরস্পর হাত ধরে আছে। ব্যানার্জি জানালা দিয়ে মগ্নভাবে প্রকৃতি, বাড়িঘর এবং রেললাইনের পাশ্ববর্তী দৃশ্যগুলো দেখছেন। মার্থা ব্যানার্জির হাত ছেড়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে কানের উপর আলাতোভাবে চুমু দিল। ব্যানার্জি হাতের ম্যাগাজিন নামিয়ে রাখলেন, যা এতোক্ষণ পড়ার ভান করছিলেন। তিনি মার্থার দিকে ফিরলেন। সে ব্যানার্জিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার পুরু ঠোট ব্যানার্জির ঠোটের উপর স্থাপন করলো। সে তার চোখ, গাল

ও কানে চুম্বন করলো। আবেগভরে ব্যানার্জির গলায় কামড় দিল, যার ফলে তার গলায় লিপস্টিকের রংযুক্ত দাঁতের চিহ্ন লেগে গেল। ব্যানার্জি শুধু আত্মসমর্পণ করার মতো নিজেকে মার্থার আবেগের কাছে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি মার্থার তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করছিলেন তার সারা মুখে, গলায় এবং তার দেহের কামনাপূর্ণ নিগ্নো গন্ধ আঁচ করছিলেন। ট্রেনের গতি মন্থর হলো। মার্থা ব্যানার্জিকে ছেড়ে দিল। হাতব্যাগ থেকে কয়েকটি টিস্যু পেপার বের করলো; 'এই নাও, প্রিয় গুল্লু, তোমার মুখটা মোছ। একেবারে এলোমেলো করে দিয়েছি।' ব্যানার্জি যখন তার ঠোক, থুতনি, চোখের পাতা মুছছিলেন, তখণ মার্থা তার ঠোটে নতুন করে লিপস্টিক লাগাচ্ছিল, গালে রোজের প্রলেপ দিচ্ছিল। ট্রেন গারে ডি'অরলি স্টেশনে থামলো।

স্টুডেন্টস কাফেতে গিয়ে তারা নাশতা করলো। মার্থা দু'হাত ছড়িয়ে হাই তুললো। 'আমি খুব ক্লান্ত! স্নান, সূর্যের আলোতে শুয়ে থাকাসহ সবকিছু মিলিয়ে আমি ক্লান্ত। ঘরে ফিরতে হবে। ফেরার পথে তুমি আমার ঘরে কিছু পান করে যেতে পারো।'

ব্যানার্জি জানাতেন যে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে। তিনি কি মার্থার সাথে পেরে উঠবেন ?

ছোট্ট রুমে একটি বিছানা, একটি আর্ম চেয়ার ও টেবিল। টেবিলের উপর সিলভার ফ্রেমে বাঁধানো মার্থার পরিবারের একটি ছবি; তার বাবা মা, দু'ভাই ও দু'বোন প্রত্যেকে বিশালদেহী এবং কালো কুচকুচে। ফ্লোরের উপর বিভিন্ন ধরনের আমেরিকান ম্যাগাজিনের স্তূপ। বিছানার উপর কাপড় চোপড় ছড়ানো।

মার্থা দু'টি গ্লাসে পানীয় ঢেলে একটি ব্যানার্জির হাতে দিল। 'গুল্লু, আমরা এখানে একা,' সে তার গ্লাস তুলে ধরলো এবং ব্যানর্জির ঠোটে চুমু দিল।

'এখানে আমরা আমাদের, মার্থা;' ব্যানার্জি উত্তর দিলেন এবং মার্থাকে আবার চুম্বন দেবার জন্যে নিজেকে সপে দিলেন।

মার্থা এক চুমুকে তার গ্লাসের পানীয় শেষ করে ব্যানার্জির কাঁধে দু'হাত রাখলো। 'গুল্লু, আমি তোমার অনুপস্থিতি দারুণ অনুভব করবো।' ব্যানার্জির চোখে চোখ রেখে সে বললো। 'আমিও তোমার শুন্যতা বোধ করবো।' ব্যানার্জি ঢোক গিলে উত্তর দিলেন।

তার চোখ মার্থার স্তনের উপর নিবন্ধ হলো। 'তুমি কি দেখছো অমন করে?' কাঁধ থেকে হাত না নামিয়েই সে ব্যানার্জিকে ভৎর্সনার সুরে বললো। ব্যানার্জি তোতলাতে তোতলাতে তার প্রথম সৌজন্য প্রকাশ করলো। 'তুমি জানো, কি দেখছি। তুমি আমাকে ভেনাসের ছবির কথা মনে করিয়ে দিয়েছো। কোন্‌টা বলছি, জানো? ইটালিয়ান চিত্রশিল্পীর আঁকা–সমুদ্র থেকে উঠে আসা ভেনাসের চিত্র।'

'ও, কোট্রিসেলির 'বার্থ অফ ভেনাস'? আমার প্রতি যে কারো চাইতে সবচেয়ে সুন্দর প্রশংসা। তাহলে তো আরেকবার পান করতে হয়।' সে আবার গ্লাস পূর্ণ করে ব্যানার্জির কপালে আস্তে চুমু দিল। এরপর মাথার নিচে দু'হাত রেখে বিছানায় ছড়িয়ে দিল নিজেকে। ব্যানার্জির চোখ মার্থার শরীরের উপর ঘুরাফিরা করছিল।

'আমি কি তোমার কাছে জানতে পারি যে, এখন তুমি ওভাবে কি দেখছো? কেউ ভাবতে পারে যে, আগে কখনো তুমি মেয়ে মানুষ দেখোনি।'

ব্যানার্জি তার গলা পরিস্কার করলেন। 'এরকম তো অবশ্যই দেখিনি।'

দু'জনই নিরব। মার্থা তার গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয় শেষ করলো। 'তুমি যদি প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমাকে স্পর্শ করবে না, তাহলে আমি তোমাকে দেখতে দেব। আমার ফিগার যথার্থই সুন্দর।'

আমি শপথ করছি।'

মার্থা উঠে সুইচ অফ করে বাতি নিভিয়ে দিল। ব্যানার্জি তার কাপড় খোলার এবং ইলাস্টিক টানার শব্দ শুনতে পেল। 'এখন তুমি সুইচ অন করতে পারো।'

ব্যানার্জি চেয়ার থেকে উঠলেন। রাস্তার বাতির আলো থেকে তার নগ্ন দেহ ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে এবং তাতে ব্যানার্জির চোখ আঠার মতো লেগে রইলো। তার কম্পিত হাত দেয়ালে সুইচ খুঁজছে। সুইচ পেয়ে তিনি তা টিপলেন। রুম আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হলো। মার্থার সুবিশাল স্তন এবং ঘোর কালো ও বড় আকৃতির বোটা দেখে তার সম্মোহিতের অবস্থা। বেশ কষ্ট করে তিনি তার দৃষ্টি নিচের দিকে নামালেন। তার কোকড়ানো যৌনকেশ এবং চওড়া পেশিবহুল উরু থেকে তিনি দৃষ্টিকে রক্ষা করতে পারলেন না।

'আমার কি তোমার পছন্দ হয়েছে?' সে তার দু'হাত মাথার উপর দিয়ে ব্যানার্জিকে আবদ্ধ করে ধীরে ধীরে ব্যালে নর্তকির মতো পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়ালো। 'এখন কেমন লাগছে?'

ব্যানার্জির মুখে যে লালা জমেছিল তা গিলে ফেললেন। 'চমৎকার'; বিড়বিড় করে তিনি বললেন। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। 'এসো, আমাকে চুমু দাও। মার্থা তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। ব্যানার্জি অনিশ্চিতভাবে তার দিকে এগিয়ে মার্থাকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করলো। সে তাকে শপথ করিয়েছিল যে, তিনি তাকে স্পর্শ করবেন না, আর এখন...। তিনি আবেগের সাথে তার স্তন, প্রশস্ত উদর ও নাভিতে চুম্বন করতে লাগলেন। মার্থা তার চুল আঁকড়ে মুখটা তার দিকে ফিরালো। 'ধৈর্য ধরো', সে নির্দেশ দিল। মার্থা তার পা দিয়ে ব্যানার্জির পা পেঁচিয়ে ক্ষুধার্তের মত তার মুখ নিজের মুখে নিয়ে নিল। ব্যানার্জির উত্তেজনা উথলে উঠলো এবং নিঃশেষ হওয়া থেকে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না তিনি। মার্থার আলিঙ্গনের মাঝে তিনি নিস্পন্দ হয়ে পড়লেন। তার নিঃশ্বাস ও দেহের গন্ধ ব্যানার্জির কাছে অস্বস্তিকর মনে হতে লাগলো।

'কি ব্যাপার, প্রিয়?' মার্থা একটু পিছিয়ে জানতে চাইলো।

'আমার জন্যে এটুকুই অনেক বেশি হয়ে গেছে। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।'

'ঠিক আছে, তুমি যদি যেতে চাও , যাও।' সে তার ড্রেসিং গাউন শরীরে পেঁচিয়ে একটি সিগারেট ধরালো। তার মুখের রেখায় বিরক্তির ছাপ।

'না, না, মার্থা তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।' তিনি প্রতিবাদ করলেন। 'এটাই উত্তম, তুমি যদি না চাও, –তুমি জানো।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

তারা নিরবে খানিকক্ষণ বসে রইলো। ব্যানার্জি মার্থার হাত ধরলেন। শীতল হাত এবং সাড়া নেই। সে সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুজে বললো, 'আমি ক্লান্ত, প্রিয়।' উঠে বসলো মার্থা। 'সুন্দর দিনের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।' নিস্পৃহভাবে ব্যানার্জির কপালে চুমু দিয়ে প্রায় ঠেলে তাকে রুম থেকে বের করে দিল। ব্যানার্জি তার পিছনে দরজা লাগানোর শব্দ শুনলেন।

তিনদিন পর ব্যানার্জি মার্থাকে গারে সেন্ট লাজারে স্টেশনে বিদায় জানালেন।

ত্রিশ বছর আগের ঘটনা ওসব।

বহু বছর পর্যন্ত রুমের মাঝে নগ্নভাবে মার্থার দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য ব্যানার্জির জন্যে যৌন উত্তেজক দাওয়াই হিসেবে কাজ করেছে। যদিও তিনি তাকে পরিতৃপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং প্রায়ই সে স্মৃতি তাকে বিবশ করে দেয়, তবুও স্ত্রীর চাহিদা মিটাতে মার্থার স্মৃতির সহযোগিতা কাজে লাগে এবং ব্যানার্জির অনিবার্য যৌন উত্তেজনার পুরস্কার সচরাচর মার্থা স্ট্যাক, তার স্ত্রী মনোরমা ব্যানার্জি নয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া এবং দৈনিক আট ঘন্টা ও সপ্তাহে ছ'দিন কাজ করার সময়সূচী তার জন্যে বিপর্যয়কর ছিল। কিন্তু এতোগুলো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কালো, বড়োসড়ো স্ফীত স্তনের বোটা ও কোকড়ানো যৌনকেশ শোভিত চকোলেট বর্ণের নগ্ন দেহের কল্পনাও এখন আর তাকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে না। তিনি স্মরণ করতে চেষ্টা করেন সর্বশেষ কবে তিনি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছেন– বছর না হলেও বেশ ক'মাস তো হবেই। যা ধকল গেছে কাজটা সম্পন্ন করতে।

'ঘাবড়ানোর কিছু নেই প্রিয়, আমরা সবাই বুড়িয়ে গেছি।' মার্থা তো তাই বলেছে। হোটেল অশোকার লাউঞ্জে কোন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে না দেখে ব্যানার্জি মার্থার রুমে ফোন করলেন। 'আমি মুহূর্তের মধ্যে নিচে আসছি। বাইরে থেকে এইমাত্র ফিরে এসেছি। ভেবেছিলাম ডিনারের জন্যে কাপড় পাল্টে নেব। বেশিক্ষণ লাগবে না,' সে উত্তর দিল।

তিনি এলিভেটরের উঠানামা লক্ষ্য করছিলেন। আমেরিকান টুরিস্টরা দল বেঁধে উঠছে, নামছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একজন মাত্র যাত্রী নিয়ে লিফট থামলো। আর কোন যাত্রী এলিভেটরে ধরেনি। পুরো এলিভেটর জুড়ে মার্থা স্ট্যাক; ছ'ফুট দীর্ঘ এবং ব্যানার্জির দেখা যে কোন মহিলার চাইতে মোটা। এলিভেটর থেকে নেমে মার্থা তার মোটা, মাংসল হাত এগিয়ে দিল। 'তুমি মুটিয়ে গেছো, প্রিয়' ব্যানার্জির সামান্য স্ফীত উদরের দিকে দেখিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলো মার্থা। ব্যানার্জি তার নিস্পন্দ হাত বাড়িয়ে দিলেন; 'মার্থা তুমি বদলে যাওনি, তাতো আমি বলতে পারিনা।'

হাঁসফাঁস করতে করতে সে রিসেপশন ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল। মার্থার দেহের এতো পরিবর্তন ব্যানার্জিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। তার নিতম্ব জমাট মাংসপিন্ডের বিশাল স্তুপ। তার কোমরও স্তন ও গুরু নিতম্বের সাথে পাল্লা দিয়ে স্ফীত হয়েছে। এমনকি তার যে গলা এতোটা সরু ছিল তাতেও বিস্তর মেদ জমেছে। তার একদা ক্রীড়াবিদের পা স্থূল হয়ে গেছে এক শ্রেণীর ইংরেজী চাকরানীদের মতো। সে দেখতে বিজ্ঞাপনের আন্ট জেমাইমার মতো।

কার্পেট বিছানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে মার্থা ব্যানার্জির হাত ধরলো। ব্যানার্জি বেলবয়দের চাপা হাসি লক্ষ্য করলেন। গেটে প্রহরী মুখ ফিরিয়ে নৈশপ্রহরীর সাথে কটু মন্তব্য বিনিময় করলো। মার্থার কণ্ঠস্বরও তার পোশাকের মতোই কর্কশ হয়ে গেছে। ব্যানার্জির ছোট্ট ফিয়াট গাড়ির সামনের সিটে বসে সে বললো, 'এটা নিশ্চয়ই কোন বেঢ়প আকৃতির আমেরিকানের জন্যে তৈরি হয়নি।'

বাড়িতে এসে ব্যানার্জি তার আশংকার চাইতে বেশি স্বচ্ছন্দ দেখতে পেলেন মার্থাকে। সে বারবার প্রশংসা উচ্চারণ করছিল, 'তুমি আর কোথায় বৃদ্ধ হয়েছো, কোত্থেকে তুমি এতো সুন্দরী স্ত্রী জোগাড় করলে?' –এতে সে সাদরে গৃহীত হলো। তার আনা উপহার সামগ্রী হস্তান্তর করলো; নিজের লিপস্টিক দিল ব্যানার্জির মেয়েকে, ছেলেকে দিল বলপেন এবং মিসেস ব্যানার্জির হাতে বাদবাকী জিনিসগুলো। ব্যানার্জির স্ত্রী সুবোধ মহিলা, তার স্বামী যদি কখনো এই কৃষ্ণাঙ্গিনীকে আকাংখাও করে থাকে, তিনি তা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে তার প্রতি আগ্রহ দেখালেন। এখন আর এই মহিলার মধ্যে দৈহিক আকর্ষণের কোন কিছু অবশেষ নেই। সন্ধ্যাটা ভালোভাবে অতিক্রান্ত হলো।

মার্থা তার ঘড়ির দিকে তাকালো, 'প্লেন ধরার জন্যে আমাকে সকালে উঠতে হবে। মনে হয়, আমার হোটেলে ফিরে যাওয়া উচিত। আমি কি একটি ট্যাক্সি ক্যাব পাব?'

'আমার স্বামী আপনাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে আসবে,' মিসেস ব্যানার্জি বললেন। 'আপনি আরো কিছু সময় থাকুন।' ব্যানার্জি জানেন, এটা যদি কোন আকর্ষণীয়া মহিলা হতো তাহলে স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার পাশে থাকতে আগ্রহ দেখাতো, অথবা ছেলে মেয়েদের কাউকে বলতো পিতার সাথে যেতে।

মার্থা মিসেস ব্যানার্জি ও তার ছেলেমেয়েদের চুমু দিয়ে বিদায় নিল এবং আবার কোনমতে ফিয়াটে উঠে বসলো। 'চমৎকার পরিবার তোমার' সে বললো। 'তোমার স্ত্রী খুব সুন্দরী। যৌবনে নিশ্চয়ই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল।'

'সে তার যৌবনকে আমার চাইতে ভালোভাবে রক্ষা করেছে।' ব্যানার্জি উত্তর দিলেন। 'কিছু মানুষ সেভাবেই গড়ে উঠে।'

ব্যানার্জি সাহস সঞ্চয় করে মার্থার হাত ধরে সিড়ি বেয়ে রিসেপশন ডেস্ক পর্যন্ত গেলেন। মার্থা তার ঘড়ির দিকে আবার দেখলো। 'তুমি যদি চটজলদি কিছু পান করতে পছন্দ করো। তাহলে আমি রুমেই তোমাকে নিতে পারি। কাল প্লেনে উঠে ঘুমাতে পারবো না বলে আজ রাতেই ঘুমটা পুষিয়ে দিতে হবে।'

'ঠিক আছে, পুরনো দিনের স্মৃতিতে পান করা যায়,' ব্যানার্জি উত্তর দিলেন এলিভেটরে উঠতে উঠতে। তার পরিবার মার্থাকে মহিলা হিসেবে নাকচ করে দেয়ায় তিনি অনুভব করছেন মার্থার কাছে নিজেকে সোপর্দ করা এখন তার উপরই নির্ভর করে।

মার্থা বাথরুম থেকে দু'টি গ্লাস এনে ওয়ার্ডরোব থেকে একটি স্কচের বোতল বের করলো। আলোর পাশে রাখলো বোতলটা। বোতলে অর্ধেক পানীয় আছে। 'এটা অবশ্যই শেষ করতে হবে। হুইস্কি সাথে করে ফিরিয়ে নেয়ার মানে হয় না। সোডা না পানি নেবে তুমি ?'

'আমার জন্যে সোডা, প্লিজ,' ব্যানার্জি তার গ্লাস নিতে উঠলেন। উভয়ে গ্লাস ছোঁয়ালো। ব্যানার্জি মার্থার ঠোটের উপর আলতো চুমু দিল।

'এর পরবর্তী ধাপ ছাড়া বেশ পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। ওসবের জন্যে অনেক মোটা হয়ে গেছি।' সে উদারভাবে হাসতে হাসতে বললো। লাল রং এর রবারের মতো দেখা গেল তার মাড়ি। 'ধন্যবাদ, প্রিয়। আমার ভ্রমণ এর ফলে অর্থবহ মনে হচ্ছে। আমি অবাক হয়ে ভাবছি যে, তুমি আর কখনো চুমু দেবে কিনা?'

সে আবার গ্লাস ভরে দিয়ে একটি চেয়ারে বসে ব্যানার্জিকে হাতের ইশারায় সোফায় বসতে বললো। 'বসো, বসে পান করো।' এর অর্থ ব্যানার্জিকে তার কাছ থেকে দূরে রাখা। ব্যানার্জি লক্ষ্য করলেন, মার্থার স্বর্ণের নেকলেসের সাথে যুক্ত একটি ক্রস তার স্তনের মাঝখানে ঝুলছে। সম্ভবতঃ সে এখন ধার্মিক হয়েছে –অথবা তার মতো; বৃদ্ধ এবং যৌন বিষয়ে নিস্পৃহ। ব্যানার্জি তার হুইস্কি পান করলেন। মার্থার মুখের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছেন না তিনি। অথবা তিনি এমন কিছু করতে চান না. যা তাকে হতাশ করতে পারে এবং মার্থাকেও দুঃখ দিতে পারে। তৃতীয় দফা নিজের গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে তিনি মার্থার চেয়ারের হাতলে এসে বসলেন। মার্থার কপালে হাত রাখলেন। তার ত্বক তেলতেলে। তিনি তার চুলের মাঝে আঙ্গুল চালাতে চেষ্টা করলেন। চুলগুলো জড়িয়ে যাওয়া তারের গুচ্ছের মতো। মার্থার দিকে তাকালেন তিনি। সে তার চোখ বন্ধ করে আছে এবং মনে হচ্ছে নিরুদ্বিগ্ন। ব্যানার্জি তার মুখ ফিরিয়ে ঠোটে চুমু দিলেন। অনুভূতিশূন্যভাবে সে বসে আছে মুখ না খুলে। ব্যানার্জি উপলব্ধি করলেন যে, তার অসহায় অঙ্গটি সকল আস্থা হারিয়েছে। চেয়ারের হাতল থেকে তিনি তার কোলের উপর পড়ে গেলেন এবং আরো আদরের সাথে তাকে চুমু দিতে লাগলেন।

প্যারিসে মার্থাকে নিয়ে তিনি যে কল্পনা করতেন, সহসা তার মধ্যে তা ফিরে এলো এবং সেই বিস্মৃত আবেগ তার অঙ্গকে উত্তপ্ত করে তুললো। দু'জনই চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়লো ফ্লোরের উপর। মার্থা চিৎ হয়ে শুয়েছে –যেন নির্জীব মাংসের স্তূপ। তার চোখ তখনো বন্ধ– যেন নিজের দেহ দেখলে সহ্য করতে পারবে না। ব্যানার্জির হাত মার্থার প্যান্টি খুঁজছে। মার্থা দুর্বলভাবে প্রতিবাদ করলো, 'তোমার স্ত্রী কি বলবে ?' ব্যানার্জি জানে, তিনি এবার নিজেকে হারতে দেবেন না।

বিন্দু

দালিপ সিং চারপায়ার উপর শুয়ে তারকাপূর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। গরম এবং বাতাসহীন প্রকৃতি। এক টুকরা কাপড় তার নগ্নতা ঢেকে রেখেছে। এরপরও তার শরীরের সকল অংশ থেকে ফোটায় ফোটায় ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। মাটির প্রাচীর থেকে উত্তাপ উঠছে, যা সারাদিন সূর্যের তাপে ঝলসে ছিল। ঘরের ছাদে সে পানি ছিটিয়েছে, কিন্তু তাতে উত্তাপ কমার পরিবর্তে শুধু মাটি ও গোবরের গন্ধ ছড়িয়েছে। পেটে যতোটা পানি ধরে ততোটা সে পান করেছে। তবু তার গলা জ্বলছে। এসবের উপর আছে মশা এবং তাদের একঘেঁয়ে গুনগুন শব্দ। কিছু মশা তার কানের এতো কাছে এলো যে, দু'হাতের তালু ও আঙ্গুলের ফাঁকে ধরে পিষে ফেললো সে। দু'একটি মশা তার কানের মাঝে ঢুকে গেলে সেগুলো তর্জনী দিয়ে ধরে তৈলাক্ত দেয়ালে পিষে মারলো। কিছু মশা তার দাড়িতে ঢুকে পড়ায় তাদের গুনাগুনানি বন্ধ হলো। আবার কিছু মশা তার রক্ত শুষে নিতে সক্ষম হওয়ায় তাকে চুলকাতে হচ্ছিল। মশার উদ্দেশ্যে অভিশাপও বর্ষণ করছিলো সে।

চাচার ঘর থেকে তার ঘরকে পৃথক করেছে যে গলি, দালিপ সিং সে গলির উপরিভাগ দিয়ে দালিপ সিং ছাদের উপর এক সারি চারপায়া দেখতে পেল। এক প্রান্তে শুয়েছেন তার চাচা বান্তা সিং। ক্রুশবিদ্ধের মতো হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন তিনি। তার নাক ডাকার তালে তালে পেট উঠানামা করছে। বিকেলে তিনি ভাং সেবন করেন এবং রাতে মরার মতো ঘুমান। সারির বিপরীত প্রান্তে বেশ ক'জন মহিলা বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে নিচু গলায় গল্প করছিল।

দালিপ সিং জেগে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে। তার জন্যে কোন ঘুম নেই, শান্তি নেই। আরেক ছাদে ঘুমিয়ে আছে তার চাচা, তার পিতার ভাই ও খুনী। তার বাড়ির মহিলারা গভীর রাত পর্যন্ত বসে গল্পগুজব করার সময় পায়; আর তার মা ছাই দিয়ে হাঁড়িপাতিল মাজে এবং জ্বালানির প্রয়োজনে গোবর জড়ো করে। বান্তা সিং এর গরুমহিষ দেখার জন্যে এবং জমি চাষের জন্যে চাকর আছে। সেজন্যে তিনি ভাং খেয়ে ঘুমান। তার কালো চোখ বিশিষ্ট মেয়ে কোন কাজকর্ম না করলেও জাপানি সিল্কের জামাকাপড় দেখিয়ে বেড়ায়। কিন্তু দালিপ সিংকে শুধু কাজ আর কাজ করতে হয়।

কীকর গাছের ডালপালা আন্দোলিত হলো। মৃদু শীতল বাতাস বয়ে গেল ছাদের উপর দিয়ে। এতে মশার পাল বিতাড়িত হলো এবং শরীরের ঘাম শুকিয়ে দিল। দালিপ

সিং এর শরীর জুড়ালো। ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। বান্তা সিং এর ছাদে মহিলারা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করা বন্ধ করলো। বিন্দু তার চারপায়ার পাশে দাঁড়ালো এবং মাথা পিছনের দিকে কাঁত করে শীতল, নির্মল বাতাস টেনে তার ফুসফুস পূর্ণ করলো। দালিপ তার পায়চারি, মাথা নাড়ানো লক্ষ্য করছিল। সে দেখতে পাচ্ছে, গ্রামের লোকজন ছাদের উপর এবং উঠানে ঘুমাচ্ছে। কেউ নড়াচড়া করছে না। বিন্দু আবার নিজের চারপায়ার পাশে দাঁড়ালো। সে তার কামিজ তুলে দু'হাতে মুখের সামনে মেলে ধরলো। তাতে তার কোমর থেকে গলা পর্যন্ত অনাবৃত হয়ে গেল। শীতল বাতাস তার চ্যাপ্টা উদর এবং তারুণ্যে ভরপুর স্তনের উপর দিয়ে ছুঁয়ে গেল। চারপায়ার উপর শরীর এলিয়ে বালিশের মাঝে মুখ গুঁজে হারিয়ে গেল বিন্দু।

দালিপ সিং জেগে ছিল এবং তার হৃদপিণ্ড প্রচণ্ডভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল। বান্তা সিং এর জঘন্য চেহারা ও শরীর তার মন থেকে সরে গেল। চোখ বন্ধ করে সে তারকার আলোতে দেখা বিন্দুকে পুনরায় বাস্তবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলো। সে তাকে আকাংখা করলো এবং কল্পনায় তাকে অধিকার করে নিল। তার স্বপ্নে বিন্দু সবসময় কাংখিত – এমনকি তার আরাধ্য। দালিপ তার অবস্থান থেকে সরে আসতে পারে। নির্লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বান্তা সিং– দালিপ থুথু ফেললো। তার চোখ বন্ধ হলেও পৃথক এক বিশ্বে উন্মুক্ত হয়ে রইলো। যেখানে বিন্দু থাকে এবং ভালোবাসে, নগ্ন, লাজহীন এবং সুন্দরী।

কয়েক ঘণ্টা পর দালিপের মা এসে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকালেন। প্রকৃতি যখন শীতল থাকে তখনই জমিতে হাল দেয়ার সময়। আকাশ কালো এবং তারাগুলো উজ্জ্বল। বালিশের নিচে ভাঁজ করে রাখা শার্ট নিয়ে সে পরলো। সংলগ্ন ছাদের দিকে তাকালো সে। বিন্দু ঘুমিয়ে আছে।

দালিপ সিং বলদের কাঁধে জোয়াল জুড়ে ক্ষেতের উদ্দেশ্যে চলে গেল। অন্ধকার, জনশূন্য পথ দিয়ে তারকার আলো পূর্ণ ক্ষেতে গেল সে। সে ক্লান্ত এবং বিন্দুর অবয়ব তাকে বিভ্রান্ত করছে।

পূর্ব দিগন্ত ধূসর বর্ণ ধারণ করলো। আমবাগান থেকে কোকিলের তীক্ষ্ণ চিৎকার ক্রমে পাখির সমবেত কলরবের সূচনা করে দিল। কীকর গাছে কাকগুলো আস্তে ডাকতে শুরু করেছে।

দালিপ সিং চাষ করলেও তার মন তাতে নিবিষ্ট ছিল না। সে শুধু লাঙ্গলটা ধরে আছে এবং ধীরে ধীরে গরুর পিছনে হাঁটছে। লাঙ্গলের ফলা জমিতে সোজা বা গভীরভাবে বসছে না। সকালের আলো তার মাঝে লজ্জার অনুভূতি এনে দিল। সে নিজেকে চাঙ্গা করে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে দিবাস্বপ্ন ঝেড়ে ফেলতে চাইলো। লাঙ্গল জমিতে ঠেসে ধরলো সে, যাতে ফলা জমির গভীর পর্যন্ত চাষ করে এবং বলদের পশ্চাদভাগে জোরে পাচন দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। জন্তু দু'টো ঝাঁকুনি দিয়ে তাদের গতি দ্রুত করলো, নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে লেজ এদিক ওদিক করতে লাগলো প্রবলভাবে। লাঙ্গলে ফলা জমি চিড়তে শুরু করায় মাটি বড় বড় ঢেলার আকারে দালিপের পায়ের দু'পাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বর্বর সংকল্পে দালিপ লাঙ্গল ঠেসে

ধরে লক্ষ্য করছে যে, ইস্পাতের ফলা উর্বর ধূসর মাটি খুঁড়ে তার পথ করে নিচ্ছে।

জ্বলজ্বলে সূর্য উত্তাপ ছড়িয়ে উপরে উঠে এসেছে। দালিপ হাল ছেড়ে বলদ দু'টিকে পিপল গাছের নিচে কূয়ার কাছে এনে জোঁয়াল থেকে খুলে দিল। কয়েক বালতি পানি তুললো। সে নিজে স্নান করলো এবং বলদের উপরও পানি ঢাললো। বাড়ি ফেরার সময় সারাটা পথ বলদের শরীর থেকে পানির ফোটা পড়ছিল।

তার মা অপেক্ষা করছিলেন তার জন্যে। সদ্য সেঁকা রুটি ও সব্জি আনলেন তিনি। পিতলের বড় গ্লাস ভর্তি দধিও আনলেন। দালিপ গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো। তার মা পাশে বসে পাখা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিলেন। রুটি, সব্জি শেষ করে সে দধি পান করলো। এরপর চারপায়ার উপর শুয়ে সে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লো। তার মা তখনো পাশে বসে যত্ন করে বাতাস করছিলেন।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটানা ঘুমালো দালিপ সিং। সন্ধ্যায় ঘুম থেকে উঠে আবার সে ক্ষেতে গেল পানির নালাগুলো পরিষ্কার করে দিতে। নালার পাশ দিয়ে হাঁটলো সে। নালাটি তার জমিকে চাচার জমি থেকে পৃথক করেছে। বান্তা সিং এর জমিতে সেচ দিচ্ছে তার বর্গাদাররা। ভাইকে খুন করার পর থেকে বান্তা সিং কখনো সন্ধ্যার দিকে তার ক্ষেতে আসে না।

দালিপ সিং পানির নালা নিজেই পরিষ্কার করে খালের পাশে এলো হাত পা ধুঁতে। বহমান পানিতে পা ডুবিয়ে সে খালের পাড়ে বসে তার মায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

পশ্চিম দিগন্তে বিস্তীর্ণ জমির সরল রেখা বরাবর সূর্য অস্তমিত হলো। সন্ধ্যা তারা বাঁকা চাঁদের খুব কাছে জ্বলজ্বল করছে। গ্রামের কূয়ার কাছে মহিলাদের চিৎকার, খেলারত ছেলেমেয়েদের শোরগোল –সব মিশে গেছে কুকুরের ঘেউঘেউ এবং চড় ই পাখির কিচিরমিচিরের মধ্যে। কিছু মহিলা মাঠের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ঝোপের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্যে। একটু পর পুনরায় আবির্ভূত হয়ে পানির নালার পাশে সারিবদ্ধভাবে বসে হাত পা ধৌত করছে।

দালিপ সিং এর মা এলেন খালের টাইমকিপারের দেয়া কাঠের একটি টোকেন হাতে, যার অর্থ দালিপের ক্ষেতে পানি দেয়া শুরু হয়েছে। এরপর তিনি ফিরে গেলেন গরুমহিষের দেখাশুনা করতে। বান্তা সিং এর বর্গাদার এরই মধ্যে চলে গেছে। দালিপ সিং বান্তা সিং এর ক্ষেতে পানি যাওয়ার নালামুখ বন্ধ করে দিয়ে আল কেটে দিল যাতে তার ক্ষেতে পানির পুরোটাই প্রবেশ করে। এরপর সে খালের পাড়ের শীতল ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে হালচষা ক্ষেতে মাটির ফাঁকে ফাঁকে পানির পথ করে নেয়া লক্ষ্য করতে লাগলো। নতুন চাঁদের আলোতে পানির রূপালি রেখা তিরতির করে এগিয়ে যাচ্ছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে সে গ্রাম থেকে ভেসে আসা কলরব শুনছিল। সে শুনতে পাচ্ছে, বান্তা সিং এর ক্ষেতের কোন অংশে মহিলারা কথা বলছে। এরপর বিশ্ব চন্দ্রালোকের নিরবতায় হারিয়ে গেল।

কাছে খালের পানিতে কারো হাতের শব্দ দালিপ সিং এর চিন্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করলো। ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল খালের অপর পাড়ে এক মহিলা পাছায় ভর করে বসে নিজেকে ধৌত করছে। এক হাতে পানির ঝাপটা দিচ্ছে দুই উরুর সংযোগ স্থলে। ক্ষেত থেকে এক খাবলা মাটি তুলে দু'হাতে মেখে সে হাত ধুয়ে নিল পানিতে। সে উঠে দাঁড়ালে ঢোলা সালোয়ার পড়ে গেল পায়ের গোড়ালিতে। কামিজের সামনের অংশ নিয়ে একটু ঝুঁকে মুখ মুছলো মহিলা।

মহিলাটি আর কেউ নয়, বিন্দু। দালিপ সিং এর মধ্যে পাগলের মতো আকাংখার সৃষ্টি হলো। লাফিয়ে খাল পার হয়ে বিন্দুকে লক্ষ্য করে ছুটলো। কামিজের সামনের অংশ দিয়ে সে মুখ মুছছে। পিছন দিকে ঘুরে দেখার আগেই দালিপ সিং তার হাত বিন্দুর বগলের তলা দিয়ে স্তনের উপর স্থাপন করে আবদ্ধ করে ফেলেছে। সে মুখ ঘুরাতেই দালিপ উন্মত্ত আবেগে মুখের উপর চুম্বন করতে লাগলো এবং তার আর্ত চিৎকার বন্ধ করে নিজের মুখ তার মুখে আঠার মতো লাগিয়ে রাখলো। তাকে নরম ঘাসের উপর ফেলে দিল সে। বুনো বিড়ালের মতো লড়তে লাগলো বিন্দু। দু'হাত দিয়ে দালিপের দাড়ি আঁকড়ে তার গালে জোরে নখের আঁচড় বসালো। রক্ত বের না হওয়া পর্যন্ত নাক কামড়ে রাখলো। কিন্তু খুব শিগগির ক্লান্ত হয়ে পড়লো সে। হাল ছেড়ে দিয়ে স্থির হলো। তার বন্ধ চোখের দু'পাশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং চোখে লাগানো কাজলও ধুয়ে যাচ্ছে তাতে। ফ্যাকাসে চন্দ্রালোকে তাকে সুন্দর লাগছে। অনুতাপে ভরে গেল দালিপের মন। তাকে আঘাত দেয়ার কথা কখনো ভাবেনি সে। তার বিশাল খসখসে হাত দিয়ে বিন্দুর কপালে আদর করলো, চুলের মাঝে আঙ্গুল চালনা করলো। সে ঝুঁকে বিন্দুর নাকে তার নাক ঘষলো। বিন্দু তার বড় বড় কালো চোখ মেলে তার দিকে তাকালো শূন্য দৃষ্টিতে। তার চোখে কোন ঘৃণা নেই, ভালোবাসাও নেই। শুধু শূন্য দৃষ্টি। দালিপ সিং তার চোখে ও নাকে আলতো করে চুমু দিল। বিন্দু শুধু ভাবলেশহীনভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং আরো বেশি অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তার চোখ দিয়ে।

বিন্দুর সঙ্গীরা তাকে ডাকছে। সে উত্তর দিল। তাদের একজন কাছে এসে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করলো। দালিপ তড়িঘড়ি উঠে লাফ দিয়ে খাল পেরিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

•

সিংপুর গ্রামের সকল পুরুষ রাজা বনাম দালিপ সিং এর মামলার শুনাণীতে হাজির হয়েছে। আদালত কক্ষ, বারান্দা এবং আদালত চত্তর গ্রামবাসীদের ভিড়ে পূর্ণ। বারান্দার এক প্রান্তে হ্যান্ড কাফ পরা দালিপ সিং পুলিশের দু'জন সিপাই এর মাঝে বসা। তার মা মুখটা শালের প্রান্ত দিয়ে ঢেকে তাকে বাতাস করছেন। তিনি কাঁদছেন এবং শব্দ করে নাক ঝাড়ছেন। বারান্দার আরেক প্রান্তে বিন্দু, তার মা এবং আরো কয়েক মহিলা গোল হয়ে বসে কথাবার্তা বলছে। বিন্দুও কাঁদছে ও নাক ঝাড়ছে। মেয়েদের এই দলের পাশে লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বান্তা সিং ও তার সঙ্গীরা। বিরামহীনভাবে ফিসফিস করে কথা বলছে তারা। অন্যান্য গ্রামবাসী তাদের সময় কাটাচ্ছে ফেরিওয়ালাদের কাছে মিষ্টি কিনে অথবা ভ্রাম্যমান 'কান বিশেষজ্ঞদের' কাছে কান পরিষ্কার করিয়ে। অনেকে যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধির দাওয়াই বিক্রেতাকে ঘিরে ধরে তার লেকচার শুনছে এবং একে অন্যকে ঠেলা দিয়ে হাসাহাসি করছে।

বান্তা সিং একজন উকিলকে ঠিক করেছেন সরকারী উকিলকে সহায়তা করার জন্যে। উকিল তার সাক্ষীদের এক কোনায় জড়ো করে প্রতিপক্ষ উকিলের জেরার প্রেক্ষিতে কি বলতে হবে তা শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি আদালতের আর্দালি ও কেরানিকে ডেকে বান্তা সিং এর সাথে পরিচয় করিয়ে বান্তাকে বললেন তাদেরকে বখশিশ দিতে। সরকারী উকিলকে দেয়ার জন্যে তিনি তার মক্কেলের নিকট থেকে এক বান্ডিল নোট নিলেন। বিচারের যন্ত্রপাতিতে পুরোপুরি তেল মর্দন করা হয়েছে। দালিপ সিং এর কোন উকিল নেই, তার পক্ষে কোন সাক্ষীও নেই।

আর্দালি এজলাস কক্ষের দরজা খুলে রীতিমাফিক মামলার কথা ঘোষণা করলো। বান্তা সিং ও তার বন্ধুদের এজলাসে প্রবেশ করতে দিল। দালিপ সিংকে প্রহরা দিয়ে নিয়ে এলো পুলিশদ্বয়। কিন্তু আর্দালি তার মাকে প্রবেশ করতে দিল না। কারণ তিনি তাকে কোন বখশিশ দেননি। এজলাস শান্ত হলে কেরানি অভিযোগ পাঠ করার জন্যে এগিয়ে গেল।

দালিপ সিং নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করলো। ম্যাজিস্ট্রেট মি. কুমার সাব-ইন্সপেক্টরকে নির্দেশ দিলেন বিন্দুকে হাজির করার জন্যে। বিন্দু শাল দিয়ে মুখ ঢেকে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে সাক্ষীর জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। ইন্সপেক্টর দালিপের সঙ্গে তার পিতার শত্রুতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি রক্ত ও বীর্যের দাগ লাগা বিন্দুর কাপড় আদালতে পেশ করলেন।

বাদীপক্ষের আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। বিন্দু বয়ানের সাথে প্রদর্শিত আলামত অপরাধ প্রমাণের জন্য স্পষ্ট ও অকাট্য।

বন্দীকে বলা হলো যে, তার কোন জিজ্ঞাস্যা আছে কিনা। দালিপ সিং তার হ্যাণ্ডকাফ পরা দু'হাত যুক্ত করে বললো, 'হুজুর, আমি নির্দোষ'।

ম্যাজিস্ট্রেট কুমার ধৈর্য হারাচ্ছেন।

'তুমি কি মেয়েটির বয়ান শুনেছো? ওর কাছে যদি তোমার কোন প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি রায় ঘোষণা করবো।'

'মহামহিম হুজুর, আমার কোন উকিল নেই। আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে গ্রামে আমার কোন বন্ধু নেই। আমি খুব গরীব। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নির্দোষ।'

ম্যাজিস্ট্রেট রেগে গেলেন। কেরানির দিকে ফিরলেন তিনি। 'পাল্টা জেরা– শূন্য।' কিন্তু তোতলাতে তোতলাতে বললো দালিপ সিং, 'আমাকে কারাগারে পাঠানোর আগে, দয়া করে ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন যে, সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল কিনা। আমি ওর কাছে গিয়েছিলাম সে আমাকে চেয়েছিল বলে। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, হুজুর।'

ম্যাজিস্ট্রেট কেরানির দিকে আবার ফিরলেন।

'আসামী কর্তৃক জেরা ঃ তুমি কি স্বেচ্ছায় অভিযুক্তের কাছে গিয়েছিলে? উত্তর দাও...'

ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্ন বিন্দুর প্রতি ঃ 'বলো, তুমি কি অভিযুক্তের কাছে স্বেচ্ছায় গিয়েছিলে?'

বিন্দু নাক ঝাড়লো এবং কেঁদে ফেললো। ম্যাজিস্ট্রেট এবং এজলাসের সব লোক অধৈর্য হয়ে এবং অস্বস্তিকর নীরবতায় প্রতীক্ষা করছে তার উত্তরের।

'তুমি কি স্বেচ্ছায় গিয়েছিলে অথবা স্বেচ্ছায় যাওনি? উত্তর দাও। আমাকে আরো কাজ করতে হবে।' শালের অনেক ভাঁজের নিচ থেকে বিন্দু উত্তর দিল, 'জি হ্যাঁ।'

জীন মেমসাহেব

জন ডাইসন পর্বত শীর্ষে অবতরণ করে চারদিকের দৃশ্য অবলোকন করলেন। জঙ্গলের কেন্দ্রস্থলে লাল ইটে তৈরি রেস্টহাউজ। সব দিকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে পর্বত এবং বৃক্ষের প্রাচীর শাখা প্রশাখা বিস্তার করে রেখেছে মাকড়শার জালের মতো। এরই মাঝে একদিকে রাস্তা ঢালু বেয়ে উপত্যকার দিকে চলে গেছে। উপত্যকা বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

তার মালপত্র ইতোমধ্যে পৌঁছেছে এবং বারান্দায় স্তূপ হয়ে আছে। সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের কাছে কুলিরা বসে আছে, পালা করে হুক্কা টানছে। ওভারশিয়ার একটি লোহার চেয়ারে বসে তাদের সাথে কথা বলছে। হুক্কা পাঠিয়ে সার্ভেন্ট কোয়ার্টার থেকে বিদায় নেয়ার পর ওভারশিয়ার ডাইসনের সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন।

'সুন্দর বাগান' ডাইসন বললেন ওভারশিয়ারকে উদ্দেশ্য করে। 'কে এই বাগানের দেখাশুনা করে ?'

'আমাদের একজন বৃদ্ধ মালি আছে, সাহেব প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে লোকটি এখানে বাস করছে –এ রেস্টহাউজটি যদ্দিন ধরে তৈরি হয়েছে।

চামড়ায় ভাঁজ পরা শীর্ণ একটি লোক সামনে এসে হাত যুক্ত করে অবনত মস্তকে ডাইসনকে প্রণাম করলো। 'গরীবের মা বাপ, আমিই মালি। পনের বছর বয়স থেকে আমি মালির কাজ করছি। জীন মেমসাহেব আমাকে এখানে এনেছিলেন। এখন আমার বয়স ষাট বছর। জীন মেমসাহেব এখানেই মারা গেছেন। আমিও এখানে মরবো।'

'জীন মেমসাহেব? উনি কি কটন সাহেবের স্ত্রী ছিলেন?' ওভারশিয়ারের দিকে ফিরে ডাইসন প্রশ্ন করলেন।

'না, স্যার। তার সম্পর্কে কেউ খুব বেশি জানে না। তিনি একজন সমাজকর্মী ছিলেন, অথবা শিক্ষয়িত্রী, কিংবা মিশনারী বা কিছু একটা ছিলেন। তিনি এই বাংলো এবং বাচ্চাদের জন্য একটি স্কুল নির্মাণ করেন। এরপর হঠাৎ তিনি মারা যান এবং তার সম্পর্কে কেউই আর বলতে পারেনা। সরকার এই বাংলোটি নিয়ে ফরেস্ট অফিসারদের রেস্টহাউজে রূপান্তরিত করে।'

পালকি বহনকারী বেহারাদের উচ্চারিত কোরাসে তাদের আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হলো। পালকিতে এসেছেন মিসেস ডাইসন ও তার কন্যা জেনিফার।

বাড়িটির দিকে হাত উচিঁয়ে ডাইসন বললেন, 'ওল্ড মিশন স্কুল। জায়গাটি মন্দ নয়, কি বলো ?'

পরিবারটি নিরবে চারদিকের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করলো। অস্তমান সূর্য বাংলোকে আলোকিত করে তুলেছে। উদ্যান, ফুলের কেয়ারী, সেগুন বনকে সোনালি রং এ পরিবর্তিত করেছে। প্রকৃতি শান্তিপূর্ণ। দূরে উপত্যকায় বয়ে চলা খরস্রোতা ঝরণার পানির শব্দ সান্ধ্য স্তব্ধতাকে প্রবল করে তুলেছে।

কুলি, পালকির বেহারা দল এবং ওভারশিয়ার সূর্যাস্তের আগে উপত্যকায় তাদের গ্রামের উদ্দেশ্যে চলে গেল। ডাইসন পরিবার তাদের জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বেয়ারাররা হ্যারিকেন জ্বালাতে, ডিনারের টেবিল সাজাতে এবং বিছানায় মশারি টানানোর কাজ করছিল। মিসেস ডাইসন এবং জেনিফার রুমে রুমে গিয়ে তদারকি করছিল। ডাইসন বারান্দায় একটি বেতের বড় আর্ম চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে পাইপ ধরালেন এবং হুইস্কি দিতে বললেন। তিনি লক্ষ্য করছেন অস্তমান সূর্য বর্ষার মেঘকে সোনালি রং এ রূপান্তরিত করেছে, এরপর তা তামার মতো লালচে, কমলা, গোলাপি ও সাদা রং এবং সবশেষে ধূসর বর্ণ ধারণ করলো। গোধূলি যখন রাতের মাঝে ডুবে গেল, তখন গ্রীস্মমন্ডলীয় জঙ্গলে নেমে এলো স্তব্ধতা। পাখিরা নিরব হলো এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রকৃতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। এ অবস্থায় বনে ভিন্ন ধরনের শব্দ জীবন্ত হয়ে উঠলো। ব্যাং এর ডাক, শিয়াল ও হায়েনার ডাক। ডাইসন যখন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন, তখন জোনাকি পোকা লনে উড়ছিল, ঠিক যেখানে তিনি বসেছিলেন প্রায় সেখানেই। বেয়ারার এসে ডিনার প্রস্তুত বলে জানালো। ডাইনিং টেবিলে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। বাতির আধারে স্থাপিত একটি হ্যারিকেন হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে দীর্ঘ যুগ ও বর্ষণে রং চটে যাওয়া প্রাচীরে।

ডিনারের টেবিলে সামান্য কথাবার্তা হলো। বেয়ারার প্লেট ও খাবার নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছিল আর বাইরে যাচ্ছিল। বাসনপত্র ও কাটলারির শব্দ শুধু নীরবতা ভঙ্গ করছিল। জেনিফার অস্থিরভাবে ঘুরাফিরা করছিল। বেয়ারার যখন তাকে ডিনারের জন্যে আহবান করে তখন তার অনুসন্ধান বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সহসা সে তার ছুরি ও কাঁটাচামচ নামিয়ে রেখে কণ্ঠ উঁচু করে বলে উঠে –

'মা, দেখো, দেয়ালে একটি ছবি।'

মিসেস ডাইসন দেখার জন্যে পিছনের দিকে ফিরলেন। যেসব স্থানে ছাদ থেকে পানি চুঁইয়ে দেয়াল বেয়ে ফ্লোরে পড়েছে, সেসব স্থানে দেয়ালের রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। দেয়ালে বেশ কিছু প্যাটার্ণ, যা বাতির সলতের কম্পনের সাথে আকৃতি পরিবর্তন করছে।

'জেনিফার ,' মিসেস ডাইসন ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন,

'আমাকে ভয় দেখানো বন্ধ করে তুমি খাও।'

ডিনারের অবশিষ্ট সময় নিরবে কাটলো। যখন কফি পরিবেশিত হলো তখন জেনিফারকে তার বিছানায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। মিসেস ডাইসন পিছনে আরেকবার দেয়ালের দিকে ফিরলেন। সেখানে কোনকিছু নেই।

'জন, এ জায়গাটা আমার ভালো লাগছে না।'

ডাইসন ধীরে সুস্থে তার পাইপ ধরালেন। মিসেস ডাইসন আবার বললেন, 'জন, জায়গাটা ভালো লাগছে না আমার কাছে।'

'তুমি ক্লান্ত। তুমি বরং বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

মিসেস ডাইসন তার বিছানায় গেলেন। কিছুক্ষণ পর ডাইসন ও তার সাথে যোগ দিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করলেন।

মিসেস ডাইসন ঘুমাতে পারলেন না। মশারি স্ট্যান্ডের সাথে বালিশ ঠেকিয়ে তাতে হেলান দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। চাঁদশূন্য রাত হলেও আকাশ স্বচ্ছ এবং বাগানে তারকার মৃদু আলো পড়েছে। বাগানের পরই বন কালো প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাং ও পোকামাকড়ের শব্দ, কোন পাখির আকস্মিক তীক্ষ্ণ চিৎকার, হায়েনার হাসি, শিয়ালের ডাকে বন পরিপূর্ণ। মিসেস ডাইসনের কপাল ঘেমে উঠলো। দীর্ঘ সময় পর বনের উপর উঠে এলো বিবর্ণ এক চাঁদ এবং হালকা আলো ছড়িয়ে পড়লো বাগানে। শিশির ভেজা বাগান সাদাটে দেখাচ্ছে।

মন থেকে ভয়ের অনুভূতি ঝেড়ে ফেলার জন্যে মিসেস ডাইসন বাগানে পায়চারি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। খোলা পায়ের নিচে ঘাস শীতল। পা ফেলার জায়গায় ঘাসের শিশির দূর হয়ে রেখার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সেদিকে তাকিয়ে তিনি মাথা ঝাঁকালেন, যেন মাথা থেকে বাড়তি ওজন ঝেড়ে ফেললেন এবং গভীর শ্বাস নিলেন। নিজেকে সতেজ ক্লান্তিশূন্য মনে হচ্ছে তার। ভয়ের কিছু নেই, তাকে আতংকিত করার মতো কিছু নেই।

চন্দ্রালোকিত বাগানে মিসেস ডাইসন বেশ কয়েক মিনিট পায়চারি করলেন। মনটা চাঙ্গা হলো। তিনি শুতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বারান্দায় পৌছেই তিনি হঠাৎ করে থামলেন। তার কয়েক পা সামনেই বাগানে পদচিহ্ন লক্ষ্য করলেন। অদৃশ্য পায়ের ফেলে যাওয়া চিহ্ন জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে। মার্গারেট ডাইসনের মনে হলো, তার জ্বর এসেছে। তার হাঁটু দুর্বল হয়ে এলো এবং বারান্দায় পড়ে গেলেন তিনি।

তিনি যখন সুস্থ বোধ করলেন তখন প্রায় সকাল। পাখির গানে প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পুরোপুরি ক্লান্ত অবস্থায় মিসেস ডাইসন নিজেকে টেনে আনলেন শয্যায়। বেয়ারার যখন চা নিয়ে এলো তখন বারান্দায় সূর্যালোক পড়েছে। ডাইসন সাহেব নাশতা করে বাইরে বেরুতে প্রস্তুত। বাগানের এক পাশে ওভারশিয়ার ও কুলিরা তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সূর্যাস্তের কিছু আগে ডাইসন ফিরে এলেন। হুইস্কি ও সোডা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে পা ছড়িয়ে দিলেন, যাতে বেয়ারার তার বুট খুলে দেয়। কয়েক গ্লাস হুইস্কি পান করার পর তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। 'আজ ডিনারে কি খেতে পাবো ? মুরগী রান্না হয়েছে, এমন সুবাস পাচ্ছি। আমি খুব ক্ষুধার্ত – এখানকার বাতাস ক্ষুধার উদ্রেক করে।'

খাবার সময় পরিবারের কেউ কথা বললো না। ডাইসন খাবারটা বেশ উপভোগ করলেন। একটি শিয়াল বাগান পেরিয়ে এসে ডাইনিং রুমের প্রায় দরজা পর্যন্ত পৌছে ডেকে উঠলো। মিসেস ডাইসনের হাত থেকে কাঁটাচামচ পড়ে গেল। তার সাক্ষী কিছু বলার আগেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে ভয়ার্ত কন্ঠে বললেন, 'জন, জায়গাটা আমার মোটেও ভালো লাগছে না।'

'তোমার স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটি একটা শিয়াল। আমি কয়েকটা শিয়াল গুলি করে মারবো। তাহলে ওরা আর তোমাকে জ্বালাবে না। এ নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কাল রাতে কি তোমার ভালো ঘুম হয়েছিল?'

'হ্যা, তা হয়েছিল। তোমাকে ধন্যবাদ। '

'আমি তোমাকে বাগানে ঘুরাফিরা করতে দেখেছিলাম, মাম্মি,' জেনিফার বললো।

'তুমি তোমার পুডিং শেষ করে বিছানায় চলে যাও,' মিসেস ডাইসন মেয়েকে বললেন।

'কিন্তু মাম্মি, আমি তোমাকে দেখেছি – সাদা ড্রেসিং গাউন পরনে ছিল তোমার। আর তুমি মশারির ভিতরে উকি দিয়ে দেখেছো যে, আমি ঘুমিয়েছি কিনা। আমি ঘুমাইনি, চোখ বন্ধ করে ছিলাম, আমি তোমাকে দেখেছি।'

মিসেস ডাইসনের মুখটা ফ্যাকাসে মনে হলো।

'বাজে বকো না জেনিফার। তুমি তোমার বিছানায় যাও। আমার কোন সাদা ড্রেসিং গাউন নেই, তা তুমি জানো।' মিসেস ডাইসন উঠলেন এবং তার স্বামী তার সাথে যোগ দিলেন।

'গত রাতটা কি তোমার খুব গোলমেলে কেটেছে?'

'আমি ঘুমোতেই পারিনি। কিন্তু জন আমার তো কোন সাদা ড্রেসিং গাউন নেই। জেনিফারের মশারির দিয়ে আমি উঁকিও দেইনি।

'ওসব কথা বাদ দাও, ওগুলো বাজে কল্পনা। চলে এসো জেনিফার। পুডিং শেষ করে শুয়ে পড়ো। বন্দুক দিয়ে গুলি করে একটা শিয়াল মারবো। জেনিফার, ফার কোটের জন্যে তুমি কি শিয়ালের চামড়া পছন্দ করবে?' বিষয়টিকে হালকা করতে তিনি বললেন।

'না, আমি শিয়াল পছন্দ করি না।'

ডাইসন তার বন্দুক নিয়ে গুলি ভরে তার বিছানার কাছে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে রাখলেন। তিনি পাইপ ধরিয়ে শুয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত কথাবার্তা বললেন।

'যদি শিয়ালের ডাক শুনতে পাও, তাহলে আমাকে জাগিয়ে দিও,' ডাইসন তার স্ত্রীকে বললেন।

'ঠিক আছে, প্রিয়।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাইসন ঘুমিয়ে পড়লেন। জেনিফারও ঘুমিয়ে পড়েছে। মিসেস ডাইসন তার বিছানায় শুয়ে থাকলেও চোখ খোলা। মশারির ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাগানের দিকে এবং বনের গাছের প্রাচীরের দিকে।

হঠাৎ কুয়াশার আবছায়ার মধ্য থেকে দীর্ঘ সাদা ড্রেসিং গাউন পরা এক মহিলার অবয়ব দেখা গেল। তার চুল দু'টি বেণীতে বাঁধা, যা তার কাঁধের উপর পড়েছে। তার দেহের বিশেষ বৈশিষ্ট নির্ণয় সম্ভব না হলেও চোখে অমানবীয় উজ্জ্বলতা লক্ষ্যণীয়। মিসেস ডাইসনের শরীর আতংকে শীতল ও অসাড় হয়ে পড়লো। তিনি চিৎকার করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার মুখ দিয়ে গোঙানির মতো শব্দ বেরুলো শুধু। জন ডাইসন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন।

ছায়ামূর্তিটি বারান্দার দিকে আসতে শুরু করেছে মিসেস ডাইসনের উপর চোখ নিবদ্ধ করে। মূর্তিটি যখন বাগানের মাঝখানে পৌছেছে, ঠিক তখনই একটি শিয়াল আবির্ভূত হয়ে ছায়ামূর্তির মুখোমুখি দাঁড়ালো। শিয়ালটি মাথা উঁচু করে দীর্ঘ ডাক দেয়ার পর। অন্য শিয়ালগুলো সেই কোরাসে যোগ দিল।

মিসেস ডাইসন অনুভব করলেন যে, তার কণ্ঠ ও গোঙানি তীক্ষ্ণ আর্তনাদে পরিণত হয়েছে।

জন ডাইসন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলেন এবং বন্দুকের জন্যে হাত বাড়ালেন। বন্দুক সংগ্রহ করে লক্ষ্য স্থির করার আগেই শিয়ালগুলো বিভিন্ন দিকে ছুটে গেল। ডাইসন

একটিকে লক্ষ্য করেই দু'টি ব্যারেলের গুলিই শেষ করলেন। কিন্তু গুলির আওতার বাইরে ছিল শিয়াল।

'বেজন্মার গায়ে লাগলো না,' বিড়বিড় করলেন ডাইসন।

পরদিন সকালে ডাইসন পরিবারের সদস্যদের স্নায়ুর অবস্থা পূর্বের চাইতে বিক্ষিপ্ত।

'আমি দুঃখিত, প্রিয়। গতরাতে আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম।' ডাইসন বললেন, 'আজ রাতে আমাকে শিয়াল মারতেই হবে।'

'জন, তুমি কি আর কোনকিছু দেখেছিলে ?'

'আর কিছু,——আর কি ?'

'সাদা পোশাক পরা একজন মহিলা। তুমি যখন গুলি ছুড়লে তখন মহিলা সোজা হেঁটে আসছিল আমাদের দিকে।'

'বাজে কথা। আমি দুঃখিত যে, গুলি শিয়ালের গায়ে লাগেনি। তোমারও উঠে আসা উচিত ছিল।'

'কিন্তু জন, আমার কথা তোমার বিশ্বাস করা উচিত। প্রথম রাতে আমি বাগানে তার পায়ের ছাপ দেখেছিলাম।'

মিসেস ডাইসন থামলেন। এরপর উঠলেন। 'উঠে এসো, দেখে যাও।'

তিনি স্বামীকে বাগানের দিকে নিয়ে গেলেন। বাগানে তখনো শিশির সাদাটে হয়ে আছে এবং সূর্যালোক পড়ে চকচক করছে। পায়ের ছাপ বুঝা যাচ্ছিল। ডাইসন ছাপ অনুসরণ করলেন যেখানে ছাপ শেষ হয়েছে সেই স্থান পর্যন্ত। স্থানটি উন্মুক্ত এবং কেন্দ্রস্থলে একটি কবর – পুরনো, জীর্ণ কবর। কবরের উপর কোন শিলালিপি বা খোদাই করে কিছু লিখা নেই। কবরগাত্রের সর্বত্র শ্যাওলা পড়েছে এবং যেখানে ফাটল সেখানে জন্মেছে আগাছা।

ডাইসন ভিতরে ভিতরে কম্পিত হলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। 'এ নিয়ে কথা বলার কিছু নেই।' তিনি বললেন। এরপর ওভারশিয়ারের আবির্ভাব ঘটলো। ডাইসন তাকে নিয়ে অফিসে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

'সুন্দর লাল, এই বাংলো সম্পর্কে তুমি কি জানো ?'

'খুব বেশি কিছু জানি না, স্যার,' একটু তোতলাতে তোতলাতে ওভারশিয়ার বললেন। 'এ জায়গা সম্পর্কে গ্রামে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকজন সেগুলো বিশ্বাস করে। বহু বছর ধরে এ বাংলোতে কেউ থাকতো না, এমনকি সরকার এটি অধিগ্রহণ করার পরও নয়। ভারতীয় অফিসাররা এখানে বাস করতে অস্বীকার করে। কিন্তু মালি তার পুরো সময় এখানেই কাটিয়েছে এবং সে সুখেই আছে বলে মনে হয়।'

'ঠিক আছে, মালিকে ডেকে পাঠাও।'

সুন্দর লাল মালিকে নিয়ে এলো।

'সাহেব এ বাংলো সম্পর্কে জানতে চান। তুমি যা জানো তা সাহেবকে বলো।'

'গরীবের মা বাপ,' মালি হিন্দিতে শুরু করলো। 'জীন মেমসাহেব মান্দলা থেকে এখানে এসে বাংলোটি নির্মাণ করেন। বাচ্চাদের জন্যে তার একটি স্কুলও ছিল। এটি ছিল সরকারি জমির উপর। বহু বছর ধরে মামলার পর সরকার মামলায় জয়ী হয়ে জায়গাটা দখলে নেয়।

জীন মেমসাহেবের কি হলো ?'ডাইসন জানতে চাইলেন।

'এ বাংলোতেই তিনি মারা যান। সরকার বাড়ি অধিগ্রহণ করে নেয়ার পর তিনি স্কুল

বন্ধ করে দেন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বর্ষার সময় তিনি বাগানে হেঁটে বেড়াতেন। হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং বেশ ক'বার রোগ ভোগের পর তিনি মারা যান। তার মুসলিম বেয়ারার রিয়াজ এবং আমিই শুধু পাশে ছিলাম। আমরা মান্দলায় গিয়ে সেখানকার সাহেবদের খবর দিলাম। কিন্তু কেউ তার সম্পর্কে জানে বলে মনে হলো না। আমরা তাকে জঙ্গলে কবরস্থ করলাম। রিয়াজ চলে গেল এবং এখন মান্দলায় বেয়ারার হিসেবে কাজ করছে। আমি সরকারের সাথে রয়ে গেছি।'

'তার মৃত্যুর পর এখানে ক'জন লোক বাস করেছে ?'

'কেউ এখানে বাস করেনি, সাহেব। অফিসাররা এসেছেন এবং চলে গেছেন। লোকজন তার সম্পর্কে নানা কাহিনী ছড়িয়ে জায়গাটাকে অভিশপ্ত জায়গায় পরিণত করেছে। কিন্তু এখানে পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে কাটাচ্ছি। আমার তো কোন ক্ষতি হয়নি।'

ডাইসন ওভারশিয়ার ও মালিকে বিদায় করে তার স্ত্রীর কাছে গেলেন।

'এইমাত্র আমি মালি ও ওভারশিয়ারের সাথে কথা বললাম,' ডাইসন নিরাসক্তভাবে বললেন। 'এই বাংলোয় কেউ থাকতে পারেনি – তা নিয়ে বহু কাল্পনিক কথাবার্তা চালু আছে। মালি এখানে পঞ্চাশ বছর বাস করছে। যাহোক, আমি এখানেই থাকবো এবং এই ভূতের সাথে চিরদিনের মতো বুঝাপড়া করবো।'

সে রাতে ডাইসন আবার বন্দুকে গুলি ভরে প্রস্তুত করে রাখলেন। ডিনারের পর তিনি দুধ ছাড়া বেশ ক'কাপ কফি পান করলেন। বিছানার পাশে একটি হ্যারিকেন রেখে আলমারিতে পাওয়া কিছু পুরনো ম্যাগাজিন চোখ বুলাতে লাগলেন। ঘরের মধ্যে আলো এবং স্বামী জেগে আছে, এই উপলব্ধিতে আশ্বস্ত মিসেস ডাইসন ঘুমিয়ে পড়লেন বালিশে মাথা রাখার পরপরই।

ডাইসন কিছুক্ষণ পাইপ টানলেন এবং পড়লেন। এরপর হ্যারিকেনের আলো কমিয়ে শুধু ধূমপান করতে লাগলেন।

আগের দু'রাতের চাইতেও ঘোর অন্ধকার ছিল সে রাত। আকাশে মেঘের ছড়াছড়ি এবং ভেজা বাতাসে বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত। মধ্যরাতের পর কোন এক সময়ে বিদ্যুতের চমক ও বজ্রপাতের মাঝে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হলো। গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় এ ধরনের বর্ষণ নতুন কিছু নয়। বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টির হালকা শীতল ছিটা মশারি ভেদ করে আসছে। মিসেস ডাইসন ও তার কন্যা বিদ্যুতের চমক ও বজ্রপাতের মাঝেও দিব্যি ঘুমিয়ে আছেন। বৃষ্টির শীতল ছিটায় ডাইসনের ঘুম ঘুম ভাব এলো। তিনি ঝিমুতে ঝিমুতে বালিশে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

একটি শিয়াল বারান্দার কাছে এসে হাঁক দিল। ঝাঁকুনি দিয়ে ডাইসন জেগে উঠলেন। তখনই বাতি কেঁপে নিভে গেল। মশারির ভিতর থেকে ডাইসন দেখতে পেলেন, তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছায়ামূর্তি। এক জোড়া উজ্জ্বল স্থির চোখ তার উপর নিবদ্ধ। বিদ্যুতের চমকানির মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন সাদা পোশাক পরা মহিলা, যার দু'টি বেণী কাঁধের উপর ঝুলছে। বিদ্যুত চমকের পর বজ্রপাতের প্রচন্ড শব্দ তার চেতনা ফিরিয়ে আনলো। ভয়ে চিৎকার করে তিনি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলেন। কিন্তু বিছানার পাশে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তির উপর থেকে চোখ সরাননি তিনি। তিনি বন্দুকের বাট আঁকড়ে উন্মত্তের মতো ট্রিগারে আঙ্গুল রাখলেন। দু'টি গুলির শব্দ হলো। ডাইসন পড়ে গেলেন। তার মুখের উপর বর্ষিত হয়েছে গুলি।

ধান্নো

রোববারের এখনো চার দিন বাকি। এদিনেই অধিকাংশ সংবাদপত্রে 'পাত্রপাত্রী' বিষয়ক বিজ্ঞাপনগুলো ছাপা হয়। বিজ্ঞাপন ছাপা হওয়ার পর আরো এক সপ্তাহ বা দশদিন লেগে যাবে কারো পক্ষ থেকে সাড়া পেতে। তবু মোহন সতর্কতার সঙ্গে মাঝ সপ্তাহের বিজ্ঞাপনের পাতাগুলো দেখেন কেউ সে ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়েছে কিনা। কিন্তু তার চোখে পড়লো না। নাশতার পর হাভানা চুরুট (রোমিও এন্ড জুলিয়েটা – প্রতিটি ১৫০ রুপি করে।) ধরিয়ে বসার পর জমাদারনী প্রবেশ করলো ঝাড় , ফিনাইল মিশানো পানির বালতি ও ন্যাকড়া হাতে নিয়ে। ফ্লোর ঝাড়পোছ করবে কিনা জানতে চাইলো সে। কোন্ রুম আগে ঝাড় দিতে হবে, তার স্ত্রী সনুর কাছ থেকে সেই নির্দেশ নিতো – তাদের বেডরুম, বাচ্চাদের রুম, বাথরুমের কাজ আগে – এরপর ড্রয়িং রুম, ডাইনিং রুম। তার দিকে চোখ না তুলেই মোহন মাথা নাড়লেন।

ফিনাইলে ভেজানো ন্যাকড়া দিয়ে যখন সে ফ্লোর মুছছিল হঠাৎ মোহনের দৃষ্টি পড়লো জমাদারনীর সুডোল নিতম্বের উপর। সে দৃষ্টি নিতম্বের মাঝ বরাবর সরল বিভাজনও পরখ করলো। তার সুপুষ্ট পশ্চাদদেশ থেকে মোহন চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। এর আগে কখনো তার দিকে তাকাবার ফুরসত হয়নি এবং তার নামও তিনি জানেন না। সে সামান্য জমাদারনী – সুইপারের স্ত্রী। মাঝে মাঝে সে তার তিন সন্তানকে সাথে নিয়ে আসে। ওদের মা যখন বাড়ির ভিতরে ব্যস্ত থাকে তখন মোহন ওদেরকে বাগানে খেলতে দেখেছেন। জমাদারনী উঠে দাঁড়ালো। মোহনের দিকে তাকিয়ে কপালের উপর নেমে আসা চুলের গুচ্ছ হাত দিয়ে সরালো। মোহন লক্ষ্য করলেন, তার স্তনযুগল পরিপূর্ণভাবে স্ফীত এবং কোমর সরু। কালো হলেও দেখতে সে কুশ্রী নয়। সে আবার পাছায় ভর দিয়ে বসলো ফ্লোরের আরেক অংশ মুছতে। মোহন সংবাদপত্রের উপর চোখ ফিরালেন। তিনি ভারতে তার কলেজ জীবনের কথা স্মরণ করলেন। তার এক সহপাঠী বলেছিল, মেথরানীরা বিশ্বের সর্বোত্তম প্রেমিকা। শয্যায় তারা আদিম, উদ্দাম ও উত্তপ্ত। দৃশ্যতঃ একজন মেথরানীর সাথে যৌনকর্মের কথা ভাবা ছাড়া দৃষ্টিকে কাতর করে লাভ নেই। মোহনের চোখে কোন অসুখ নেই। কিন্তু নিজের প্রখর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের পর ভাবলেন যে, শ্রেণী বা জাত হিসেবে এই অস্পৃশ্য রমণী সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত কি হওয়া উচিত ? অন্যান্য চাকরেরা যখন তাদের কোয়ার্টারে থাকে অথবা কেনাকাটার জন্যে বাইরে যায় তখন একে বেডরুমে আসতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে অসুবিধার কিছু নেই। তার বেতন তিনি দ্বিগুণ করে দিতে পারেন। তার বাচ্চাদের খেলনা, মিষ্টি কিনে দিতে পারেন।

মনিব-ভৃত্যের এ ধরনের সম্পর্ক নতুন কিছু নয়। স্বল্প আয়ের গৃহভৃত্যেরা বাড়তি আয়ের সুযোগ পেলে বর্তে যাবে এবং বিশ্বাস ভঙ্গ বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যদি কিছু অর্থাগম হয় তাহলে তাদের স্বামীদের খুব আপত্তি করার কথা নয়। পুরুষ সঙ্গীর কাছে এরা অখন্ড, মনোযোগ বা মূল্যবান উপহার দাবি করবে না, কিংবা পার্টিতে নিয়ে যাওয়ার বায়নাও করবে না। অতএব সবদিক থেকে ঝামেলা কম। বরং এদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সুবিধা আছে। অন্যান্য উদ্যোগ যদি ব্যর্থও হয়, তাহলে মোহন তার জমাদারনীকেই মনে মনে তার সম্ভাব্য যৌনসঙ্গী হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখলেন। সে সঙ্গ দিতে পারবে না সত্য; কিন্তু তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান তো করতে পারবে অবলীলায়।

পরদিন সকালে জমাদারনী যখন ফ্লোর মুছতে এলো মোহন প্রথমবারের মতো তার সাথে কথা বললো। 'তোমার নাম কি ?' সালোয়ার গুটিয়ে তার সামনে কয়েক ফুট দূরে ফ্লোর মুছছিল সে। মোহনের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল, ' ধান্নো।' স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল, সে আরো প্রশ্নের জন্যে উন্মুখ।

'তোমার স্বামী কি করে ?'

'সে মিউনিসিপালিটির সুইপার।'

'কতো বেতন পায় সে ?'

'মাসে এক হাজার রুপি। আমাদের তিন বাচ্চা। আমিও যা কামাই করি সব মিলিয়ে খাবার আর জামাকাপড় কিনতেও কষ্ট হয়। আমার স্বামী মদ খায়। মদের পিছনেই অনেক পয়সা নষ্ট করে।'

মোহন সঠিক জানেন না যে, তাকে কতো বেতন দেয়া হয়। অন্যান্য চাকরের সাথে জমাদারনীর বেতনও অফিস থেকে মেটানো হয়। বাড়ির অন্য খরচও অফিস থেকেই আসে। তিনি শুধু চেক সই করে দেন। জমাদারনীকে যদি বেশি অর্থ দিতে চান, তাহলে তাকে নগদ দিতে হবে। মানিব্যাগ থেকে একশ' রুপির একটি নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'এটা রাখো। বাচ্চাগুলোকে কিছু কিনে দিও।' জমাদারনী নোটটা নিয়ে কপালে ছোঁয়ালো এবং ব্রার মধ্যে চালান করে দিল। সে সরাসরি জিজ্ঞেস করলো, 'মেমসাহেব কি আর এখানে আসবেন না ? তিনি তো মালপত্র ও বাচ্চাদের সাথে নিয়ে গেছেন।' মোহন তার ধৃষ্টতায় হতবাক হলেন। শ্রমজীবী মানুষ বা সমাজের নিচু স্তরের লোকজন রাখঢাক করে কথা বলতে পারে না। কৌশলীও হতে জানে না। তারা সরাসরি ও স্পষ্টভাবে বলে। মোহন কণ্ঠ গম্ভীর করে বললেন, 'তুমি নিজের কাজ করো।'

একদিন অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফেরার পরিবর্তে মোহন শহরে খানিকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরার সিদ্ধান্ত নিলেন। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে ইণ্ডিয়া গেটে গেলেন। গাড়ি থেকে নেমে আশেপাশের দৃশ্য দেখলেন। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে চারটি বড় রঙ্গিন বেলুন ও দু'প্যাকেট বড় ভ্যানিলা আইসক্রিম কিনলেন। মোহন যখন বাড়ি ফিরলেন ধান্নো তখন আরেক দফা ফ্লোর মুছছিল। দিল্লিতে এতো ধূলি যে প্রতিদিন সবকিছু দু'বার করে মুছতেই হয়। তার বাচ্চাগুলো বরাবরের মতো বাগানে খেলছিল। মায়ের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওরা খেলবে। মোহনের হাতের বেলুনের দিকে ওরা তাকালো। ওরা জানে যে, এগুলো ওদের জন্যে নয়। সাহেব কখনো তাদের জন্যে কিছু

আনেননি। মোহন বেলুনগুলো ও আইসক্রিম ধান্নোর হাতে তুলে দিল, 'এসব তোমার বাচ্চাদের জন্যে' বলে টিভির সুইচ অন করলেন।

মিনিটখানেক পর ধান্নো তার বাচ্চাদের নিয়ে ঘরে ঢুকলো। প্রত্যেকের হাতে একটি করে বেলুন। 'সাহেবকে প্রণাম কর,' সে নির্দেশ দিল, 'উনি তোদের জন্যে আইসক্রিমও এনেছেন।'

বাচ্চারা তার পা ছুঁয়ে যতো দ্রুত সম্ভব দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ধান্নো কি তার মনিবের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে ? পরদিন সকালে মোহন ধান্নোর উত্তর পেলেন। স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বিলম্বে এলো সে। বাবুর্চি সেদিনের বাজার করতে চলে গেছে। বেয়ারার তার কোয়ার্টারে গেছে স্নান করতে। ধান্নো নতুন ধোয়া ও ইস্ত্রি করা সালোয়ার কামিজ পরেছে। চোখে কাজল দিয়েছে। কিছু না বলেই সে পাছায় ভর দিয়ে বসে ফ্লোর মুছতে শুরু করলো। সে অনুভব করছে যে, সাহেবের চোখ তার উপর। দু'বার পিছন ঘুরে সে দেখতে পেলো যে, সাহেব তার নিতম্বের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হলেও কৃত্রিম লাজুকতার ভাব এনে মুখ ঘুরিয়ে কাজে মনোযোগী হলো। ধান্নোর উত্তর ইতিবাচক বলে মোহন ধরে নিলেন।

এ ব্যাপারে তড়িঘড়ি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। জমাদারনীকে যৌনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণের ব্যাপারটি নিয়ে প্রথমে তাকে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। তার নিজের শ্রেণী বা সমপর্যায়ের কোন মহিলার সাথে সম্পর্ক করতে এতো ঝুটঝামেলার কথা মাথায় আসে না। এ কাজে কথাবার্তার প্রয়োজন কম। কোন সন্দেহ নেই, তার দুই পুরুষ ভৃত্য যথাশীঘ্র সন্দেহ করবে যে, তাদের সাহেব ও জমাদারনীর মধ্যে কিছু একটা ঘটছে। জমাদারনী তাদের কাছেও অস্পৃশ্য। তাকে কখনো কিচেনে ঢুকতে দেয় না। তার সাথে কোন ধরণের শারীরিক সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে এবং যখন সে উচ্ছিষ্ট খাবার নিতে আসে তখন ডালরুটি অথবা সাহেবের বেচে যাওয়া খাবার তার সাথে আনা একটি পাত্রে ঢেলে দেয়। তারা যদি সন্দেহজনক কিছু আঁচ করে তাহলে পড়শীদের ভৃত্যদের অবশ্যই বলবে। পড়শীদের ভৃত্যরা এক পর্যায়ে তাদের নিজ নিজ মনিবকে খবরটা দেবে। ধান্নো নিশ্চয়ই তার স্বামীকে এসব বলবে না। কিন্তু তার স্বামীর যদি কোন বোধ থেকে থাকে, তাহলে স্ত্রীর আচরণে সন্দেহ শুরু করবে। অতিরিক্ত যে অর্থ সে আনছে সে কথা চিন্তা করে হয়তো মুখ খুলবে না। হয়তো বাড়তি অর্থ কোন ফল দেবে না। কিন্তু যাবতীয় উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তার উপর মোহনের কাছে ' যখন খুশি তখন' যৌন আকাংখা পূরণের বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলো। সে সামান্য কিছুর চাইতে বেশি আকাংখা করবে না অথবা তার আবেগ বা সময়ের কাছে কোন দাবি তুলবে না।

ধান্নোকে যৌনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণের সম্ভাবনায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। অফিসে, বাড়িতে ধান্নোর চেহারা, স্ফীত স্তন, গুরুনিতম্ব – পুরো অবয়ব মোহন তার মনের পটে দেখছিলেন। তিনি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যে, তার চিন্তা হঠাৎ প্রকাশ করে না ফেলেন। পরদিন সকালে তিনি ধান্নোর কাছে জানতে চাইলেন যে, তার স্বামী কখন কাজে বেরিয়ে যায়। ধান্নো বললো, ' সে খুব সকালে বাড়ি ছেড়ে যায়, সাহেব। দুপুরে খাওয়ার জন্যে আমি পরাটা ও সব্জি রেধে দেই। সন্ধ্যায় দেরি করে ঘরে ফিরে। মাসের

প্রথম কয়েকটা দিন, যখন সে বেতন পায়, তখন সঙ্গীদের নিয়ে মদ খায় এবং মাঝরাতের আগে বাড়ি ফিরে না।'

'তোমার ছেলেগুলো কি করে ? যেসব জায়গায় তুমি কাজ করো, সব জায়গায় কি তুমি ওদের নিয়ে যাও ?

'না সাহেব, তা হবে কেন। কোন কোনদিন সকালে আমি অন্যান্য চাকরের বউদের বলি ওদের উপর চোখ রাখতে। আমি যখন বাড়িতে থাকি তখন ওদের বাচ্চাদের সামলে রাখি।'

সাহেবের মনের কথা ধান্নো ভালোভাবেই উপলব্ধি করলো। সাহেবই দিনক্ষণ এবং তাদের সম্ভাব্য যৌনমিলনের স্থান ঠিক করুক। তাকে খুব দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হলো না। দু'দিন পর সে শুনতে পেলো, সাহেব বাবুর্চিকে বলছেন, আইএনএ মার্কেট থেকে তার জন্যে তাজা মাছ আনতে, 'আইএনএ মার্কেটে সবকিছু টাটকা এবং অন্য জায়গার চেয়ে দামও কম। মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, সব্জি, ফল সবকিছু। আমার পরিচিত সবাই সেখান থেকে দিনের বাজার সারে।' মহারাণী বাগ থেকে আইএনএ- মার্কেট সাইকেলে এক ঘন্টার পথ। সেখানে যাওয়া, কেনাকাটা করা ও ফিরে আসা নিয়ে বাবুর্চিকে তিন ঘন্টা বাইরে রাখা যাবে। এরপর সাহেব একটুকরা কাগজে কিছু লিখে বেয়ারারকে দিলেন। তার চুরুট শেষ হয়ে গেছে। তিনি যে ব্রান্ডের চুরুট টানেন তা শুধু কনট সার্কাসের এম আর স্টোরেই পাওয়া যায়। দোকানের নাম তিনি কাগজের উপর লিখে দিয়েছেন। কনট সার্কাস যেতে বেয়ারারকে বাস ধরতে হবে। তিনি বেয়ারারকে একশ' রুপির কয়েকটি নোট দিয়ে বললেন, 'রশিদ নিতে ভুলবে না।' এ দায়িত্ব পালনের জন্যে বেয়ারারকেও কয়েক ঘন্টা বাইরে থাকতে হবে।

এই দুই ভৃত্য থাকতেই ধান্নো তার রুটিন মতো কাজ সেরে চলে গেছে। নিজের বাড়িতে এসে সে দ্বিতীয় বার স্নান করলো। ভালোভাবে সাবান লাগালো গায়ে। খুব করে ডললো। ভৃত্যদের যার যার নির্দেশিত কাজে চলে যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে সতর্কতার সাথে সাহেবের বাড়িতে ফিরে এলো।

মোহন তার প্রতীক্ষায় ছিলেন। যখন সে দোতলায় এলো, তখন তিনি চেয়ার থেকে উঠে তার কাঁধে হাত দিয়ে অত্যন্ত মার্জিতভাবে তাকে বেডরুমে নিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি পাগলের মতো তার ঠোটে চুম্বন এবং স্তন মর্দন শুরু করলেন। ধান্নোও উৎসাহের সাথে তার সাহেবের তৎপরতায় সাড়া দিল। তার স্তন দু'টোর উত্তম ব্যবহারের জন্যে তিনি ধান্নোর কামিজের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ধান্নোর স্তন মোহনের স্ত্রীর স্তনের চাইতেও সুগঠিত। স্তনের বোটা দৃঢ়তর । সে কামিজ খুলে ফেললো এবং চোখ নামিয়ে পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। মোহন ধান্নোর সালোয়ারের ফিতা খুলে ফেলায় সে পুরোপুরি নগ্ন হয়ে পড়লো। ধান্নো বিড়বিড় করে বললো, 'এভাবে হবে না সাহেব। আপনাকেও আমার মতো হতে হবে।' সে মোহনের বেল্ট আলগা করে তার ট্রাউজার নিচে নামিয়ে দিল এবং বিস্মিত হয়ে বললো, 'আমি কখনো এতো বড় কিছু দেখিনি।'

'তুমি কতোগুলো দেখেছো' –একটু রসিকতার সুরে বলে মোহন ধান্নোর হাত নিয়ে তার উত্থিত লিঙ্গ ধরিয়ে দিল। একটু বিব্রত ভাব এনে ধান্নো নিজের কথা শুধরানোর

চেষ্টা করলো, 'আমি শুধু আমার স্বামীরটাই দেখেছি। ওরটা আপনারটার অর্ধেকেরও ছোট। ভগবানের নামে বলছি, আমি আর কোন পুরুষেরটা দেখিনি।'মোহন জানে, সে মিথ্যা বলছে। ধান্নোও জানে যে, সাহেব তার কথা বিশ্বাস করছেনা। কিন্তু এখন এই ফালতু বিতর্কে সময় নষ্ট করে কি লাভ ?

মোহন তার শার্ট খুলে ফেলে ধান্নোকে বিছানায় ফেলে তার উপর উপগত হওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। যখন তিনি তার লিঙ্গে কনডম পরানোর চেষ্টা করছেন তখন ধান্নো বাধা দিল, ' এর কোন প্রয়োজন নেই সাহেব। আমার তিন নম্বর বাচ্চার জন্মের পর আমি লাইগেশন করিয়েছি। কনডম ছাড়া আরো বেশি মজা পাবেন।

যখনই মোহন কোন নতুন নারীর দেহ নিয়ে খেলেছেন, তার মনে হয়েছে নতুন ল্যান্ডস্কেপ আবিস্কার করছেন। নারীদেহের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সকল ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্ন। কিন্তু বিস্তারিত প্রয়োগে নিঃসন্দেহে ভিন্ন। ধান্নোর দেহে মাদকতাময় এক ধরনের সুবাস। তার স্ত্রীর শরীর থেকে সবসময় ফ্রেঞ্চ কলোনের গন্ধ ভেসে আসতো। মোহন বেশিক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। পরাজিতের মতো নিজেকে প্রত্যাহার করলেন। ধান্নোর ধৈর্যের শেষ নেই। সে অত্যন্ত আবেগের সাথে দক্ষ হাতে মোহনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত মর্দন করলো। কামকলায় সে পটু। মোহন দ্বিতীয় দফা উত্তেজিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার কৌশলগুলো প্রয়োগ করলো। এবার ধান্নো মোহনের চাইতে আগে নিঃশেষ হলো। চরম তৃপ্তির উন্মাদনায় সে মোহনের মাথা আঁকড়ে নখ বসাতে চেষ্টা করলো; তার ঠোট কামড়ালো এবং এক সময় জবাই করা গরুর গোঙানির মতো দীর্ঘ শব্দ ছেড়ে এলিয়ে পড়লো। মোহন নিজেকে বিজয়ী মনে করলেন এবং নিজের পৌরুষে তার গর্ব হলো।

বাড়ি থেকে ধান্নোর বের হয়ে যাওয়া কেউ দেখলো না। মোহন চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে ভাবলেন, দুনিয়ার সবকিছুই ঠিকভাবেই চলছে। তিনি সংবাদপত্রে যে ধরনের সঙ্গিনীর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, ধান্নো সেই বিবরণের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু কামনাও ভালোবাসার একটি দিক– সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন মন ও আবেগের বিনিময়ে সঙ্গী পাওয়া যাচ্ছে না, তখন একজন পুরুষ যা চাইতে পারে, সেরকম একটি বিকল্প থাকা উত্তম।

ধান্নোর সাথে সকালের যৌনমিলন পাক্ষিক বিষয়ে পরিণত হলো। এই নতুন সম্পর্ক নিয়ে সে সমভাবে আগ্রহী এবং নিজের প্রয়োজনগুলোও প্রকাশ করে। মোহন তার দেহের প্রতিটি অংশের সাথে এখন সুপরিচিত। এমনকি ধান্নোর ডান উরুর একটি বড় রোদে পোড়া দাগও তার প্রিয় হয়ে উঠেছে। মোহন আঙ্গুল দিয়ে দাগটা অনুভব করেন এবং তার ঠোট ও চোখে চুমু দেয়ার আগে সেই দাগের উপর ঠোট স্পর্শ করেন। যৌনমিলন যদিও মধুর, কিন্তু ক্রমে তা গরিমা হারাতে শুরু করলো। ধান্নো তাদের মিলনের আসন পরিবর্তনের উদ্যোগে বাধা দিল। মোহন যখন ধান্নোকে তার দেহের উপর উঠিয়ে সঙ্গমকে আরো বৈচিত্রময় করা যায় কিনা দেখতে চাইলেন, ধান্নো প্রবল আপত্তি করলো, 'না, সাহেব। তা কিছুতেই হবে না। আমার নিচে আপনাকে কখনো থাকতে দেব না। আপনি আমার মালিক।' মোহন জবরদস্তি করলেন না। ধান্নোর সাথে যে সমঝোতা হয়েছে তাতে সে তার দিক ভালোভাবে পূরণ করেছে।

সরোজিনী

মোহন বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা পর প্রফেসর সরোজিনী ভরদ্বাজ পৌছলেন। জীবন রাম ও বেয়ারার গেস্টরুমে তার লাগেজ পৌছে দিল। তারা বিদায় নেয়ার পর তিনি রুমের চারদিক দেখলেন। বালিশের উপর রাখা এনভেলাপের দিকে তার চোখ পড়লো। সেটা হাতে নিয়ে তিনি খুললেন। কাগজের নোটের ওজন অনুভব করলেন। মুহূর্তের জন্যে নিজেই লজ্জিত হলেন। অতঃপর নোটগুলো পার্সে রাখলেন। মোহনের লিখা চিরকুট পাঠ করলেন। তাতে অর্থের ব্যাপারে কিছু লিখা নেই। চুক্তি অনুযায়ী তার শর্তের অংশ তিনি আগেই পূরণ করেছেন। ভদ্রলোক নিজের কথার সম্মান রক্ষা করতে জানেন। এখন তাকে শর্তে তার অংশ পূরণ করতে হবে। স্যুটকেস খুললেন সরোজিনী। একটি খালি ওয়ার্ডরোবে তার কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখলেন। টেবিলে বইগুলো সাজালেন। স্নান সারতে দশটা বেজে গেল। নাশতায় টোস্ট ও কফি পান করলেন এবং বেয়ারারকে বললেন কিছু কেনাকাটা করতে তিনি বাইরে যাচ্ছেন, লাঞ্চের সময়ে চলে আসবেন।

দিল্লির শপিং এরিয়া সম্পর্কে সরোজিনীর কোন ধারণা নেই। কিন্তু সাউথ এক্সটেনশন মার্কেটে ভালো শাড়ি পাওয়া যায় বলে শুনেছেন। ড্রাইভার জানে তাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে। রিং রোডে গাড়ির গতি মন্থর করতে হলো। অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই বাস, কার, মোটর সাইকেল এতো বেশিসংখ্যক দেখতে তিনি অভ্যস্ত নন। মূলচান্দ ট্রাফিক সিগন্যালে ধূসর রং এর একটি চকচকে গাড়ি মার্সিডিজের পাশেই থামলো। সরোজিনীর চোখ পড়লো সেই গাড়ির পিছনের আসনে বসা মহিলার উপর। ঢেউ খেলানো চুল, ঠোটে উজ্জ্বল লাল লিপস্টিক, গালে রোজের প্রলেপ। পরনে হাতাকাঁটা ব্লাউজ। তার গায়ে গা লাগিয়ে বসা অভিজাত চেহারার এক পুরুষ। তার আঙ্গুলে কয়েকটি সোনার আংটি। লোকটি মহিলার গলা জড়িয়ে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো এবং তার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে কিছু বললো। মহিলা মাথা পিছনে সরিয়ে নিয়ে হাসলো। তার এক হাত লোকটির উরুসন্ধিতে। সরোজিনী নিঃশ্বাস ফেলার সাথে মহিলার প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশ করলেন। সবুজ বাতি জ্বলে উঠার সাথে গাড়ি চলতে শুরু করলো সরোজিনী উপলব্ধি করলেন যে, তিনি কি করেছেন। একজন মহিলাকে তিনি ঘৃণা করছেন, যে সম্ভবতঃ তিনি যা করতে সম্মত হয়েছেন, তার চাইতে খারাপ কিছু করছে না। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, তিনি সরোজিনী ভরদ্বাজ, ইংরেজীর প্রফেসর, দেখতে এ মহিলার ধরনের নন। সেদিন সকালে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো

লজ্জিত হলেন। কিন্তু এই অনুভব শিগগির মরে গেল। শুধু এক ধরনের উদ্বেগ টিকে রইলো।

মার্কেটে বেশ ভিড়। ড্রাইভার তাকে একটি দোকানে নিয়ে গেল যেখানে তার কাংখিত জিনিসগুলো খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগলো না। নিজের জন্যে হালকা ধূসর রং এর একটি সূতি শাড়ি কিনলেন। এ রং এ তাকে বেশ মানায়। গোলাপী রং এর একটি ড্রেসিং গাউনও কিনলেন। দু'টো মিলে এক হাজার রুপির সামান্য বেশি লাগলো। দাম পরিশোধের সময় তিনি নোটগুলো গুনলেন। পরিশোধিত অর্থ এবং অবশিষ্ট যা রয়েছে তা মিলিয়ে মোট দশ হাজার রুপি।

লাঞ্চের জন্যে যথাসময়েই তিনি ফিরে এলেন। বেয়ারার অনেক আইটেম টেবিলে সাজিয়েছে – শশার সুপ, সব্জি পোলাও, ডাল, সব্জি এবং পায়েস। সবগুলোই তিনি চোখ দেখলেন। খেলেন খুব সামান্য। রুমে গিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলেন। ঘুম এলো না। তার মনে আলোড়ন। কয়েক মিনিট তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকলেন। আবার চোখ খুলে ঘড়িতে সময় দেখলেন। আবার তন্দ্রা এলো, চমকে উঠে ঘড়ি দেখলেন। মনে হচ্ছিল, সময় থেমে গেছে। বেডসাইড ল্যাম্প জ্বেলে পড়ার চেষ্টা করলেন। পড়ায় মন বসলো না। হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ঘুমের জন্যে যুদ্ধ শুরু করলেন। এভাবেই বিশ্রামহীন একটি বিকেল কেটে গেল। আওয়াজ শুনে তিনি বুঝলেন, চাকররা কোয়ার্টার থেকে ফিরে এসেছে। চা পানের জন্যে যখন তিনি বের হয়ে এলেন তখন বিকেল পাঁচটা। তিনি নিজেকে আবিস্কার করলেন কয়েক মিনিট পরপরই হাতঘড়ির দিকে তাকাতে। যখন ছ'টার কাছাকাছি অর্থাৎ মোহনের অফিস ত্যাগ করার সময় তখন তার অস্থিরতা বাড়লো। তিনি রুমে গিয়ে আবার স্নান করলেন। সেদিনের তৃতীয় দফা স্নান। কয়েকটি আগরবাতির কাঠি জ্বালিয়ে একটি গ্লাসে দাঁড় করিয়ে স্বরস্বতী দেবীর ছোট্ট মূর্তির সামনে স্থাপন করলেন। স্বরস্বতীকে তিনি তার দেখাশুনাকারী দেবী বিবেচনা করেন এবং সবসময় সাথে বয়ে বেড়ান। কার্পেটের উপর বসে দু'হাত জোড় করে তিনি স্বরস্বতীর বন্দনা করলেন। প্রার্থনা শেষে নতুন কেনা শাড়ি পরে কপালে নতুন টিপ লাগালেন। ঠোটে হালকা লিপস্টিক দিয়ে গলা, বগলতলা ও বুকে কলোন স্প্রে করলেন। মুক্তার নেকলেসটা পরে বাথরুমের আয়নায় নিজেকে পরখ করলেন। তখনো তিনি অস্থির। ঘর থেকে বেরিয়ে বালকনিতে বসে মোহনের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

এখন দিন ছোট হয়ে আসছে। গ্রীষ্মের মাসগুলোর চাইতে দিনের আলো দ্রুত হারিয়ে যায়। সাড়ে ছ'টার মধ্যে সংক্ষিপ্ত গোঁধূলি অন্ধকারকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। প্রায়ান্ধকার আকাশে সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছে একটি অর্ধচন্দ্রের পাশে। সময় বেশি কাটেনি। গেটে গাড়ির আওয়াজ শুনলেন সরোজিনী। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গেট খুললো এবং কালো মার্সিডিজ নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। সরোজিনী ড্রাইভারকে 'গুডনাইট, স্যার' বলতে এবং মোহনকে সাড়া দিতে শুনলেন। সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে মোহনের দোতলায় উঠে আসার পদশব্দও তার কানে এলো। তিনি উচ্চকণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'কিসের গন্ধ ?' ব্যালকনির দিকে এগিয়ে সরোজিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হ্যালো'

এবং তার পাশের চেয়ারেই বসলেন। 'সবকিছু ঠিকমতো হয়েছে তো ? লাঞ্চ, টি, বেডরুম ?'

'হ্যালো।' সরোজিনী দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেন। 'সবকিছু চমৎকার। গন্ধটা আগরবাতির। মা স্বরস্বতীর জন্যে জ্বালিয়েছি। প্রতি সন্ধ্যায় আমি স্বরস্বতীর পূজা করি। আগরের গন্ধ কি আপনার পছন্দ নয় ?'

'না, না, তা নয়। এ গন্ধের সাথে আমি অভ্যস্ত নই। বসো, সারাদিন কিভাবে কাটলো ?'

'সামান্য কেনাকাটা করেছি। এ শাড়িটা কিনলাম।' শাড়ির আঁচল তুলে তাকে দেখালেন। 'সবকিছুর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

'চমৎকার শাড়ি। আর কি করলে ?'

'কাপড়চোপড়, বইপত্র গোছানোর কাজটাও সেরে ফেলেছি। লাঞ্চ করেছি। সামান্য ঘুমিয়েছি। একটু পড়েছি, এভাবেই দিনটা কেটে গেল।' পরস্পরকে বলার মতো আর কোন কথা ছিল না তাদের। মোহন দাঁড়ালেন, 'কয়েক মিনিটের জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে হবে। দ্রুত স্নান সেরে কাপড় পাল্টাবো। অফিস খুব বাজে জায়গা। অনেকের সাথে হাত মিলাতে হয়। অনেক নোংরা ফাইল পড়তে হয়।' কলার ঢিলা করে টাই খুলতে খুলতে বললেন।

রুমে ঢুকে প্রথমেই তিনি ফোনের এনসারিং মেশিন চেক করলেন। কোন কল আসেনি। এরপর শেভ করলেন। স্নান সেরে মুখে আফটার শেভ লোশন লাগলেন। একটা স্পোর্টস শার্ট পরে ব্যালকনিতে সরোজিনীর কাছে এলেন। বেয়ারার তার জন্যে হুইস্কি, সোডা এবং বরফ সাজিয়ে দিল, 'তুমি কি কখনোই পান করোনি ?' মোহন জানতে চাইলেন।

'আপনি কি মদপানের কথা বলছেন ? আমার এক মাসের স্বামী আমাকে হুইস্কি পান করানোর চেষ্টা করেছিল। হুইস্কির স্বাদ আমার ভালো লাগেনি। আমি উগলে ফেলে দিয়েছিলাম। এরপর সে আমাকে এক ধরনের মিষ্টি মদ দিয়েছিল, তাতে আমি তেমন আপত্তি করিনি এবং খুব খারাপ লাগেনি।'

'তাহলে ওটা শেরি হবে। আমার কাছে খুব ভালো স্প্যানিশ ওলোরোসো আছে। মেয়েদের পানীয়। তোমার ভালো লাগবে।

তিনি উঠে পানীয়ের কেবিনেট থেকে এক বোতল ওলোরোসো ও একটি গ্লাস বের করলেন। সরোজিনীর জন্যে শেরি এবং নিজের জন্যে হুইস্কি ঢাললেন।

এক চুমুক পান করে সরোজিনী বললেন, 'এর স্বাদ মন্দ নয়। আশা করি এতে আমি মাতাল হবো না।'

'কয়েক গ্লাস পান করলে তেমন অসুবিধা হবে না। এর মধ্যে এলকোহলের পরিমাণ সামান্য।' তিনি উত্তর দিলেন।

তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মোহন বললেন, 'আরো কিছু বলো।'

'না আপনিই বলুন; আপনার নিজের সম্পর্কে। আজ আসলেই বলার মতো কিছু করিনি।'

এভাবেই চললো। সরোজিনী মোহনের হুইস্কি পানের সাথে তাল মিলিয়ে পান করছিলেন। একসময় তার মনে হলো, যেন তিনি বাতাসে ভাসছেন। মোহন অনুভব করলেন, সামনে যে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হতে পারে তার প্রস্তুতি হিসেবে সরোজিনী পান করছে।

ডিনারে দু'জনই নিরামিষ ভোজন করলেন খুব বেশি বাক্য বিনিময় না করে। মোহন দরজায় তালা দিতে উঠে গেলেন। সরোজিনী দেখলেন, মোহন প্রধান গেটের তালা লাগিয়ে বাড়ির মধ্যে চাকরদের ব্যবহারের দরজাটা বন্ধ করলেন। এরপর আবার সামনের বারান্দায় গেলেন এবং একটি ঝোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ট্রাউজারের জিপার খুললেন। সরোজিনী উপর থেকেই গাছের পাতার উপর মোহনের প্রস্রাবের ধারার শব্দ শুনতে পেলেন। মনে মনে বললেন, 'আজব লোক।' তিনি বেডরুমে গেলেন। শাড়ি, পেটিকোট, ব্লাউজ, খুলে নতুন সিল্কের গাউনটি পরলেন। তার পা টলে উঠলো। ধপ করে একটি চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। মোহন সব দরজা বন্ধ করে সরোজিনীর সাথে যোগ দিতে এলেন। তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'তুমি ভালো আছো তো ?'

'হ্যা, ভালো। তবে একটু ক্লান্ত। অতোটা শেরি পান করা উচিত হয়নি। এলকোহলে আমি অভ্যস্ত নই। ঘুমিয়ে এ ক্লান্তি দূর করতে হবে।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন। মোহন তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বিছানার দিকে নিতে নিতে বললেন, 'বেডরুমে তোমাকে দেখার সুযোগ দাও।' সরোজিনী তার মাথা মোহনের প্রশস্ত বুকে স্থাপন করে বিড়বিড় করলেন, 'আমার প্রতি একটু সদয় হতে হবে। এগার বছর কোন পুরুষের কাছে যাইনি। আমি ভয় পাচ্ছি।'

মোহন তাকে আশ্বস্ত করতে আন্তরিকভাবে জড়িয়ে ধরলেন। 'ভয়ের কিছু নেই। আমি কামুক শ্রেণীর লোক নই। তুমি না চাইলে আমরা বিরত থাকবো। কিছু সময়ের জন্যে শুধু তোমার সঙ্গে শুয়ে থাকার অনুমতি দাও। এরপর আমি আমার রুমে চলে যাব।'

সরোজিনীর ভীতির ভাব কাটলো এবং তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে রইলেন। মোহন তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজেকেও তার পাশে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি মোহনের বুকে মুখ ঘষলেন এবং কোমর জড়িয়ে ধরে স্থির শুয়ে থাকলেন। মোহন আস্তে আস্তে তার গাউনের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তার কাঁধে, ঘাড়ে মৃদু চাপ দিতে থাকলেন। এরপর তার হাত নেমে এলো সরোজিনীর শিরদাঁড়ায় এবং ছোট্ট নিতম্বের। তার সারাদেহে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। বললেন, 'টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিন।'

বাতি নিভানোর পর মোহন বললেন, 'তোমার শরীর আমাকে দেখতে দিতে চাও না?'

'দেখার মতো তেমন কিছুই নেই।' তার সংক্ষিপ্ত উত্তর। 'আমার বয়সী যে কোন মহিলার মতোই দেখতে। তবে সহজ সরল। আমার দেহ তেমন সুগঠিত নয়।' তার গাউনের বেল্ট খুলতে খুলতে মোহন বললেন, 'দেখা যাক।'

তিনি সরোজিনীর একটি স্তন হাতে নিলেন। সরোজিনীর স্তন তার স্ত্রী, ধান্নো অথবা অন্য যেসব মহিলাকে তিনি শয্যায় নিয়েছেন তাদের স্তনের মতো সুগঠিত নয়। এই পার্থক্য তাকে আরো কাংখিত করে তুললো। মোহন তার স্তনের বোটায় চুমু দিলেন এবং ক্রমে স্তনটি মুখে পুরলেন। শিহরণ ও তৃপ্তিতে সরোজিনীর মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বের হতে লাগল। বিড়বিড় করে তিনি উচ্চারণ করলেন, 'দয়া করে আরেকটিকে অবহেলা করবেন না।' মোহন অন্য স্তনেরও কাংখিত ব্যবহার করলেন। এর মধ্যে তিনি ট্রাউজারের জিপার খুলে ফেলেছেন এবং সরোজিনী তার পেটে মোহনের উত্থিত লিঙ্গের চাপ অনুভব করছে।'

বিস্মিত আতংকে সরোজিনী বললেন, 'ওহ্ ভগবান, আপনার যন্ত্র এতো বিশাল! এটা তো আমাকে খন্ডবিখন্ড করে ফেলবে।' তিনি উরু চেপে রেখে তাকে বিদ্ধ করা থেকে বিরত করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'দিব্যি করে বলুন, আমাকে ব্যথা দেবেন না। অন্ততঃ এটুকু মাথায় রাখবেন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির এবং বহু-বহুদিন কেউ আমাকে সঙ্গম করেনি।

মোহন নিজেকে গর্বিত, সক্ষম এবং বিলুপভাবে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করলেন। তবু অন্যান্য মহিলার সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করেছেন, তার চাইতে সরোজিনীর ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হলেন। মোহন অনুভব করলেন, সরোজ তাকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত। তিনি তার উরু প্রসারিত করলেন মোহন আস্তে আস্তে তার মাঝে প্রবেশ করলেন। সে দু'হাতে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে জড়ানো কন্ঠে বললেন, 'ওহ ভগবান! আপনি তো আমাকে দু'টুকরো করে ফেলবেন।' তিনি পুরোপুরি উত্তেজিত। খসখসে আওয়াজে বললেন, 'আমাকে মেরে ফেলুন।' মোহন সজোরে তাকে বারবার বিদ্ধ করতে থাকলেন।

সরোজিনী চিৎকার করলেন। আতংকে বা ব্যথায় নয়। একাধিকবার চরম তৃপ্তির আনন্দে। এ ধরনের পরিতৃপ্তি লাভের পূর্ব অভিজ্ঞতা তার নেই অথবা বিশ্বাসও ছিল না যে, এমন সুখলাভ সম্ভব। তার দেহ শিহরণে কেঁপে কেঁপে উঠে একসময় অবসাদগ্রস্ত হলো। এরপর এক ধরণের কম্পন। মূর্ছা যাওয়ার মতো। তিনি মোহনের মুখ, হাত, বুকে পাগলের মতো আঁচড় বসাতে বসাতে কাঁদতে শুরু করলেন, 'আমি একজন বেশ্যা। বাজারের সামান্য দেহ পসারিণী! আমি একটি কুত্তী!' মোহন তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে সান্তনা দিলেন, 'তুমি সে ধরনের কেউ নও। তুমি চমৎকার ভদ্রমহিলা। কিন্তু তুমি জানতে না, ভালোবাসা কাকে বলে।'

সরোজিনী জানেন, মোহনের কথার কোন অর্থ নেই। তবু তিনি সান্তনা পেলেন। তার মাথা মোহনের হাতের উপর রাখলেন এবং দ্রুত তার নাক ডাকতে শুরু হলো। দু'জনের কেউই নিজ নিজ অঙ্গ ধৌত করার প্রয়োজন অনুভব করলেন না এবং একে অন্যের বাহুতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

অনেকগুলো ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর সরোজিনী মোহনকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিলেন। 'আপনার রুমে যান এবং বিছানাটা এমন করে রাখুন যাতে মনে হয় রাতে বিছানা ব্যবহৃত হয়েছে।

মোহন টলতে টলতে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। তিনি জানেন না তখন ক'টা বাজে। চাকরদের প্রবেশের জন্যে দরজার ছিটকিনি খুলে রেখে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে মোহন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন।

ইয়াসমিন

ধর্ম ও দর্শন বিভাগে তুলনামূলক ধর্মের ক্লাসে ইয়াসমিনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ।

আমাদের প্রফেসর ডঃ অ্যাশবি'র লেকচার আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে। তার ক্লাসে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্ররা সমবেত হওয়ায় ক্লাসটি বিচিত্র রূপ ধারণ করে। মেডিসিন, সাহিত্য, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য বিভাগের ছাত্রও আছে। ত্রিশজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যারা নিয়মিত ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন খ্রিষ্টান সন্ন্যাসিনী এবং চল্লিশের কাছাকাছি বয়সী সালোয়ার কামিজ পরা এক মহিলা। সে বহু অলংকার পরে আসতো এবং বেশ সাজগোজ করতো। তার মাথায় কোন টিপ না থাকায় আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, সে একজন মুসলিম। সামনের সারিতে বসতো সে। আমি বসতাম একেবারে পিছনের সারিতে। প্রতিটি লেকচারের পর আলোচনা হতো। কিন্তু ছাত্র এবং বিশেষ করে সামনের সারিতে বসা সেই মুসলিম মহিলা অনেক কথা বলতো। আমি তাদের আলোচনায় কখনো অংশ নেইনি; কারণ কোন ধর্ম সম্পর্কে আমি সামান্যই জানতাম।

ডঃ অ্যাশবি বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর সাথে আমাদের পরিচয় ঘটালেন–জরস্ট্রিয়বাদ, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টবাদ ও ইসলাম। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তিনি কি বলেন তা শোনার জন্যে আমি ব্যগ্র থাকতাম। একজন হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও আমি কিছু কিছু দেবদবীর নাম এবং গায়ত্রী মন্ত্র ছাড়া আর কিছুই জানতাম না। হিন্দু ধর্মের উপর তার তিনটি লেকচার নির্ধারিত ছিল। ডঃ অ্যাশবি আমাদের চার বেদ, উপনিষদ এবং ভগবত গীতা সম্পর্কে বললেন। তার অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কিত বক্তব্যের চাইতে এগুলো আমার কাছে বেশি অর্থবহ মনে হলো। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, যে কোন রূপে, যে কোন আকৃতিতে ভগবানের পূজা করাই হিন্দু ধর্মের মূল কথা। হিন্দুদের নির্দিষ্ট কোন ধর্মগ্রন্থ নেই – জেন্দ আবেস্তা, তাওরাত, বাইবেল, কোরআনের মতো কিছু নেই। 'যে বিষয়ই তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়, তাই পাঠ করো। নিজের মাঝেই সত্যের অন্বেষণ করো।' তাছাড়া ভগবত গীতার বাণী আধ্যাত্মিকভাবে যে কতো উঁচুতে তা তিনি ব্যাখ্যা করলেন – 'নিষ্কাম কর্ম, অর্থাৎ পুরস্কারের আশা না করে তোমার কর্তব্য পালন করে যাও। জীবন যুদ্ধে যখন অবতীর্ণ হয়েছো, তখন তুমি জয়ী হবে কি পরাজিত হবে; এতে তুমি আনন্দ পাবে না, দুঃখ পাবে তা ভেবে লাভ নেই। ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, পৃথিবীতে আবার অবতীর্ণ হয়ে পাপ ও মন্দ থেকে তিনি পৃথিবীকে মুক্ত করবেন। হিন্দুদের ভগবান প্রেরিত কোন পুরুষ বা বার্তাবাহক (পয়গম্বর) নয় এবং হিন্দুধর্মে এক ঈশ্বরও নেই। 'কেউ তার পছন্দমতো দেব-দেবীর পূজা করতে পারে।' তার লেকচার

শেষে আমি নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত বিবেচনা করে চিৎকার করতে চাইলাম, 'আমি একজন হিন্দু এবং হিন্দুদের একজন হতে পেরে আমি গর্বিত'।

কিন্তু সামনের সারির সেই মহিলা আমার চেতনায় হতাশার সৃষ্টি করলো। তীব্রভাবে আপত্তি জানিয়ে সে তার একতরফা বক্তব্য দিতে শুরু করলো, 'প্রফেসর, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তার সবই চমৎকার। কিন্তু আমাদেরকে বলুন যে, এখনকার হিন্দুরা একটি বানর বা হাতিকে ভগবান বিবেচনা করে পূজা করে কেন ? হিন্দুরা বৃক্ষ, সাপ, নদীকে পূজা করে। এমনকি তারা লিঙ্গ পূজা করে; মেয়েদের যোনীর পূজা করে দেবদেবী হিসেবে।' ডেস্ক চাপড়িয়ে সে আরো বললো, 'হিন্দুদের মন্দির প্রাচীরে আপত্তিকর কুরুচিপূর্ণ সব ভাস্কর্য। হিন্দুদের জন্যে হাম, গুটিবসন্ত, প্লেগের দেবতা আছে। তাদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা কৃষ্ণ, যার জীবনের সূচনা হয়েছিল চুরি করার মধ্য দিয়ে। ধরা পড়ে সে মিথ্যা কথা বলে। মেয়েরা যখন গোসল করছিল, তখন কৃষ্ণ তাদের কাপড় চুরি করে, যাতে সে তাদের নগ্ন শরীর দেখতে পায়। এক হাজারের অধিক মহিলার সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক ছিল। তার সারা জীবনের সঙ্গিনী রাধা তার স্ত্রী ছিল না; বরং সে ছিল তার মামি। হিন্দু ধর্মই পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম, যে ধর্মের অনুসারীদের একটি বড় অংশকে শুধু জন্মের কারণে ছোট জাতের বা অস্পৃশ্য ঘোষণা করা হয়েছে। পৃথিবীতে হিন্দুরাই শুধু জীবিত পুরুষ ও নারীকে দেবদেবী বিবেচনা করে পূজা করে। আমি শুনেছি যে, এ ধরনের প্রায় পাঁচশ পুরুষ ও নারী আছে, যারা নিজেদের ভগবান বলে দাবি করে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, গঙ্গার পানিতে একবার ডুব দিলে তাদের সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়। ফলে তারা পুনরায় পাপ শুরু করতে পারে। মৃত্যুর পর আবার নতুন করে আরেক রূপে জন্মের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি কি? বর্তমান জীবনের কর্মফল হিসেবে কেউ ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর বা সাপ হয়ে জন্মাতে পারে। বর্তমানে হিন্দুরা এসবেই বিশ্বাস করে। বেদ, উপনিষদ বা গীতার মূল্যবান শিক্ষায় নয়। হিন্দুদের এখনকার আচরিত বিষয়গুলো কি আমাদের তলিয়ে দেখা উচিত নয় ?

পুরো ক্লাসে স্তব্ধ নিরবতা। মহিলা এমন উত্তেজিতভাবে তার কথাগুলো বলছিল যে, তার বক্তব্যে বাধা দেয়ার কোন সুযোগই ছিল না। ডঃ অ্যাশবি পরিবেশকে আবার গঠনমূলক আলোচনার দিকে ফিরিয়ে আনলেন। শান্তভাবে বললেন, 'এ ধরনের কিছু বিষয় সব ধর্মের ব্যাপারেই বলা যেতে পারে। ধর্মগুলোর প্রতিষ্ঠাতারা কি শিখিয়েছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থে কি লিখা আছে তা এখন যেভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বা পালন করা হচ্ছে, তা থেকে বহুদূরে। আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে ধর্মের তাত্ত্বিক দিক, ধর্ম কিভাবে পালিত হচ্ছে তা নয়। মুসলমানরা মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করে, অথচ তারাই কাবাঘরের পাথরকে চুম্বন করে এবং অসংখ্য মুসলমান তাদের পীরের মাজারে পূজা করে।' মহিলা উত্তর দিল, 'মুসলমানদের ধর্ম পালন সম্পর্কে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি।'

কিন্তু সে ব্যাখ্যা করার সুযোগ লাভের আগেই ক্লাস শেষ হলো। 'আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই আলোচনা অব্যাহত রাখবো' – বলে প্রফেসর অ্যাশবি ক্লাসরুম ত্যাগ করলেন।

রাগে আমি জ্বলছিলাম। ছাত্রছাত্রীরা বের হয়ে যাচ্ছিল। আমি মহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'ম্যাডাম, আপনি হিন্দুদের এতো ঘৃণা করেন কেন ? মহিলা একটু ভড়কে গেল। প্রতিবাদ করলো আমার বক্তব্যের। 'আমি হিন্দুদের ঘৃণা করি না। কাউকেই ঘৃণা করি না আমি।' আমার আপদমস্তক নিরীক্ষা করলো, যেন এই প্রথম দেখছে আমাকে। সে ভাবেনি যে, আমি একজন ভারতীয়। তাকে অনুতপ্ত মনে হলো, 'তুমি কি ভারত থেকে আগত হিন্দু, যতোটা চাছাছোলা করে বলা সম্ভব আমি তাই বললাম, 'আমি ভারতীয় হিন্দু এবং দু'টোর জন্যেই আমি গর্বিত। আমি বানর, হাতি, সাপ, পুরুষাঙ্গ বা যোনীর পূজা করি না। আমার ধর্মের মূল বাণী একটাই – অহিংসা, কাউকে আঘাত করো না।'

সে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, 'আমি দুঃখিত। আমার বক্তব্যে তোমার অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। হিন্দু ধর্ম এবং ভারত সম্পর্কে আমার যে ভুল ধারণাগুলো আছে সম্ভবত একদিন তুমি আমার সে ধারণা পরিস্কার করে দিয়ে সত্যিকারের বিষয়গুলো জানাতে পারবে।' বন্ধুত্বের সৌজন্য হিসেবে সে হাতে বাড়িয়ে দিল। আমি অতি উৎসাহ না দেখিয়ে তার সাথে হাত মিলালাম।

সে বললো, 'নাম ইয়াসমিন ওয়ানচো, আজাদ কাশ্মীর থেকে এসেছি এক সরকারি বৃত্তি নিয়ে।'

'আমি দিল্লি থেকে এসেছি। নাম মোহন কুমার। ব্যবসা প্রশাসন ও কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশুনা করছি।'

অনেক কাশ্মীরী মেয়ের মতোই ইয়াসমিনের গায়ের রং ককেশীয় মেয়েদের মতো অতি ফর্সা, মসৃণ। বাদামের রং এর মতো তার চুল, হরিণীর মতো টানা বড় চোখ। কিন্তু মেদের সাথে সে নিরর্থক যুদ্ধ করছে। তার থুতনিতে লক্ষ্য করার মতো স্ফীতি দমন করতে পারছে না। তাকে পাঞ্জাবী ভাষায় বলা চলে, 'গোরি চিত্তে গোলে মোটলে'– ফর্সা সুন্দর গোলগাল মোটাসোটা। সে প্রথম পাকিস্তানি মহিলা, যার সাথে আমি কথা বললাম। এর আগে কোন মুসলিম মহিলার সাথেও আমার কথা হয়নি। পাকিস্তানিরা ভারতীয়দের এবং মুসলমানরা

হিন্দুদের ঘৃণা করে এবং চরম বিদ্বেষ পোষণ করে বলে যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে সেসব ব্যাপারে কোন সত্যতা আছে কিনা আমি ইয়াসমিনের কাছে জানতে চাইলাম। আমি আশা করেছিলাম সে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে। খুব বেশিদিন অতিবাহিত হয়নি যে, আমাদের এই দু'টি দেশ তাদের তৃতীয় যুদ্ধ লড়েছে। তবু আমি পাকিস্তানিদের ঘৃণা করিনি। কিন্তু ইয়াসমিনের অতোটা উত্তেজিত হয়ে কথা বলায় আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ ঘৃণা কি জিনিস আমি বুঝিনি।

পরের ক্লাসে ইয়াসমিন আমার কাছে এলো এবং বললো, 'আর কঠোর কথা নয়। এসো, আমার পাশে বসো।' আমি তার প্রস্তাব নাকচ করে বললাম, 'ম্যাডাম, আমি শেষ সারিতেই বসি, সামনের সারিতে বসতে ঘৃণা করি।'

'সেক্ষেত্রে আমি শেষ সারিতে এসে তোমার সাথে বসছি। দয়া করে আমাকে ম্যাডাম বলো না, তাতে নিজেকে বৃদ্ধা বলে মনে হয়। আমি ইয়াসমিন। তুমি কিছু মনে না করলে আমি তোমাকে মোহন বলেই ডাকবো।'

তখন আমার সাথে নির্দিষ্ট কারো সম্পর্ক ছিল না। তাই ইয়াসমিনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখলাম। তাকে যতোটা আক্রমণাত্মক মনে হয়েছিল, আসলে সে তা নয়। তার হিন্দু বিরোধিতা ও ভারত বিরোধিতা নিয়ে মাঝে মাঝেই তাকে খোঁচা দিতাম। ক্রমে সে আমাকে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছে। 'আমার বাবা মা শ্রীনগরে থাকতেন, যেটা বর্তমানে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে আমার পূর্ব পুরুষরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। ইসলাম বিশ্বের সেরা ধর্ম। ভারতীয় সেনাবাহিনী দখল করার পূর্ব পর্যন্ত আমার বাবা মা শ্রীনগরে ছিলেন, এরপর তারা মুজাফ্ফরাবাদে চলে আসেন। সেটি এখন আজাদ কাশ্মীরের রাজধানী। মুজাফ্ফরাবাদেই আমার জন্ম এবং পড়াশুনাও করেছি সেখানে। ভারত থেকে আগত আরেক শরণার্থীকে আমি বিয়ে করেছি। সেও কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভুত। মুসলিম হলেও আমরা আমাদের মর্যাদার চাইতে নিচের কাউকে বিয়ে করিনা। আমার স্বামী আজাদ কাশ্মীর সরকারের একজন মন্ত্রী। আমিও রাজনীতিতে সক্রিয় এবং এসেমব্লি'র সদস্য। আমাদের দু'টি সন্তান আছে।'

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সে আমেরিকায় যে স্বাধীনতা ভোগ করছে তার চাইতে তার পাকিস্তানের জীবনের পার্থক্য কোথায়?' আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর সে এড়াতে চেষ্টা করলো' আমার পীড়াপীড়িতে খানিকটা বাধ্য হয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, 'আমার পরিবার এবং আমার দেশকে আমি ভালোবাসি। আমরা এখনো হয়তো সফল হইনি। কিন্তু একদিন আমরা কাশ্মীরকে ভারতের কবল থেকে মুক্ত করবো এবং যে শ্রীনগরকে এখন শুধু ছবিতে দেখি সেই শ্রীনগরে ফিরে যাব।'

'এবং দিল্লির লাল কিল্লায় পাকিস্তানি পতাকা উড়াবো' –আমি বিদ্রূপ করলাম।

আমার দিকে হাসি ছুঁড়ে দিয়ে সে উচ্চারণ করলো, 'ইনশাল্লাহ।'

'একদিন আমরা পাকিস্তানিদের কবল থেকে তথাকথিত আজাদ কাশ্মীরকে মুক্ত করে সেটিকে আবার ভারতীয় কাশ্মীরের অংশে পরিণত করবো।'

চাঙ্গা হয়ে সে বলে উঠলো, 'তুমি আহম্মকের স্বর্গে বাস করছো। একজন মুসলিম মুজাহিদ দশজন হিন্দুকে মোকাবিলা করতে পারে।'

কৌতুকের সুরে বললাম, 'তার প্রমাণ তা গত যুদ্ধেই দেখা গেছে। মাত্র তের দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যরা অস্ত্র সমর্পণ করেছে। চুরানব্বই হাজার পাঁচশ' অমিতবিক্রম মুসলিম বীর কোন যুদ্ধ না করেই মাথা নিচু করে বিধর্মী হিন্দু ও শিখদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিশ্বের ইতিহাসে একটি পুরো সেনাবাহিনীর এমন শোচনীয় আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি নেই।'

সে প্রায় কান্নার সুরে বললো, 'এখন তুমি আমার প্রতি কঠোর হয়েছো। তোমরা ভারতীয়রা প্রতারক। তোমরা বাঙালিদের বিভ্রান্ত করে তাদের মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে

ক্ষেপিয়ে তুলেছিলে। এখন তারা তোমাদেরকেই ঘৃণা করে এবং আমাদের সাথে আবার বন্ধুত্ব করতে চায়। তুমি দেখে নিও পরবর্তী পাক-ভারত যুদ্ধে কি ঘটে ?'

উত্তপ্ত যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে আমি ও ইয়াসমিন বন্ধুতে পরিণত হলাম। তাকে আমার প্রেমিকা হিসেবে বর্ণনা করা কঠিন। কারণ আমার চাইতে বয়সে বিশ বছরেরও বেশি সে। আমার সঙ্গ কামনা করতো ইয়াসমিন। কারণ ক্যাম্পাসে তার বয়সী পুরুষ বা মহিলা খুব বেশি ছিল না। আমি বয়সে তরুণ হলেও অন্ততঃ তার অঞ্চলের মানুষ। আমার সাথে সে হিন্দুস্থানিতে কথা বলতে পারে। আমরা প্রায়ই একসাথে কফি পান করি। একদিন ইয়াসমিন আমাকে একটি দামি গোল্ড ক্রস কলম উপহার দিল। আমার কাছে বাড়তি অর্থ থাকতো না। কারণ স্টাইপেন্ডের অর্থ থেকে যা বাঁচাতে পারতাম এবং লাইব্রেরি ও ক্যাফেটরিয়ায় কাজ করে যা আয় করতাম তা বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতাম। তবুও দোকানের সামনে দিয়ে অতিক্রমের সময় লক্ষ্য করতাম উপহারের বিনিময়ে ইয়াসমিনকে কি দেয়া যায়।

কয়েক সপ্তাহ পর প্রফেসর অ্যাশবি ইসলাম সম্পর্কে বললেন। আমাদের পড়ার জন্যে বই এর দীর্ঘ তালিকা দিলেন –আরবদের বিভিন্ন ইতিহাস, নবী মোহাম্মদের জীবনী, কোরআনের অনুবাদ এবং বিভিন্ন মুসলিম শ্রেণী বা মতবাদ সম্পর্কিত নিবন্ধাদি। এসব বই পড়ার কোন আগ্রহ আমার ছিল না। আমি অপেক্ষা করছিলাম. লেকচারের পর ইয়াসমিন কি বলে তা শোনার জন্যে। সে আমাকে হতাশ করেনি।

প্রফেসর অ্যাশবির প্রথম দু'টি লেকচারের সময় ইয়াসমিন চুপচাপ শুনেছে। এসব ক্লাসে অ্যাশবি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে অবস্থা, নবী মোহাম্মদের জীবন, কোরআন নাজিল, মক্কা থেকে মদিনায় নবীর হিজরত, বিজয়ী হিসেবে তার মক্কায় প্রত্যাবর্তন, তার হাদিসসমূহ, ইসলামের বাণী দ্রুততার সাথে প্রতিবেশি দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়া, শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা করেছেন। এগুলো ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য বা বিবরণ, কিন্তু আকর্ষণীয় নয়। তার দ্বিতীয় লেকচার শেষ করার পরপর ইয়াসমিন উঠে দাঁড়ালো এবং অধৈর্য হয়ে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা শুরু করলো। সে বললো, 'ডঃ অ্যাশবি, ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাদের যা বললেন তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কিন্তু আপনি আমাদের বলেননি যে, ইসলাম এখনো কেন বিশ্বের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধর্ম। কারণ সকল ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে ইসলামি বিধান সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত –মানুষকে কি করতে হবে এবং কি করা থেকে বিরত থাকতে হবে সে সব ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে, যা সকলে অনুসরণ করতে পারে। মহান আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্যে তার বাণী শুধুমাত্র নবী মোহাম্মদ (সঃ) এর কাছে প্রেরণ করেছেন। মোহাম্মদ (সেঃ) এর মতো খাঁটি মানুষের আগমণ এ পৃথিবীতে আর হয়নি। তার মিশনের চমকপ্রদ সাফল্যের পিছনে নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে। তার ইন্তেকালের কয়েক বছরের মধ্যে ইসলাম দাবানলের মতো প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে ইউরোপে আটলান্টিকের তটরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে। অগ্নি উপাসক, ইহুদী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের সৃষ্ট সকল প্রতিবন্ধকতার

উপর বিজয়ী হয়েছে ইসলাম। অন্য ধর্মের চাইতে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে আসা লোকের সংখ্যা এতো অধিক কেন ? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ক্লাসে আলোচনা হবে বলে আমি আশা করি।'

বক্তৃতা শেষ করে ইয়াসমিন বসলো। এক নিঃশ্বাসে সে তার কথাগুলো বলেছে। একজন ছাত্র, নরম স্বভাবের ইহুদী ছেলে, যে সবসময় মাথার খুলিতে ছোট্ট টুপি পরে, সে ইয়াসমিনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো। সে বললো, 'তার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে তিনি সম্ভবত আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। তিনি কি অস্বীকার করতে পারবেন যে, ইসলাম প্রায় সবকিছুই গ্রহণ করেছে ইহুদীদের নিকট থেকে। তাদের শুভেচ্ছা জানানোর রীতি, 'সালাম আলাইকুমের উৎপত্তি হিব্রু 'শ্যালোম অ্যালেক' থেকে। তাদের দৈনিক পাঁচবার প্রার্থনার নামও নেয়া হয়েছে ইহুদীদের থেকে। আমরা জেরুসালেমের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করি, এই ধারণাও আমাদের থেকে নেয়া। পার্থক্য এটুকু যে, তারা জেরুসালেমের পরিবর্তে মক্কার দিকে ফিরে তাকায়। ইহুদী রীতি অনুসরণ করে তারা তাদের ছেলে সন্তানদের খৎনা করায়। কোন্‌টা খাওয়া যাবে, আর কোন্‌টা খাওয়া যাবে না; হালাল হারামের এই ধারণাও ইহুদী রীতি থেকে গৃহীত। আমরা ইহুদীরা শূকরের মাংস খাইনা; কারণ আমরা শূকরকে নোংরা বিবেচনা করি। মুসলমানেরাও তাই করে। প্রাণীর মাংস খাবার আগে আমরা জবাই করে রক্ত ঝরিয়ে নেই। আমাদের অনুসরণ করে তারা এই কাজটিও করে। ইহুদী ও খ্রিস্টানরা যেসব নবীকে শ্রদ্ধা করে মুসলমানরাও সেই নবীদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। তাহলে ইসলামে নতুন বলে কি আছে ? সব কিছুই তো ইহুদী ও খ্রিস্টানদের থেকে ধার করা।'

ইহুদীর সাথে লড়তে ইয়াসমিন আবার দাঁড়ালো। 'নতুন হলো, হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাব। আল্লাহ প্রেরিত সকল নবীর সেরা তিনি। এজন্যে আমরা তাকে বলি শেষ নবী –খাতামুন্নবী। নবী মোহাম্মদের পর আমরা আর কাউকে স্বীকার করি না।'

ইহুদী হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে বললো, 'তাহলে শিয়া সুন্নী বিভক্তির ব্যাপারটা কি ? শিয়ারা মোহাম্মদের চাইতে তার ভাতিজা ও জামাতা আলীর প্রতিবেশি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এছাড়া বিভিন্ন মুসলিম শ্রেণী, যা এক একজন মুসলিম ধর্মীয় নেতা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন –আগাখানী, ইসমাইলী, বোহরা, আহমদী এবং আরো আছে, যেগুলোর নাম আমি স্মরণ করতে পারছি না। আমরা যখন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তখন আমরা ভদ্রমহিলার কাছে অবশ্যই ব্যাখ্যা আশা করবো যে, ইসলাম যখন নারীর ব্যাপারে সদাচারের কথা বলে, তখন কি করে ইসলাম পুরুষকে চার স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়। বহু মুসলিম শাসক কেন মহিলা ও খোজাদের বিশাল হারেমে রাখতেন ? কেন তারা বিধর্মীদের সঙ্গে সারাক্ষণ জিহাদের কথা বলে এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

ব্যাপারটা অর্থহীন তর্কবিতর্কে গড়াচ্ছিল। প্রফেসর অ্যাশবি তর্ক থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা আরেকটি প্রাণবন্ত বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছো। সম্ভবত তোমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে ক্লাসের বাইরে আলোচনা করতে পারবে।'

ক্লাস শেষ হলো। ইয়াসমিনের মুখে রাগ ও বিজয় দু'টোরই ঝলকানি। একসাথে হাঁটার সময় সে বললো, 'তুমি কি মনে করো না যে, ইহুদীটাকে আমি তার সঠিক জায়গায় রাখতে পেরেছি?' তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমি তাকে বললাম, 'ইয়াসমিন তুমি এতো কট্টর কেন? পৃথিবীতে মুসলমানরাই সবচেয়ে গোঁড়া ধর্মীয় সম্প্রদায়। তাদের নবী সর্বশ্রেষ্ঠ, তাদের ধর্ম সর্বোত্তম, মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন, সবচেয়ে বেশি আল্লাহ ভক্ত, মানবতার ক্ষেত্রে সঠিক পথ ও পদক্ষেপ গ্রহণকারী। ইহুদীরা যদি মনে করে যে, তারাই ঈশ্বরের পছন্দনীয়; তাহলে মুসলমানরা মনে করে তারা পছন্দনীয়ের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি পছন্দের। তোমরা এতো সংকীর্ণমনা কেন?'

আমার কথায় সে হতচকিত। তারপরও বললো, 'আমরা গোঁড়া নই। আমরা ধর্মীয় অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করি এবং সে চেতনাও ধারন করি। কারণ, আমরা জানি, এসব বিধিবিধান মানবতার জন্যে সর্বোত্তম। তুমি জানোনা যে, জীবনে তুমি কি হারাচ্ছো।'

আমি উত্তর দিলাম, 'আমার অজ্ঞতা নিয়ে আমি খুশী। কোন ধর্মের ব্যাপারেই আমার তেমন ধৈর্য নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, কারো অনুভূতিকে আহত করার চেষ্টা করো না। বাকি বিষয়গুলো প্রান্তিক। ঈশ্বর, নবী, ধর্মগ্রন্থ, রীতিনীতি, তীর্থযাত্রা –এসবের তাৎপর্য আমার কাছে সামান্য।' সে কোন উত্তর দিল না।

ইয়াসমিনের প্রিন্সটন ত্যাগ করার আর মাত্র এক সপ্তাহ আছে। তাকে উপহার দেয়ার মতো মনোমত কিছু খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে প্রিন্সটনের মনোগ্রাম সম্বলিত একটি রূপার আংটি কিনলাম। একদিন সকালে কফি পানের সময় আমাদের টেবিলে যখন তৃতীয় কেউ ছিল না তখন পকেট থেকে আংটিটি বের করে তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলাম। বললাম, 'আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি শুধু সোনার অলংকার ব্যবহার করো। কিন্তু একটি সোনার আংটি কেনার সামর্থ আমার নেই। আর যেহেতু এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আংটি, এটি নিয়ে কেউ কথা বলবে না। তুমি নিজেই এটি কিনতে পারতে, আমি তোমাকে দিচ্ছি প্রিন্সটনে একজন ভারতীয় হিন্দু ছেলের সাথে তোমার দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে বলে।'

সে আমার হাতটি নিয়ে চুম্বন করলো।

তার মুখের উপর বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। 'তুমি খুব ভালো ছেলে। আমার শুধু মনে হয়, তোমার নামটা যদি মোহন কুমার না হয়ে মোহাম্মদ করিম অথবা এ ধরনের কিছু হতো' সে হাসলো। 'তোমার যতোটা মনে হয়, আমি অতো কট্টর নই। আমি শুধু তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।'

প্রিন্সটনে তার শেষ সপ্তাহের প্রতিটি দিন আমরা সাক্ষাৎ করতাম। ক্যাম্পাসের চারপাশে ঘুরাঘুরি করে অথবা কেনাকাটা করে বিকেলগুলো কাটাতাম। ইয়াসমিন তার স্বামী, সন্তানদের জন্যে এবং মুজাফফরাবাদের বাড়ির জন্যে বহুকিছু কিনলো। তার কাছে অনেক নগদ ডলার এবং ডলারের ট্রাভেলার্স চেক আছে বলে মনে হলো। তার শেষ দিবসটিও ক্রমে এসে গেল। আমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানালো ইয়াসমিন। বললো,

'তুমি কি কখনো কাশ্মিরী খাবার খেয়েছো? বিশ্বের সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার। অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমি ভালো রাঁধুনী। চমৎকার 'গোস্তাবা' রান্না করতে পারি। কখনো গোস্তাবা খেয়েছো ?'

আমি স্বীকার করলাম, কখনো খাইনি। সে বললো, 'তাহলে বলো, তুমি কি খাও না। খাবার ব্যাপারে তোমাদের হিন্দুদের বহু বাছবিচার আছে। আমি জানি, তোমরা গরুর মাংস খাওনা। কিন্তু বিশ্বাস করো, গরুর মাংস সবচেয়ে মজার মাংস। তোমাদের অনেকে শুধু নিরামিষ খায় –মাছ, এমনকি ডিমও খায় না। অনেকে পিঁয়াজ, রসুন খায় না। পিঁয়াজ, রসুন ছাড়া খাবার স্বাদ হবে কি করে ? বলতে পারো ?'

'গরুর মাংস ছাড়া আমি সবকিছুই খাই। তার কারণ এটা নয় যে, আমি গরুকে পবিত্র বিবেচনা করি। কারণ হচ্ছে, আমি গরুর মাংস না খেয়ে বড় হয়েছি। আর তোমাকে বলছি, যে শূকরের মাংস তোমরা স্পর্শও করো না, সেটিও পরিচ্ছন্ন এবং উপাদেয় হতে পারে। শূকরের মাংস এবং সেই মাংস দিয়ে তৈরি অন্যান্য খাবার অধিকাংশ ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের প্রধান খাদ্য। যে কারণে ইসলাম কোনদিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে বিস্তার লাভ করবে না বলে আমি মনে করি তার প্রধান কারণ, তাদের অর্থনীতি শূকরভিত্তিক। আমি আরো জানি, ইহুদীদের মতোই বহু মুসলিম চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি খায় না। আরব ও আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার মুসলিম উপজাতিগুলো মাছ খায় না। কারণ তারা মাছকে সমুদ্রের সাপ বলে মনে করে।'

আমার গালে মৃদু চাপড় দিয়ে সে বললো 'তুমি যুক্তিবাদী ছেলে। কাল সন্ধ্যায় যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো। আমার কাশ্মিরী খাবার চেখে দেখবে। আমি মদ পান করি না। কিন্তু তোমার জন্যে কয়েকটা বিয়ার এনে ফ্রিজে রেখে দেব।'

আমি শপথ করে বলতে পারি, ইয়াসমিনের সঙ্গে শুধু মাত্র একটি সুন্দর সন্ধ্যা কাটানোর চাইতে বেশি কিছু আমার মনের মধ্যে ছিল না। কিন্তু আমার চিন্তার মতো করে বিষয়টি গড়ালো না। তার জন্যে একগুচ্ছ টকটকে লাল গোলাপ নিয়ে গেলাম। তাকে গোলাপ গুচ্ছ দেয়ার পর সে আমার হাত চুম্বন করে অন্তরঙ্গ ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার পরনে ছিল স্পোর্টস শার্ট ও ট্রাউজার। ইয়াসমিনের পরনে সোনালি প্রান্তের রেশমি সালোয়ার কামিজ। সোনার নেকলেসে যুক্ত একটি লকেট ঝুলছে বুকের উপর। যাতে কোরআনের আয়াত উৎকীর্ণ। কানে সোনার ইয়ারিং, হাতে সোনার চুড়ি। চমৎকারভাবে সে মেকআপ করেছে এবং ফরাসি সুগন্ধি স্প্রে করেছে গায়ে। ফ্রিজে বিয়ার ছাড়াও এক বোতল স্কচ হুইস্কি এনে রেখেছিল সে। সেগুলো এনে রাখলো টেবিলে। সঙ্গে কাঁচের গ্লাস এবং পানির পাত্র। আমাকে বললো, 'তুমি হুইস্কি, বিয়ার পান করো; আমি মাগরিব নামাজটা সেরে আসি।'

ইয়াসমিন তার বেডরুমে গিয়ে ফ্লোরে তার নামাজ পড়ার মাদুর বিছালো এবং মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। আমি গ্লাসে স্কচ হুইস্কি ঢাললাম। যখন গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলাম, সে তখন মক্কার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এরপর সে হাঁটু ভাঁজ করে বসলো দীর্ঘ সময় ধরে। মুখ ডানে ও বামে ফিরালো। অতঃপর হাত দু'টি মুখের সামনে মেলে

ধরলো। যেন হাতের তালুর রেখাগুলো পাঠ করছে। আমি দেখছিলাম, তার দু'ঠোঁট নড়ছে। কিন্তু সে কি আবৃতি করছে তা শুনতে পাচ্ছিলাম না। এক সময় খোলা হাত দিয়ে মুখ মুছে সে উঠে দাঁড়ালো। মাদুরটা মুড়িয়ে বিছানার নিচে রেখে দিল।

সে কিচেনে গেল গোস্তাবা ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখতে। আগুনের আঁচ কমিয়ে দিল যাতে আস্তে রান্না হয়। এরপর সে আমার সাথে যোগ দিল। জিজ্ঞাসা করলো, 'পানীয় কেমন ?' উত্তর দিলাম, 'চমৎকার! তুমি কি একটু পান করবে ?'

'তওবা, তওবা! মদ হারাম। তুমি কি শেষ পর্যন্ত আমাকে পাপী বানাবে ? ফ্রিজ থেকে আমার জন্যে একটি কোক খুলে দিতে পারো।'

আমি কোকের একটি ক্যান বের করে আনলাম। খোলার আগে সে ক্যানটি আমার হাত থেকে নিয়ে টেবিলে রাখলো। আমার হাত দু'টি নিজের হাতে নিয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বিব্রত হয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। হঠাৎ সে দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'আজই আমাদের একসঙ্গে শেষ সন্ধ্যা। আমাকে তোমার ভালোবাসা দাও। যাতে জীবনের বাকি দিনগুলো তোমাকে স্মরণ করতে পারি।'

আমি এটুকু বলতে পারি যে, আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেই সন্ধ্যায় আমি এমনটি আশা করিনি। এছাড়া ইয়াসমিনকে কখনো আমার যৌনসঙ্গী করার কথা ভাবিনি বা আমার দৃষ্টিতে সে কাংখিত বলে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু প্রতিবাদের কোন সুযোগই দিল না সে। আমাকে টেনে নিয়ে গেল বেডরুমে। সে তার অলংকার ছাড়া সবকিছু খুলে ফেললো। তার ত্বক মসৃণ এবং তুলতুলে, তার বিরাট স্তন ঝুলে পড়েছে। সে গোপন স্থানের কেশ মুন্ডন করেছে। যেসব মেয়ের সাথে আমি শয্যায় গেছি, তাদের কেউই অবাস্থিত কেশ মুন্ডন করতো না। আমি দেখে খুবই বিস্মিত হলাম যে, বিশালদেহী এই মহিলা, যে দু'টি সন্তানের জন্ম দিয়েছে; তার যোনী এতো ক্ষুদ্র। খুব নিরীহ দর্শন মনে হচ্ছিল। আমি যখন তার শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখছিলাম সেই মুহূর্তে সে আমার শার্ট খুলে ফেলেছে এবং ট্রাউজার নামিয়ে দিয়েছে। সে আমার সঙ্গীকে দেখে রীতিমতো বিস্মিত; 'মাশাল্লাহ! তোমার ওখানে ওটা কি ? সব হিন্দুর অঙ্গ কি এই আকৃতির? তারা যে লিঙ্গ পূজা করে, এটা নিশ্চয়ই তার পুরস্কার।' সে তার মোটা হাতে আমার অঙ্গ নিয়ে খেললো। তার ঠোঁট আমার ঠোঁটে আঠার মতো লাগিয়ে রেখেছে।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সে আমাকে তার উপরে নিল এবং উরু যতোটা সম্ভব প্রসারিত করলো আমাকে স্বাগত জানানোর জন্যে। আমি তার মধ্যে প্রবেশ করলাম। তৃপ্তিতে সে গোঙাতে শুরু করেছে এবং দু'পা দিয়ে আমার কোমর বেস্টন করে রেখেছে। আমার মুখে সে কামড় এবং চুম্বন দিচ্ছিল। একসাথে আমরা চরমে উঠলাম। সে ক্লান্ত অবসন্ন ও নিস্তেজ হয়ে পড়লো। আমাকে ঠেলে নামিয়ে দিল তার উপর থেকে এবং বাথরুমে গেল। ফিরে এল কামিজ পরে। 'ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই আমার গোস্তাবা হয়ে গেছে। বেশি পাকালে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি ধুয়ে এসো। আমি টেবিলে ডিনার সাজিয়ে দিচ্ছি।'

সে যা বললো, আমি তাই করলাম। পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়ার উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতার মতো সে। আমরা খেতে বসলাম। লক্ষ্য করলাম, সে সালোয়ার

পরেনি। হাঁটুর কাছে তার কামিজ ঝুলে আছে। যখন সে উঠছিল বা বসছিল তার প্রশস্ত উরু পুরোপুরিই প্রকাশ পাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলাম তার শারীরিক চাহিদা পূরণ হয়নি এবং ডিনার শেষে আরেক দফা আকাংখা করছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে, এরই মধ্যে আমি তার সাথে পেরে উঠবো কিনা। ভাবনাহীন সৌজন্যের মতো আমি তার আহবানে সাড়া দেয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখলাম। যে যখন বাসনকোসন পরিস্কার করছিল, আমি শুকনো কাপড়ের টুকরা দিয়ে সেগুলো মুছে রাখছিলাম। আমি ডান হাত তার কামিজের নিচে গলিয়ে তার বিশাল নিতম্বে চাপ দিলাম। যেন দু'টি তানপুরার লাউ একত্রে যুক্ত করা হয়েছে– বিশাল, গোলাকৃতির এবং সুমসৃণ। সে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসলো এবং আমার ঠোটে চুমু দিল। 'তুমি দ্বিতীয় দফা এটা করতে চাও ? আমিও চাই। এবার ভিন্নভাবে কাজটা করবো।' ভিন্নভাবেই হলো।

কিছু সময় আমরা হাত ধরে বসে কথা বললাম। সে মুজাফফরাবাদে তার প্রতিদিনের কাজের ফিরিস্তি দিল। 'যেহেতু আমি এবং আমার স্বামী রাজনীতিতে জড়িত, সেজন্যে আমাদের নিজের সময় বলে কিছু নেই। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মানুষের যেন দরবার থাকে। যেখানে যাই লোকজন আমাদের ঘিরে রাখে। তাদের আবেদনপত্র দেয়। আমার এখানে কাটানোটা ছিল অবকাশ যাপনের মতো। আমি আরো কিছুদিন থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার মঞ্জুরী শেষ হয়ে গেছে এবং আমার পরিবার জানতে চাইবে যে করাচিগামী প্রথম ফ্লাইটেই আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি না কেন ?'

সে দাঁড়িয়ে উপর দিকে হাত উঠিয়ে হাই তুললো। আমার হাত ধরে টানতে টানতে বললো, 'এখন শোয়ার সময়।' বিছানায় ঠেলে দিয়ে বললো, 'এবার তুমি শুয়ে আরাম করো। পুরো কাজটা আমিই করবো।'

আমার ট্রাউজার টান দিয়ে খুলে ফেলে কাজের জন্যে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত সে আমার সঙ্গীকে নিয়ে খেললো। আমার দেহের মধ্যবর্তী স্থানে উঠে বসলো। তার বিশাল দেহ আমার উপর ছড়িয়ে দিয়ে আমার উত্থিত অঙ্গ তার মাঝে গ্রহণ করলো। সে সিক্ত এবং আগ্রহী ছিল; অতএব খুব সহজে সেটি তার দেহে লীন হলো। তার বিশাল স্তন যুগল আমার মুখ আচ্ছাদন করে ফেলেছে। সে একটা একটা করে বোটা আমার মুখে পুরে দিয়ে চোষার জন্যে মিনতি করছিল। ক্ষুধার্তের মতো চুম্বন করছিল আমার মুখে নাকে ও গলায়। তার লালায় আমার সারা মুখ, গলা ভিজে গেছে। সে যখন চরমে উঠছে, তখন তার গুরু নিতম্বের ভার আমার উপর আছড়ে পড়ছে। তার উত্থান পতনে যখন চরম উন্মাদনা তখন সে বললো, 'ছ'মাস ধরে আমি ক্ষুধার্ত। বলতে পারো ক্ষুধায় মৃত প্রায়। তোমার যা আছে তার সবটা দিয়ে আমাকে পূর্ণ করো হে ঘৃণ্য কাফির।' অতপর দর্শনীয় একটি ঝাঁকুনি দিয়ে আর্ত চিৎকার করে মৃতদেহের মতো আমার উপর আপতিত হলো। বাস্তবিকপক্ষে পুরো কাজটি সেই করলো। আমি শুধু তার দ্বারা ব্যবহৃত হলাম।

কিছুক্ষণ পর সে বললো, 'একে অন্যকে গালিগালাজ এবং পরস্পর যুদ্ধ করার চাইতে আমরা যদি এভাবে পাক-ভারত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি তাহলে কি ব্যাপারটা শোভন হয় না ?'

আমি উত্তর দিলাম, 'নিশ্চয়ই এবং পাকিস্তানকে সবসময় উপরে রেখে?'

'অবশ্যই! পাকিস্তানকে সবসময় উপরেই থাকতে হবে।'

আমি ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং এখান থেকে কেটে পড়তে চাইছিলাম। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বিনয়ের সাথে মিনতি করলো, 'দয়া করে আজ রাতটা আমার সাথে থাকো। তুমি চলে গেলে নিজেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত মনে হবে। কথা দিচ্ছি, তোমাকে আর বিরক্ত করবো না।'

তার সাথে রাত কাটাতে এবং সকালে তাকে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে বিদায় জানাতে সম্মত হলাম। তাকে কয়েকটি বিব্রতকর প্রশ্ন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলাম না। 'তোমাকে বলতেই হবে যে, তুমি এবং আমি যা করছি তার সাথে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি তোমার বিশ্বাসকে তুমি কিভাবে মিলাবে ?'

বেশ খানিকটা সময় সে চুপ করে থেকে তার বড় বড় চোখ আমার উপর নিবদ্ধ করে স্বীকার করলো, 'আমি যা করেছি তা পাপ।'

'এ ধরনের পাপের শাস্তি প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যু অথবা শিরচ্ছেদ ?'

'তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু শরীয়তের আইনে ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণের জন্যে দু'জন মুসলিম প্রত্যক্ষদর্শীর প্রয়োজন। আমার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ কেউ প্রমাণ করতে পারবেনা। তুমি যেহেতু মুসলিম নও, তোমার সাক্ষ্য শরীয়তের আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে না।'

'শুধু এটাই কি তুমি সবসময় মনে করছো? তোমার বিবেকের কোন তাড়নাই কি থাকবে না ?'

'মানুষের দেহের কিছু বাধ্যবাধকতা আছে যা আল্লাহ অবশ্যই বোঝেন। তিনি রহিম (ক্ষমাশীল) এবং রহমান (করুণাময়)। তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। দেশে ফেরার পথে আমি মক্কায় উমরাহ পালন এবং মদিনায় নবী মোহাম্মদ (সঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারত করবো।'

'উমরাহ ? সেটি আবার কি ?'

'উমরাহ মানে মক্কায় গিয়ে পবিত্র কাবাঘরের চারদিকে তাওয়াফ অর্থাৎ পরিভ্রমণ করা, বলা যায়, ছোট হজ্জ। হজ্জ পালন করা হয় বছরে একবার। উমরাহ যখন সম্ভব, তখনই করা যায়। আমি সেখানে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।'

'এবং তাতে তোমার সমস্ত পাপ বিলীন হয়ে যাবে ? ঠিক হিন্দুরা পবিত্র গঙ্গায় ডুব দিলে যেমন পাপ মুক্তি ঘটে ?'

সে রেগে আপত্তি করলো, 'দয়া করে মুখটা বন্ধ রাখো। তোমার সাথে আমার শেষ রাতটা এভাবে বরবাদ করে দিও না।'

সে আমার ডান হাতের উপর মাথা স্থাপন করে আমার শরীরের সাথে লেগে রইলো। 'আমার ক্ষমা লাভের একটি সহজ পথ আছে। আমি যদি কোন বিধর্মীকে ইসলামে দীক্ষিত করতে পারি তাহলে আমার সকল পাপ মোচন হয়ে যাবে।'

'তাই নাকি? তাহলে আরেকজন হিন্দু খুঁজে বের করো এবং তাকে ইসলামে দাখিল করো। আমাকে নয়।' আমরা একে অন্যের বাহুতে মাথা রেখে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লাম।

ইয়াসমিন কখন বিছানা ছেড়ে গেছে আমি টের পাইনি। যখন আমার ঘুম ভাঙ্গলো, দেখলাম সে বিছানার পাশে মাদুর বিছিয়ে তার সকালের নামাজ পড়ছে। আমার ঘুমের সামান্যতম ব্যাঘাত না ঘটিয়েই সে স্নান করেছে, কাপড় পড়েছে। তার প্রার্থনায় বাধা দিলাম না। স্নান করতে বাথরুমে গেলাম। আমি রাত্রি যাপনের প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি। অতএব তার ভেজা ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলাম। সে তার যৌনকেশ নির্মূলে যে রেজর ব্যবহার করেছিল সেটা দিয়ে শেভ করলাম। বাথরুম থেকে বের হয়ে আসার সময়ের মধ্যেই সে নামাজ সেরে টেবিলে নাশতা দিয়েছে। অ্যাপার্টমেন্টে কফির সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ইয়াসমিনকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরলাম। দীর্ঘ সময় এভাবে থাকার পর যখন আলিঙ্গন মুক্ত হলো, দেখলাম তার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে। নিরবে টোস্ট খেলাম এবং কফি পান করলাম। সে আমাকে বললো একটি ট্যাক্সির জন্যে ফোন করতে এবং আমার কাছে অ্যাপার্টমেন্টের চাবি দিল কেয়ারটেকারকে দেয়ার জন্যে। আমি তার সাথে নিউইয়র্ক এবং জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার আগ্রহ দেখালে সে দৃঢ়ভাবে আমার প্রস্তাব নাকচ করে দিল। বললো, 'পাকিস্তান কনস্যুলেট থেকে কেউ বাস টার্মিনালে উপস্থিত থাকবে এবং সেখান থেকে আমাকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবে। পত্রপত্রিকায় আমার ছবি এবং মাঝে মাঝে টিভিতে দেখার কারণে বহু পাকিস্তানি আমাকে চেনে। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের কিছু স্টাফ তো অবশ্যই আমাকে চিনবে। সেজন্যে একজন ভারতীয় হিন্দু কর্তৃক বিদায় জানানোর ধারণাটা ভালো হবে না।'

আমি তার সুটকেস নিচে নিয়ে গেলাম। আরো কয়েকটা ব্যাগ ছিল। ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। গাড়ির বুটে মালপত্রগুলো রাখতে ড্রাইভার আমাকে সহযোগিতা করলো। দু'জন পিছনের সিটে বসে ড্রাইভারকে বললাম, 'নিউইয়র্কগামী বাসস্ট্যাণ্ড নিয়ে চলো।' ইয়াসমিন আমাকে তার হাত ধরে রাখতে দিল। পরস্পরকে বলার মতো আর কোন কথা ছিল না আমাদের।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে ট্যাক্সি ভাড়া দিলাম। পাঁচ মিনিট পর নিউইয়র্কগামী বাস এসে দাঁড়ালো। বাসের পিছনের দিকে মালগুলো তুলে দিলাম। কে আমাকে দেখছে তার তোয়াক্কা না করে আমরা আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম এবং উন্মত্ত আবেগে তার ঠোটে চুম্বন করলাম। চুল ঠিক করতে করতে সে তড়িঘড়ি বাসে উঠে গেল। আসনে বসলো সে। আমরা দিকে আর তাকালো না কিংবা হাতও নাড়লো না। আমি দেখলাম, সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকেছে।

এরপর ইয়াসমিন ওয়ানচোর সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি।

মলি গোমেজ

আমার ভুবনে আমি আবার একা। বাবুর্চি এক বৃদ্ধা জমাদারনী খুঁজে আনলো। এক চোখ বিশিষ্ট বিধবা। সে বাথরুম ও ফ্লোর পরিষ্কার করবে। আমাকে আরেকজন সাময়িক সঙ্গিনী সংগ্রহ করতে হবে। আমি এক গুচ্ছ চিঠি ও মহিলাদের ছবি বের করলাম, যারা সাময়িক রক্ষিতা হওয়ার ব্যাপারে আমার প্রস্তাবে আগ্রহ দেখিয়েছে।

ছবিগুলো এবং চিঠি বারবার দেখছিলাম। আসলে আমি কি খুঁজছি? সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নিঃসন্দেহে যৌনকর্ম। এ ব্যাপারে আমার ক্ষুধার কোন শেষ আছে বলে মনে করি না। এখন দিনে একবার যৌনকর্ম আমার জন্যে যথেষ্ট নয়। যারাই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছে, সন্দেহ সেই, তারা আমার সাথে শয্যায় মিলিত হতে অনেক বেশি আগ্রহী। আমি কামনাপূর্ণ দৈহিক লেনদেনে বিশ্বাসী। খোলামেলা এবং দিনের বেলায়, চাঁদের আলোতে, তারকার উজ্জ্বলতায়, আর কি? যাকে শয্যায় চাই, তাকে হতে হবে উৎফুল্ল, বাচাল হলে চলবে না। আমার চাইতেও সব উদ্যোগে তার ভূমিকা বেশি থাকতে হবে। তাছাড়া আমার উপর মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে পারবে না সে মহিলা। আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, জীবনযাত্রার উত্তম বিষয়গুলোতে তার আগ্রহ থাকতে হবে– ভালো খাবার, পুরনো সেরা মদ, সঙ্গীত এবং শিল্পের প্রতি। যেহেতু আমি বেশি পড়াশুনা করি না, সেজন্যে সাহিত্য নিয়ে সে পড়ে থাকুক তা আমি চাইবো না।

সবগুলো ছবি পরীক্ষা করে আমি গোয়া থেকে পাঠানো মলি গোমেজের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। আমার ছবি পাঠানোর পর সে দ্বিতীয় চিঠি লিখেছে, যার ফলে আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়েছে। মলি গোমেজ লিখেছে ঃ

"হাই হ্যাণ্ডসাম ? আমি মলি গোমেজ পুনরায় আপনাকে লিখছি। আপনি আমার ব্যাপারে আরো জানতে চেয়েছেন। সেজন্যেই লিখছি। আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন নার্স, ফিজিওথেরাপিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আংশিক প্যারালাইসিস বা কোন একটি অঙ্গের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের আমি মালিশের মাধ্যমে চিকিৎসা করি। পর্যটন মওসুমে ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে আমার বেশ চাহিদা। এক বিদেশীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। কোন কিছুতেই সে ভালো ছিল না। সে চাইতো, প্রতিদিন আমি তাকে মালিশ করি। অতএব কিছুদিন পরই আমি তাকে বর্জন করেছি। জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং যে ব্যক্তি কোন কিছুতেই ভালো নয়, তার সাথে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। আপনি কি আমার সাথে একমত নন? আমি কনকানি, ইংরেজী ও পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলতে পারি। আমার হিন্দি অতোটা ভালো নয়। যদিও আমি একজন ক্যাথলিক, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে

আমার তেমন সংশ্লিষ্টতা নেই। আমি চার্চে যাই শুধু আমার বাবা মা ও আত্মীয়দের সন্তুষ্ট করতে। তাদেরকে বলি, সকল ধর্মই মানুষকে ভালো ও সৎ থাকতে বলে। অতএব খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলিম বা পার্সি হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? আমি ভালো রান্নাও করতে পারি– গোয়ার মশল্লাযুক্ত তরকারি; চিংড়ি, কাঁকড়া, মাছও রাঁধতে জানি। আমি সঙ্গীত ও নৃত্য পছন্দ করি। সদা হাসিখুশী থাকতে চেষ্টা করি। আমার সঙ্গ আপনার ভালো লাগবে বলে আশা করি। আমার সম্পর্কে যদি আরো কিছু জানতে চান তাহলে জানাতে দ্বিধা করবেন না।

আপনার ভালোবাসার প্রার্থী
মলি

তার ছবি দেখেই ধারণা করতে পারি, সে বেঁটে, মোটা ও কালো। তার বিস্তৃত হাসিতে মুক্তার মতো ঝকঝকে এক পাটি দাঁত দেয়া যাচ্ছে। কালো কোঁকড়ানো চুলে একটি লাল জবা ফুল গোঁজা।

আপন মনে বললাম, 'মন্দ কি ?' এবং মলি গোমেজকে আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখলাম। চিঠির সাথে গোয়া-দিল্লি-গোয়া রুটের একটি ওপেন এয়ার টিকেট পাঠালাম এবং পরামর্শ দিলাম যে, ব্যস্ত পর্যটন মওসুম শেষ হওয়া মাত্র সে আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারে। জানুয়ারির শেষ দিকে ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে গোয়ায় আগত পর্যটকেরা বিদায় নিতে শুরু করে। শ্বেতাঙ্গদের জন্যে গোয়ার আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে জানুয়ারি বিদায় নিচ্ছে। বসন্তকে পথ করে দিচ্ছে শীত এবং দিল্লি বর্ণিল হয়ে উঠেছে বসন্তের আগমণে। উপভোগ্য ঠান্ডা, প্রতিটি পার্ক ও উদ্যানে, দিল্লিতে ঘুরে বেড়াবার প্রতিটি স্থানের গাছপালায় ফুল ফোটার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সহজ এবং জটিলতামুক্ত সম্পর্ক শুরু করার উপযুক্ত সময় এটা।

মলি কোন সময় নষ্ট করলো না। আমার চিঠি ডাকে দেয়ার তিনদিন পর টেলিগ্রামে তার উত্তর এলো, ১ ফেব্রুয়ারি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৮০৪ এ দিল্লি পৌছাবো। এয়ারপোর্ট আসবেন। ভালোবাসাসহ মলি।"

আমি চাকরদের সাথে কথা বললাম। 'গোয়া থেকে একজন লেডি ডাক্তার আসছেন। কয়েক সপ্তাহ আমার সাথে থাকবেন। তিনি হিন্দুস্থানি বলতে পারেন না। আমি অফিসে চলে গেলে তার প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। অন্য চাকরদের সাথে তাকে নিয়ে কোন কানাকানি চলবে না। ইতোমধ্যে তারা তাদের মনিবের যৌবনের চাহিদা সম্পর্কে অধিকতর সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে এবং সরোজিনী সম্পর্কে দায়িত্বহীন আলোচনার কারণে তারা অনুতপ্ত। গেস্টরুম গোছানো হলে বালিশের নিচে দশ হাজার রুপি ভর্তি একটি খাম রেখে রুম তালাবদ্ধ করলাম। আয়োজন সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে আমি আমার অতিথিকে তুলে আনার জন্যে এয়ারপোর্টে গেলাম।

গোয়া থেকে ফ্লাইট যথাসময়ে পৌছলো। অ্যারাইভাল গেটে যাত্রীদের ভিড়ের দিকে লক্ষ্য করলাম। তারা হ্যাণ্ড ট্রলি নিয়ে লাগেজ কনভেয়ার বেল্টের সামনে অবস্থান নিয়েছে। মলি

গোমেজকে চিনতে কোন অসুবিধা হলো না। ছবিতে যেমন দেখা গেছে, পুরোপুরিই মিল আছে চেহারার। বেঁটে, মোটা, পেশীবহুল, ত্বকের রং দারুচিনির রং এর মতো। তার পরনে লাল টি শার্ট, নীল ডোনিম এবং কাঁধে ঝুলছে একটি বড় ব্যাগ। অপেক্ষমান ভিড়ের দিকে চোখ ফেললো সে। আমাকে সনাক্ত করতে পারেনি। তাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়লাম না, তাতে সে বিভ্রান্ত হতে পারে।

কনভেয়ার বেল্ট ঘুরতে শুরু করেছে। একটির পর একটি সুটকেস, হোল্ডঅল, কাঠের বাক্স এগিয়ে আসতেই মালিক তা নিয়ে নিচ্ছে। আমি মলিকে লক্ষ্য করলাম দু'টি সুটকেস ট্রলিতে তুলতে। ব্যাগেজ টিকেট বিমানবন্দর কর্মকর্তার হাতে দেয়ার পর আমি এগিয়ে গেলাম ট্রলিটা নেয়ার জন্যে। সে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, 'হাই, আপনি এখানে। আমি তো ভয় পেয়েছিলাম যে, আমাকে রিসিভ করতে আসবেন না। আমরা কোথায় যাবো ?

'দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই। তুমি নিরাপদ স্থানে এসে পড়েছো।' হাত মিলিয়ে আমি বললাম, 'মোহন কুমার তোমার সেবায় নিয়োজিত।' তার থাবা শক্ত। পেশাদার মালিশকারিনীর হাত এমন হওয়াই স্বাভাবিক।

'আপনি ছাড়া আর কে হতে পারে। আপনি ছবির ঠিক অনুরূপ। দীর্ঘ এবং হ্যান্ডসাম।'

'ধন্যবাদ।'

ক্যাব চালকদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলাম। পার্কিং লটে গিয়ে গাড়ির বুটে মলি গোমেজের সুটকেট রাখলাম এবং তার জন্যে সামনের দরজা খুলে ধরলাম। আমি বসলাম ড্রাইভিং সিটে।

'আপনি কি আমাকে চুমু দেবেন না ?' সে বললো।

'নিশ্চয়ই।' ঝুঁকে পড়ে মলিকে চুম্বন করলাম। গালের উপর মৃদু চাপড় দিয়ে বললাম, 'এজন্যে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।'

গাড়ির কাঁচ উঠিয়ে দিয়ে সে বললো, 'দিল্লিতে বেশ ঠাণ্ডা। গোয়ার মানুষের কাছে দিল্লি আর্কটিক এলাকা মনে হবে।'

আমিও কাঁচ তুলে দিলাম। সে চারদিকের দৃশ্য দেখছে। 'গোয়ার চাইতেও সবুজ, মলির মন্তব্য। 'আমাদের ওখানে শুধু ধূসর পাথর, বুনো কাঠবাদামের বিশাল গাছ। তাল ও নারকেল গাছ। ঘাস নেই বললেই চলে। আমার ধারণার চাইতেও বেশি গাছ, ঝোপঝাড় এখানে।' আমি একটু ঘোরাপথে বাড়ি পৌঁছার কথা ভাবছি, যাতে মলি রাস্তার দু'পাশে ফুলের শোভা দেখতে পায়। সে বললো, 'সত্যি চমৎকার। আমার বিশ্বাস, এই নগরীকে আমি ভালোবাসবো। আপনার বাগানে কি ফুল আছে ?'

খুব বেশি নেই। বাড়ির সামনে বাগান, চারপাশে কিছু ঝোপ, কয়েকটি পাইন গাছ। আমি বাগানের পরিচর্যা করার মতো সময় পাইনা। একটি লোক সপ্তাহে একদিন এসে ঘাস কেটে সমান করে দেয় এবং গাছে পানি দেয়।

আমরা দিল্লি–মথুরা রোডে উঠলাম। পাশাপাশি রাস্তায় তিনটি গাড়ি চলছে। এছাড়া অনেক গাড়ি, স্কুটার। ট্রাফিক সিগন্যালে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। গাড়ির ধোঁয়ায় বাতাস

ভারি হয়ে উঠছে। সে বললো, 'অস্বস্তিকর এই শব্দ ও দূষিত বাতাসের মধ্যে কি করে বসবাস করেন ?' হঠাৎ করেই নগরী তার পছন্দের বাইরে চলে গেল।

'আমরা এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। দিল্লির কোন কোন এলাকার অবস্থা এর চাইতেও খারাপ।' আশ্রমের মোড় থেকে আমি মহারানীবাগের রাস্তা ধরলাম। এখানে শব্দ কম, গাড়ির সংখ্যাও কম। দু'পাশে বাগানসহ বড় বড় বাংলো। বাড়ির গেটে পৌঁছে মলি গোমেজকে বললাম, 'মনে রেখো, চাকরদের কাছে তুমি ডক্টর গোমেজ এবং তাদের সামনে কোন চুম্বন, জড়াজড়ি নয়।'

স্যালিউট দেয়ার ভঙ্গিতে সে বললো, 'ইয়েস, বস! এখন থেকে আমি গোয়া থেকে আগত সম্মানিত লেডি ডক্টর। আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বের সেরা ছলনাকারী।'

'হ্যাঁ, তুমি যথার্থ বলেছো।' আমি জানি যে, এই ছোট্ট বাচালকে আমি ভালোবাসতে যাচ্ছি।

চাকররা আমাদের অপেক্ষায় ছিল। তারা লোহার গেট খুলে গাড়ি প্রবেশ করতে দিল। মলি গোমেজকে বাবুর্চি ও বেয়ারারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। দু'জনের সাথেই সে হাত মিলিয়ে ইয়াংকিদের উচ্চারণে বললো, 'তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি আনন্দিত।' তারা মলির সুটকেস গেস্টরুমে নিয়ে গেল এবং সে আমার সাথে দোতলায় এলো। তাকে ঘুরিয়ে তার রুমে নিয়ে গেলাম। একটি ইলেকট্রিক হিটার লাল হয়ে জ্বলছে। রুমটা বেশ উষ্ণ। বিছানায় অতিরিক্ত কম্বল দেয়া হয়েছে।

'তুমি কাপড়-চোপড় পাল্টে বিশ্রাম নাও। স্নান করতে চাইলে বাথরুমে গরম পানির ব্যবস্থা আছে। আমি অফিসের কিছু কাজ দেখবো।' নিচে পাঠকক্ষে গিয়ে অফিসে আমার সেক্রেটারী বিমলা শর্মাকে ফোন করে বিকেলে কি কি কাজ হয়েছে তা জানাতে বললাম এবং সন্ধ্যায় বাসায় চিঠি পাঠাতে নিষেধ করলাম। আগামীকাল সেগুলো দেখবো।

ড্রয়িং রুমে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালানো হয়েছে। পাথুরে কয়লা ও গোল করে লাকড়ির স্তূপ সাজানো। হুইস্কি দেয়া হয়েছে। স্টেরিওটা চালিয়ে দিলাম। এর চাইতে সুন্দর সন্ধ্যা আর কি হতে পারে। মলিকে দেখতে গেলাম। তার রুমের দরজা বন্ধ। নিচ তলায় গিয়ে আবার যখন উপরে ফিরে এলাম তখন তাকে মৃদু কণ্ঠে গান গাইতে শুনলাম। একটি জনপ্রিয় হিন্দি গান–

'জব জব বাহার আয়ে
আউর ফুল মুসকুরায়ে
মুঝে তুম ইয়াদ আয়ে।"

"যখনই বসন্তের আগমণ ঘটে
এবং ফুল হাসতে থাকে
তখন তোমাকে আমার মনে পড়ে।"

খুব সুন্দর গান, যদিও সে ভালো করে গাইতে পারছে না। কিন্তু নিজেকে উপভোগ করছে সে এবং তাতে আমিও উষ্ণ ও তৃপ্ত। সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে ছ'টায় সে ড্রয়িং রুমে

আমার সাথে যোগ দিল। সোনালি ও হলুদ রং এর মিশেল দেয়া ব্লাউজ গায়ে এবং দীর্ঘ ধূসর স্কার্ট। গলায় মুক্তার নেকলেস। মুক্তা বসানো কানের দুল এবং ডান পায়ের গোড়ালিতে হালকা সোনার চেন। তার হাতে দু'টি বোতল এবং কাজু বাদামের বড় একটি প্যাকেট। সে বললো; এগুলো আপনার জন্যে। গোয়ার চোলাই করা সর্বোত্তম মদ। আমার বাবা বাড়িতেই চোলাই করেছেন। আপনার কি ভালো লাগবে।'

'সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। এখন বলো, তুমি কি পান করবে ? হুইস্কি, বিয়ার, জিন, শেরি অথবা মদ ?'

'এতোসব আপনার ভান্ডারে? আমি দেখতে পাচ্ছি, আপত্তি বিত্তবান মানুষ। কিন্তু আমার বালিশের নিচে রুপিভর্তি প্যাকেটটা কি করছে ?'

'আমাকে বিত্তবান বলা যায় না। বলতে পারো সচ্ছল। শর্ত অনুসারে আমার পক্ষ থেকে অগ্রিম ভাতা।'

'ব্যাপারটাকে এতোটা ব্যবসায়িক করে ফেলবেন না। আপনার কাছে এসেছি রোমান্সের জন্যে, যা আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। অর্থের জন্যে নয়।'

'তুমি দু'টোই পাবে।' গালে আদর করে বললাম। 'এখন বলো, তুমি কি পান করবে?'

'আপনি যা পান করবেন, আমিও তাই করবো।'

'আমি দু'টো বড় গ্লাসে হুইস্কি ঢাললাম। সোডা ও বরফ মিশালাম। এবং একটি মলির হাতে তুলে দিলাম। সে ফায়ার প্লেসের পাশের চেয়ারে বসলো।

'এখন আমাকে বলো, জীবিকার জন্যে তুমি কি কাজ করো?'

'চিঠিতেই তো আমি লিখেছি যে, আমি একজন অঙ্গ সংবাহক অর্থাৎ পেশাদার মালিশকারিনী। পর্যটন মওসুমে আমি দিনে অন্তত এক ডজন লোকের শরীর মালিশ করি। আমরা স্বাভাবিক ফি একশ পঞ্চাশ রুপির অতিরিক্ত ভালো বখশিশ পাই। তা দিয়ে বাড়িতে সাহায্য করি।'

'তুমি কি শুধু মহিলাদের মালিশ করো, নাকি পুরুষদেরকে ও ?'

'অধিকাংশই মহিলা। কখনো কখনো বৃদ্ধ লোকদের। তরুণদের মালিশ করার প্রস্তাব এড়িয়ে চলি। কারণ তাদের মাথায় নানা চিন্তা আসে এবং আমার সাথে স্বাধীন আচরণ করতে চেষ্টা করে। আমি তাদের বাধা দিয়ে বলি, 'মিস্টার, এটা ব্যাংকক বা টোকিও নয়; যেখানে তুমি মেয়েদের দিয়ে মালিশ করিয়ে নেবে, আবার সঙ্গমও করবে।' বৃদ্ধদের মালিশ করতে কিছু মনে করি না। কখনো অবশ্য এমন হয় যে, কোন বুড়ো আমার হাতটা ধরে তার করুণ দর্শন প্রাচীন অঙ্গটা ধরিয়ে দেয়। আমি বলি 'তুমি কি চাও, আমি এটাও মালিশ করি। এর মধ্যে তো আর জীবন নেই।' অতপর আমি নুয়ে পড়া অঙ্গটায় ঝাঁকি দিয়ে তাকে দেখিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করি যে আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি।' সে হেসে যোগ করে, 'অনেকে আমাকে অনুনয় করে, 'আর একটু ডলে দাও, তাহলেই এটা জীবন্ত হয়ে উঠবে।' আমি তাদের বলি 'আমি একটি রাজ্যের অভ্যুদয় পর্যন্ত এটিকে ঝাকাতে পারি। কিন্তু তাতেও এর কিছু হবে না।' তারা এমন করুণভাবে আমার দিকে তাকায় যেন আমি তাদের দাঁতে লাথি মেরেছি। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, একই বৃদ্ধ

বারবার তাদের মালিশ করার অনুরোধ করে। একই ধরনের আচরণ করে এবং মোটা অংকের বখশিশ দেয়।'

'আমার সাথে তোমার সে ধরনের কোন সমস্যা হবে না।'

'আমিও তা আশা করি না। অমন হলে আমি পরের প্লেনেই বাড়ি ফিরে যাব।' সে আমাকে জেসিকা ব্রাউনির কথা মনে করিয়ে দিল। কোন কিছু নিয়ে ঝুলে থাকার প্রবণতা নেই।

ডক্টর গোমেজের সম্মানে আমার মগ বাবুর্চি গোয়ার চিংড়ি ভূনা ও ভাত রান্না করেছে। আমি সাদা মদের বোতল খুললাম। ফায়ার প্লেসের পাশে বসে ডিনার সারলাম। মলি বাবুর্চিকে ধন্যবাদ জানাল, 'আমার বাড়ির চাইতে ও উত্তম গোয়ার খাবার।' মগ বাবুর্চি খুশী হলো। ক্যারামেল কাস্টার্ডের পর কফি এলো। বেয়ারার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে গেল। চাকররা চলে গেলে আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। বাগানে গিয়ে ঝোপের উপর প্রস্রাব করলাম। বেশ ঠান্ডা, আমি কাঁপতে শুরু করেছি। দ্রুত ভিতরে ফায়ার প্লেসের কাছে গেলাম। আরো কয়েকটি কাঠের টুকরো ঠেলে দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার হাত গরম করা প্রয়োজন।

সে জিজ্ঞাসা করলো, 'ডিনারের পর আপনি কি করেন?'

'সাধারণত একটি চুরুট টানি। এরপর বিছানায় যাই। কিন্তু আজ রাতে তা করবো না।'

'বেডরুমের চাইতে এখানে কি চমৎকার। আরামদায়ক। আগুন না নেভা পর্যন্ত এখানেই থাকা যাক।'

'তোমার যেমন ভালো লাগে। আগুন নিভতে অনেকক্ষণ লাগবে।'

আমাদের কথা ফুরিয়ে আসছিল। মলি চেয়ার থেকে উঠে আমার পাশে এলো। কোন কথা না বলে মাথার উপর দিয়ে টিশার্ট খুলে ফেললো এবং ব্রা'র হুকও খুললো। দু'টি সুন্দর গোলাকৃতির স্তন দৃশ্যমান। তার দু'হাত আমার কাঁধে এবং মুখটা কাছে আনলো। আমার ঠোট তার মুখে আঠার মতো লাগিয়ে আমার উষ্ণ দু'হাতে স্তন মর্দন শুরু করলাম। সে তার স্কার্ট খুলে ফেলায় সেটি ফ্লোরে পতিত হলো। এরপর আমার বেল্ট খুলে ট্রাউজার টেনে নামালো। এখন সে আমার অঙ্গ অনুভব করছে এবং অন্যান্য মহিলার মতো সেও বিস্ময় ও আতংক প্রকাশ করলো, 'আমি আগে এর চাইতে বড় আকৃতির কিছু দেখিনি। বিশ্বাস করুন, আমি দেখেছিও খুব সংখ্যক।'

এই মহিলা আমার মধ্যে প্রচুর আস্থার জন্ম দিল। আমার কোন তাড়া নেই। আমরা কার্পেটে শুয়ে পরস্পর জড়াজড়ি ও মর্দন করলাম। নিশ্চিতই সে দক্ষ মালিশকারিনী। আমার কানের কাছ দিয়ে বিলি কেটে সে আমার ঘাড়ে বৃদ্ধাঙ্গুলির চাপ দিল। পেটের উপর দিয়ে আঙ্গুল চালনা করলো। একইভাবে মালিশ করলো আমার মধ্যাঙ্গ, উরু,হাঁটুর নিচের অংশ এবং পায়ের পাতা পর্যন্ত। পায়ের গোড়ালিও মর্দন করলো সে। আমার দেহের কোন অংশই তার স্পর্শহীন থাকলো না। তার স্পর্শ অবসাদ এনে দেয়ার মতো এবং যথার্থই উপভোগ্য।

আমি বিড়বিড় করলাম, 'তুমি এমন মালিশ অব্যাহত রাখলে আমার ঘুম এসে যাবে।' সে আমার উপরে এলো এবং আবেগ ভরে চুম্বন দিয়ে বললো, 'প্রিয়তম, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি তোমাকে পুরোপুরি ভালোবাসবো।'

বাস্তবিক দীর্ঘক্ষণের চেষ্টা ছাড়াই সে আমার অঙ্গ তার মাঝে নিয়ে নিল। আমার উপর মলি গোমেজের উত্থান পতন এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে শুষে নেয়ার প্রক্রিয়ায় শুধু টের পেলাম যে, আমরা জেগে আছি। অনুভূতিটা চমৎকার। প্রক্রিয়াটা দীর্ঘস্থায়ী। সংযুক্ত অবস্থায় আমরা একে অন্যের উপর উঠেছি। আমার আগে সে এক ঘন্টা টিকে ছিল। নিচে আসার পর শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কি প্রস্তুত ?'

মাথা নেড়ে সে উত্তর দিয়েছিল, 'আমি অনেক আগে থেকে প্রস্তুত।'

আমি তার মধ্যে বীর্য নিক্ষেপ শুরু করি। দু'পা দিয়ে আমার কোমর পেঁচিয়ে ধরে সে এবং আমার প্রতিবারের পতনের সময় সে নিজেকে উচুঁ করতে চেষ্টা করে। সে চেঁচিয়ে বলে, 'আরো জোরে। ঈশ্বরের দোহাই, থেমো না।' আমার যা ছিল সব তার মাঝে ঢেলে দিলাম। সে দু'হাতে কার্পেট চাপড়ালো, 'ওহ্ ঈশ্বর।'

আমাদের চরম অবস্থা একসাথে এসেছে। তার পা শিথিল হয়েছে। পুরোপুরি অবসাদে সে গা ছেড়ে দিয়েছে। পুরুষ ও নারীর তৃপ্তিদায়ক সঙ্গমের চাইতে জীবনে আর কোন কিছুতেই পরিপূর্ণতার এমন বোধ আসতে পারে না।

দীর্ঘক্ষণ আমরা পাশাপাশি শুয়ে থাকলাম। একসময় সে বললো, 'তুমি উঠো না। মুহূর্তে ফিরে আসছি আমি।'

সে তার বেডরুমে গেল পুরো নগ্ন অবস্থায়। ফিরে এলো গরম পানিতে ভিজিয়ে নিংড়ানো টাওয়েল হাতে। অত্যন্ত যত্নের সাথে আমার মধ্যভাগ, উরু মুছে নিল। টাওয়েলের আরেক প্রান্ত দিয়ে আমার গুহ্যদ্বার ও নিতম্ব ডলে দিল। এরপর টাওয়েল এক পাশে ছুড়ে দিয়ে আমার পাশে শুয়ে পড়লো।

'কেমন হলো, চমৎকার, তাই না?'

'আমার জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা।' আমি স্বীকার করলাম। 'তুমি এ ব্যাপারে একজন শিল্পী। যৌন বিষয়ে বিশেষত্বের জন্যে তোমার একটি ডিগ্রি থাকা প্রয়োজন। সুম্মা কাম লউডে।'

'সুম্মা কাম--কি জানি বললেন ? যেটাই হোক আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে হচ্ছে না।'

আমি তাকে ব্যাখ্যা করলাম।

'আর আপনি ? আমেরিকায় কতোগুলো সুম্মা কাম হাসিল করেছেন ?'

'মাত্র একটি। কম্পিউটার সায়েন্সে। মহিলাদের নিকট থেকে শুধুমাত্র প্লাস পেয়েছি।'

'আপনি কি অনেককে পেয়েছেন ?'

'অল্প সংখ্যক। আর তুমি? অনেক পুরুষ?'

'অনেক নয়, কিছু। আমি কঠোর ক্যাথলিক সমাজে বাস করি। ফাইভ স্টার

হোটেলে কাজ করার সময় আমি কখনো কখনো কিছু বিদেশীর সঙ্গে যৌনকর্মে রাজি হয়েছি। কিন্তু খুব উপভোগ্য ছিল না সেগুলো। তাদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমার হাতে যখন ডলার গুঁজে দিতো তখন, বিশেষ করে প্রথম দিকে নিজেকে খুব নোংরা মনে হতো। কিন্তু কিছুদিন পর স্বাভাবিক হয়ে যায়। নিজেকে আর বেশ্যার মতো মনে করি না। তবে আপনার মতো ভালোবেসে উপভোগ করার অভিজ্ঞতা নেই। আপনি কি কনডম ব্যবহার করেন না?'

'তা করি। কিন্তু আজ রাতে ব্যবহার করতে ভুলে গেছি। আমি দুঃখিত।'

'আমি প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলে অসুবিধা কোথায়? আপনার সন্তান নিতে আমার খারাপ লাগবে না। কিন্তু বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর লোকজন কি বলবে? তারা আমাকে খারাপ মেয়েমানুষ ভাববে। চার্চের ফাদারও আমাকে ক্ষমা করবে না। তাছাড়া আপনি আমাকে বিয়েও করবেন না।'

'ডুশ দিয়ে দেখতে পারো।'

'আপনি এ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করবেন না।'

সে আমার গালে আদর করলো। 'আমি পিল খেয়েছি এবং যদ্দিন আপনার কাছে থাকবো, পিল খাবো। কনডমের প্রয়োজন নেই।'

আমি আগুনে লাকড়ি দিচ্ছিলাম। কার্পেটের উপরই সারারাত শুয়ে কাটালাম। তিনবার আমরা যৌন সুখ উপভোগ করলাম।

মলি আমাকে জাগিয়ে দিল। দিনের আলোতে চারদিক উজ্জ্বল। তার কাপড় তুলে নিতে নিতে বললো, 'পিছনের দরজায় কেউ আঘাত করছে।'

'চাকরদের কেউ হবে। হায় ভগবান! অতিরিক্ত ঘুম হয়েছে।'সে তার বেডরুমে চলে গেল। আমি ড্রেসিং গাউন পরে নিচে নেমে দরজা খুললাম। ওদেরকে বললাম, অনেক রাতে ঘুমোতে গেছি। আমাকে বেডরুমে চা দিও। মেমসাহেবকে তার রুমে দিয়ে দিও।'

আমি দ্রুত দোতলায় গিয়ে বিছানাটা এলোমেলো করলাম, যাতে মনে হয় রাতে বিছানায় ঘুমিয়েছি। মলির দরজায় নক করে জোরে বললাম, 'সকালের চা কি রুমে দেবে, না আমার সাথে দিতে বলবো?'

'আমি এখনই বের হচ্ছি।' যখন সে বাইরে এলো, তার মুখ ধুয়েছে এবং প্রাণ ফিরে পেয়েছে। গুনগুন করে গাইছিল সে, 'ও' হোয়াট অ্যা লাভলি মর্নিং, হোয়াট অ্যা লাভলি ডে।' বেয়ারারকে সে শুভেচ্ছা জানালো এবং বাবুর্চিকেও। আমার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিয়ে সে জানতে চাইলো, 'আজকের সকালে আমরা কেমন আছি? ভালো ঘুম হয়েছে?'

'ঘুম ঠিকঠাক। সারারাত গেছে সঙ্গমে।'

'বাজে শব্দ ব্যবহার করবেন না।' সে আমাকে মৃদু ধমক দিল তর্জনী উচিয়ে। 'বলুন, ধন্যবাদ ম্যাম, একটি চমৎকার রাত উপহার দেয়ার জন্যে। আজ দিনের কর্মসূচী কি?'

'একঘন্টার মধ্যে আমি অফিসে চলে যাবো। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে। তার নাম জীবন রাম। তুমি যেখানে যেতে চাও– দর্শনীয় স্থান, শপিং সেন্টার, স্মৃতিসৌধ, জাদুঘর, আর্ট গ্যালারি; তোমাকে সেখানেই নিয়ে যাবে। ছ'টার দিকে আমাকে অফিস থেকে তুলে আনলেই হবে।'

'আপনি জানেন, আমি কি করতে চাই ? আপনার বাবুর্চির সাথে গিয়ে ডিনারের জিনিসগুলো কিনবো। আজ সন্ধ্যায় আমি রান্না করবো।'

সারাদিন অফিসে কাটালাম। কাজে আমার মন ছিল না। মলি গোমেজের সাথে বিগত রাতের ভালোবাসার প্রক্রিয়াগুলো ভাসছিল। আমার স্টাফরা কি ভাববে, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। লাঞ্চ ব্রেকের সময় আমি স্যুপ ও স্যান্ডউইচ দিতে বললাম। বিমলা শর্মাকে বললাম আমাকে কোন ফোন না দিতে অথবা আমি না বলা পর্যন্ত কাউকে প্রবেশ করতে না দিতে। সোফায় শরীর ছড়িয়ে দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। দীর্ঘ তিন ঘন্টা ঘুমালাম। উঠে মুখ ধুঁয়ে চা দিতে বললাম। শরীরটা এখন ঝরঝরে। চিঠিপত্রে চোখ বুলালাম। যে চিঠিগুলো লিখতে বলেছিলাম সেগুলো সই করে দিলাম। ছ'টার মধ্যে টেবিল পরিস্কার করে বাড়ি ফিরতে প্রস্তুত হলাম। মলি দোতলায় ছিল। উপরে উঠতেই স্টোরওতে জোরে গানের শব্দ ভেসে এলো। মলিও সুর মিলাচ্ছে। গানটা এক ধরণের অপেরা। আমার এরকম কোন ক্যাসেট নেই। মলি আমার পদশব্দ টের পেয়ে আওয়াজ কমিয়ে দিল এবং সিঁড়ির কাছে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো। মাথা নিচু করে বললো, 'স্বাগতম, সুস্বাগতম মি. কুমার। আমার বিশ্বাস সারাদিন অফিসে ভালো কেটেছে ? আমার নতুন পোশাক আপনার কেমন লাগছে ? আজ সকালেই কিনেছি।'

সালোয়ার কামিজ পড়েছে সে। কাঁধের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে লাল ওড়না। কপালে লাল টিপ। 'আমার মনে হলো, গোয়া থেকে আগত কালো ক্যাথলিক মেমসাহেবের চাইতে আমার পাঞ্জাবী হিন্দু শ্রীমতির সাজে থাকা উচিত। বিশেষ করে যদ্দিন আমি শ্রী মোহন কুমারের সঙ্গে থাকবো।'

আমি বললাম 'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। আমার মনে হয়, তুমি যাই পরবে, তাতেই তোমাকে ভালো মানাবে। তোমার ফিগার সবকিছুতে মানানসই।'

'অশেষ ধন্যবাদ। আপনার বাবুর্চি আমাকে আইএনএ মার্কেট নামে এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। বিশ্বের সবকিছু পাওয়া যায় সেখানে। অনেক মাছ দেখেছি— রুই, স্যামন, রূপচাঁদা, ইলিশ, চিংড়ি, কাঁকড়া। আমি কাঁকড়াই কিনলাম। নিজ হাতে রান্না করেছি আমি, গোয়ার ধাঁচে। একটু মদ মিশিয়ে দিয়েছি। আশা করি আপনার পছন্দ হবে।'

আমি কোট, টাই, জুতা খুলে পশমি ড্রেসিং গাউন ও স্লিপার পরলাম। বেয়ারারকে বললাম, ফায়ার প্লেসে আগুন ধরিয়ে দিতে এবং হুইস্কি সাজাতে। 'কেনাকাটা আর রান্না ছাড়া কি করলে সারাদিন ?'

'ঘুমিয়েছি। পাক্কা তিন ঘন্টা। চার ঘন্টাও হতে পারে। গত রাতে আমাকে তুমি পরাজিত করেছো।'

ওর কথা শুনে খুশি হলাম। বললাম, 'আমিও ঘুমিয়েছি। অফিসের সোফায় শুয়ে পুরো বিকেলটা ঘুমিয়েছি।'

'এ থেকে কিছু শিখুন। সবকিছুর মতো সঙ্গমেও ধৈর্য ও একটা মাত্রা রাখা উচিত। যা হোক, নিজেকেই ভর্ৎসনা করছি। আমার স্বস্তি আছে যে, আপনি আমাকে প্রেগন্যান্ট করতে পারেননি। আমার পিরিয়ড শুরু হয়েছে। অতএব আগামী চারদিন কোন নোংরা কাজ নয়।'

আমিও স্বস্তিবোধ করলাম। আমি তাকে বুঝতে দিতে চাইনা যে, প্রথম রাতের মাত্রা প্রতি রাতে অব্যাহত রাখতে পারবো না। বললাম, 'ঠিক আছে। চারদিন যৌনকর্ম থেকে বাধ্যতামূলক ছুটি। তোমার পিরিয়ড কেটে যাক। আমার বীর্যের ভান্ডার আবার পূর্ণ হোক। অতঃপর আমরা ভালোবাসাবাসি শুরু করবো। খুব বেশিও নয়, খুব কমও নয়।'

মলি চমৎকার রান্না করেছে। তার তৈরি স্যুপ ঝাল হলেও সুস্বাদু। কাঁকড়া ভূনাও চমৎকার এবং এরকমটা প্রথমবারের মতো খেলাম। ক্যারামেল কাস্টার্ড আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের কাস্টার্ডের চাইতেও মজাদার। 'মনে হচ্ছে, তুমি সবকিছুতে সুনিপুণ।' আমি বললাম।

'সবকিছুতে বলতে কি বুঝাতে চান ? আমরা এখন খাবার নিয়ে কথা বলছি।' সে হেসে বললো।

'সবকিছু বলতে আমি সবকিছুই বুঝাচ্ছি। তুমি জানো – তা কি।'

'আমি নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করি। বিদ্যুতের তার নষ্ট হয়ে গেলেও সারাতে পারি। সীমিত বাজেটে জীবিকা নির্বাহ করতে হলে আমাকে সবকিছু নিজেকেই করতে হয়।'

দীর্ঘক্ষণ আমরা আগুনের পাশে বসে রইলাম। সে আনন্দের সাথে তার গোয়ার জীবন, বাবা-মা, ভাই, ভাগ্নে সবার কথা বলে যাচ্ছিল। সবারই পর্তুগীজ নামঃ ডি সুজা, ডি মেল্লো, ডিসা, মিরান্ডা, আলমিদা ইত্যাদি। ' আপনি হয়তো ভেবেছিলেন, গোয়ার সবাই পর্তুগীজ ক্যাথলিক। আসলে তা নয়। হিন্দুদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি। ক্যাথলিকদের চাইতে তারা ধনবান। সালগাওকর, চোগলে, ডেম্পো এবং আরো ডজনখানেক হিন্দু বড়লোক আছে। তাদের অনেক অর্থ। বড় বড় বাড়ি। কিন্তু কোন রুচি নেই। আমরা জীবনকে উপভোগ করি ঃ পান করি, নাচি, গান গাই এবং ভালোভাবে খাই। আর তারা শুধু অর্থ বানায়। তুলসি গাছের পূজা করে। ছুটির দিনে মঙ্গেশ মন্দিরে যায়। যদিও তাদের সংখ্যা আমাদের চাইতে বেশি, কিন্তু তাদের মন্দিরের চাইতে অনেক বেশি ক্যাথেড্রাল আছে আমাদের। হিন্দুদের পূজার চাইতে খ্রিস্টানরা অনেক নিয়মিত ক্যাথেড্রালে যায়। আমরা হিন্দুদের পছন্দ করি না এবং হিন্দুদের সাথে আমাদের বিয়েও হয় না।'

'তাহলে তুমি আমাকেও পছন্দ করো না এবং আমি হিন্দু বলে কখনো আমাকে বিয়ে করবে না।'

'বাজে বকবেন না। আমি আপনার কথা বলছি না। আপনি অন্যরকম।' সে আমার নাকের উপর চুমু দিল।

যেহেতু মলির সাথে মিলনের সুযোগ নেই। অতএব আমরা কথা বলি। অনেক কথা। তাকে বলি, 'তোমার নামটি গোয়া বা পর্তুগীজ ধাঁচের চাইতে বরং ইংরেজির মতো শোনায়। এমন কেন ?'

এটা আমার সংক্ষিপ্ত নাম। আইরিশ নানদের দ্বারা পরিচালিত কনভেন্ট স্কুলে পড়ার সময় ওরা আমার এ নাম দেয়। আমার আসল নাম এক গজ লম্বা– মারিয়া ম্যানুয়েলা ফ্রান্সেসকো হোজে ডি পাইডাদে ফিলোমেনা গোমেজ। মলি নামটা ছোট্ট এবং সুন্দর। আসল নামটা উচ্চারণের চেষ্টা করে দেখুন, দম ফুরিয়ে যাবে। মলি নামই আমার পছন্দ। আমাকে আপনার সৎ নারী করার সিদ্ধান্ত নিলে আপনার নামের সাথেও ভালো মানাবে। সেনোরা মলি মোহন কুমার। আপনি কি বলেন ?'

আমি এ ধরনের ভাবনায় মাথা ঘামাতে চাই না। মলির সাথে আমার সম্পর্কের ভিত্তি কামনা এবং কামনাও উন্মাদনা শেষ হয়ে যায় যখন পূর্বে সম্পর্কিত দু'জন নারীপুরুষ একে অন্যের আঙ্গুলে বিয়ের আংটি পরিয়ে দেয়। মলি আমার অস্বস্তি উপলব্ধি করে বললো, ' দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই। আমার নাম গোমেজ থেকে কুমারে পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

স্কচে চুমুক দিয়ে সাহস করে তাকে বলেই ফেললাম, 'তোমার বয়স কতো মলি ? কখন তুমি তোমর কুমারীত্ব হারিয়েছো ?'

সে কার্পেটের উপর আমার পায়ের কাছে বসে আছে। চোখ তুলে তাকালো। বড় বড় চোখে আমাকে পরখ করলো এবং বললো, 'আপনি কেন এটা জানতে চান ? আপনি যদি আমাকে বলেন যে, কিভাবে কখন আপনার কৌমার্য হারিয়েছেন, তাহলে আমিও বলবো, কখন কার দ্বারা আমার সতীত্ব হারিয়েছি।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' আমার যৌন জীবন সম্পর্কে বলতে কোন সমস্যা নেই। তাতে যদি সে একটু কম রেগে নিজের সম্পর্কে বলে সেটাই ভালো। আমরা আমাদের অতীত নিয়ে আলোচনা করলে সন্ধ্যাটা ভালো কাটবে। আমি তাকে জেসিকা ব্রাউনি সম্পর্কে বললাম।

মলি বাধা দিল, 'সে দেখতে কেমন ছিল ?'

'গায়ের রং তোমার মতোই কফি ও ক্রিমের মিশ্রণ। বেশ লম্বা, ক্রীড়াবিদ। সে টেনিস খেলোয়াড় এবং চ্যাম্পিয়ন।' মলি আবার বাধা দিল। 'সেই কি প্রথমে উদ্যোগ নিয়েছিল, না আপনি ?'

'জেসিকাই উদ্যোগী হয়েছিল। কিছুদিন আমরা একসাথে ঘুরেছি। হাতে হাত রেখে। চুমু খেয়েছি প্রকাশ্যে। একদিন সন্ধ্যায় সে আমাকে তার রুমে গিয়ে পান করতে বলে। আমি তার ফিগারের প্রশংসা করলে সে পান করতে করতে বলে, দেখতে চাও, আমি আসলে দেখতে কেমন ?' সে জানতে চায় এবং আমি কিছু বলার আগেই কাপড় খুলে নগ্ন হয়ে দাঁড়ায়। সে ধীরে ধীরে ঘুরে আমাকে তার পিছন দিকটাও দেখায়। এর আগে আমি কখনো নগ্ন নারী দেখিনি। তাকে হাত দিয়ে ধরতে চেষ্টা করি। কিন্তু সে আমাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে বলে যে, আমার কাপড়ের আড়ালে কি লুকানো আছে তা

না দেখা পর্যন্ত তাকে স্পর্শ করতে পারবো না। আমার কাপড় খুলে ফেলার পর সে আমার অঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার মেদহীন পেট, প্রশস্ত বুকের দিকে নয়, শুধু এটার দিকে আমি মুখ ভেঙ্গিয়ে আমার মধ্যাঙ্গে থাপ্পড় দিলাম। মলি চাপা হেসে আমার মধ্যাঙ্গ স্পর্শ করলো। সেটা সম্পূর্ণ উত্থিত এবং আমার ট্রাউজারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

সে জানতে চায়, 'আপনারা কি মিলিত হয়েছিলেন ?'

'হ্যা।'

'ক'বার ?'

'সারারাত। আমার যদ্দুর মনে পড়ে চার বার; সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে। তখন আমার বয়স ছিল বিশ বছর। তার বয়স আমার চেয়ে এক বছর বেশি। যাক, যথেষ্ট বলেছি। এবার তুমি তোমার প্রথম বারের অভিজ্ঞতার কথা বলো।'

'হ্যাঁ, বলছি। তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। স্কুলছাত্রী। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য ভালোই বুঝি। অনেক দূর সম্পর্কের ভাই ছিল আমার। শৈশবে আমরা একে অন্যকে দেখতাম যে, আমাদের দুই উরুর মাঝখানে কি আছে। ছেলেরা ভালো করে দেখাতে পারতো। আমাদের দেখাতো যে, তাদের অঙ্গটা কতো বড় করতে পারে। একবার কোন এক মুহূর্তে তাদের অঙ্গের উত্থিত অবস্থা এবং কিভাবে সেটি আমাদের উরুর সংযোগস্থলে প্রবিষ্ট করানো যায় তা দেখাতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তা ঘটার জন্যে আমরা অপেক্ষা করিনি। আমি ছোট্ট নোংরা অবুঝ মেয়ে ছিলাম। কিন্তু ওই ছেলেদের কেউ শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা ঘটায়নি। আমার আপন মামা, আমার মায়ের ছোট ভাই, আমার চেয়ে বিশ বছরের বড়, সে কান্ডটা ঘটায়। জানোয়ার! ছোট নিরীহ বালিকার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল।' সে আগের মতোই হাসে। নিস্প্রাণ হাসি। 'যাক, একদিন বিকেলে ঘটনাটা ঘটে, যখন লোকটি বাবা মা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং তারা কেউ বাড়ি ছিলেন না। তখনো আমার পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম –খাটো ফ্রক, আমার হাঁটুর উপর পর্যন্ত। ভালো করে আমার উরু ঢাকে না। সে বরাবরের মতো আমাকে চুমু দেয়। কিন্তু এবার আমার ঠোটে। সোফার উপরে বসে সে আমাকে তার কোলে টেনে বসায় এবং গলার পিছনে, কানে চুমু দিতে শুরু করে। আমি টের পাচ্ছিলাম, তার অঙ্গ শক্ত হয়ে উঠছে। সে আমার স্তন মর্দন শুরু করে নির্দয়ভাবে। তার দম ফুরিয়ে যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পাচ্ছিলাম, তার মতলব ভালো নয় এবং আমার উচিত তাকে থামিয়ে দেয়া। কিন্তু তার তৎপরতায় আমিও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম এবং তাকে বাধা দিলাম না। সে আমাকে সোফার উপর শুইয়ে দিয়ে ফ্রকটা উঠালো, প্যান্টিটা টেনে খুলে ফেললো। এরপর সে দ্রুত নিজের ট্রাউজার খুলে তার মোটা অঙ্গটা বের করে আমার মাঝে চালান করে দিল। একবারের চেষ্টায় । লোকটা অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। ব্যথায় আমি চিৎকার করছিলাম। কয়েকবার প্রবল চাপ দিয়ে সে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিল এবং তার নোংরা বর্জ্য আমার উরুর উপর ঢেলে দিল। আমাকে প্রতিজ্ঞা করালো যে, আমি বাবা মাকে ঘটনাটা বলবো না। তাহলে তারা আমাদের

দু'জনকেই মেরে ফেলবে। আমি তাদের বলিনি। আমি কিছু বুঝিনি। আমি চার্চের পাদ্রীকেও বলিনি। কাউকে না। আজ আপনাকেই বললাম।'

বললাম, 'এতে তো তুমি মোটেই কোন আনন্দ পাওনি। তোমার উপভোগ করার মতো ঘটনা কখন ঘটেছে ?'

সে উত্তর দিল, 'আজকের সন্ধ্যার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। আপনি যখন আপনার অন্যান্য মহিলার কথা বলবেন, তখন আমিও আমার জীবনে আসা পুরুষদের সম্পর্কে বলবো।'

আগুন নিভে গেছে। আমি নিচে বাগানে গেলাম প্রস্রাব করতে। দরজাগুলো লাগালাম এবং উপরে উঠে এলাম। মলি হাত উপরের দিকে উঠিয়ে শরীর টান টান করে হাই তুলছে। আমি তার বগলে হাত দিয়ে তাকে উপরে তুললাম। সে ভীত হওয়ার ভান করে ঝুলন্ত পা ছুড়তে লাগলো। সেভাবেই তাকে তার রুমে নিয়ে বিছানায় ছেড়ে দিলাম। ঠোটে চুমু দিয়ে বললাম, 'গুড নাইট! তোমার সুনিদ্রা হোক। দরজা খোলাই রেখো, যদি মন পরিবর্তন করে ফেলি। আমিও দরজা খোলা রাখবো, যদি তুমি অন্ধকারে একা ভয় পাও এবং আমার সাথে জড়াজড়ি করতে চাও।'

সে রাতে আমরা নিজ নিজ বিছানায় যাপন করলাম। আমি স্বাভাবিক সময়েই উঠলাম, যাতে চাকররা ভিতরে আসতে পারে। সকালের চা একা পান করলাম। কারণ, মলির বেড টির অভ্যাস নেই। এরপর সংবাদপত্র পাঠ করলাম। যখন সে রুম থেকে বের হয়ে এলো, আমি তখন অফিসের ফাইল দেখছি। সে বুঝলো যে, আমি চাইনা, কেউ আমাকে বিরক্ত করুক এবং শান্তভাবে তার রুমে ফিরে গেল।

যদিও তখন আমার যৌনকর্মের প্রবল ইচ্ছা নেই, তবু আমি কামনা করেছি যে, মলি আমার আশেপাশেই থাকুক। আমি জানি, শীঘ্র হোক, আর বিলম্বে হোক, লোকজন আমাদের নিয়ে কানাঘুষা করবে। মলি তার বাড়ি থেকে বহু দূরে। অতএব কানাঘুষায় তার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু দিল্লি গুজবপ্রিয়দের রাজধানী এবং আমার নতুন মহিলা বন্ধুদের মধ্যে গুজব সৃষ্টিতে প্রচুর রসদ জোগাবে। তাদের কথায় কান দেয়ার ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে আমি যেখানে যাবো সেখানে মলিকেও সাথে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এটা তো আমারই জীবন, অন্য কারো নয়। কোন না কোন অজুহাতে আমি অফিস ত্যাগ করার স্বাভাবিক সময়ের চাইতে এক ঘন্টা আগে অফিস ছাড়তে শুরু করলাম। জীবন রামকে ছুটি দিয়ে বাড়ি চলে আসতাম মলিকে নিতে। প্রথম সন্ধ্যায় মলি বললো, 'আপনি কি স্বাভাবিক সময়ের চাইতে আগে ফিরেন নি ?'

'আমি তোমাকে কিছু পার্কে নিয়ে যাওয়া কথা ভেবেছি। পার্কগুলো বছরের এ সময়ে চমৎকার। ফুলে ফুলে ঢাকা। ফুলগুলো দ্রুত শেষ হয়ে যায়।' সে ধূসর স্কার্ট ও জুতো পড়লো। আমি ইন্ডিয়া গেট থেকে রাজপথ হয়ে রাষ্ট্রপতি ভবন এবং সেখান থেকে পরে বুদ্ধজয়ন্তী পার্কে যেতে চাই। কার পার্কে অসংখ্য গাড়ি। বাগানে প্রবেশ করতে দু'পাশে ফুটে থাকা বর্ণিল ফুল আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। সুন্দর করে সাজানো কসমসের কেয়ারী। ফুল সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানি না। কিন্তু বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্যান আমার ভালো

লাগে। কারণ বাগানটি বিশাল এবং প্রতিটি কেয়ারীতে একই ধরনের ফুল। এখানে বিদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট অতিথিরা বৃক্ষরোপণ করেছেন। সেসব গাছে তাদের নাম উৎকীর্ণ করা বোর্ড ঝুলানো এবং তাতে বৃক্ষ রোপণের তারিখও দেয়া আছে। ঝরা পাতায় পূর্ণ পথে আমরা হাত ধরাধরি করে হাঁটলাম। পথগুলো গেছে দূর প্রান্তের ফ্লেম ট্রির জঙ্গল পর্যন্ত – ফুলসহ ফ্লেম ট্রির দৃশ্য যেন ঈশ্বরের জন্যে।

ফুল এবং গাছ সম্পর্কে মলি আমার চেয়ে বেশি জানে এবং তার বৃক্ষ জ্ঞান সে আমাকে জানাতে ব্যস্ত। এক ঘন্টা হাঁটার পর সে বললো, 'আমি ক্লান্ত। পিরিয়ডের সময় আমার এতোটা হাঁটা ঠিক হয়নি। আমার ভেতরে ভেজা এবং নোংরা লাগছে। আমাকে প্যাড বদলাতে হবে।' আমরা পার্কের রেস্টুরেন্টে গেলাম। মলি বাথরুমে গেল পরিচ্ছন্ন হতে এবং স্যানিটারি প্যাড বদলাতে। সে আসতে আসতে ওয়েটার টেবিলে চা দিয়েছে। আমি সমুচা ও পেটিস দিতে বললাম। আমি জানি সে খেতে পারে। আমি একটি সমুচা খেলাম। বাকিগুলো শেষ করলো মলি। সূর্য জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল এবং উদ্যানে গাছের দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করলে লোকজন বিদায় নিতে শুরু করলো। বিল পরিশোধ করে মলিকে বললাম; 'এখন বাড়ি যাবার সময়।'

গাড়িতে এসে বসলাম। মলি জানতে চাইলো. 'দিল্লির অন্যান্য পার্কগুলোও কি একই রকম ?'

'সবগুলো এতো বড় নয়, কিন্তু সবই সুন্দর। কাল তোমাকে লোধী গার্ডেনে নিয়ে যাব। সেখানে বেশ কিছু সুন্দর সৌধ আছে।'

পরদিনও আমি একঘন্টা আগে অফিস ছাড়লাম এবং মলিকে লোধী গার্ডেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের বাইরে গাড়ি রেখে পুরনো মসজিদের উল্টো দিকের গেট দিয়ে প্রবেশ করলাম। মসজিদের গম্বুজের আকৃতি বোটাসহ তরুণীর স্তনের মতো। বহু ফুল ফুটেছে। নানা প্রজাতির ফুল। মলিকে বললাম, 'এখানে হাত ধরা যাবে না। এখানে অনেক লোক থাকতে পারে, যারা আমাকে চিনবে এবং আমার মহিলা বন্ধু সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে।'

'অবশ্যই! কোন হাত ধরাধরি নয়। সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখা হবে।'

পার্কের মধ্য দিয়ে মোহাম্মদ শাহ তুঘলকের সমাধি পর্যন্ত গেলাম। এরপর সিকান্দার লোধীর সুরক্ষিত সমাধিতে। চা পান করতে ফিরে এলাম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে। বাঁধানো পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ৬টি ফুটন্ত নীল শাপলার সৌন্দর্য দেখলাম। যারাই সেন্টারে আসে তারা এই দৃশ্য না দেখে যায় না। একবার এক যুবক প্রকাশ্যে পুকুরে প্রস্রাব করেছিল। তৎক্ষণাৎ তাকে বহিস্কার ও তার সদস্যপদ বাতিল করা হয়।

আমি চা ও কেক এর অর্ডার দিয়ে মাত্র দু'টি টেবিল আছে এমন টেবিলে বসলাম। জায়গা লোকজনে পরিপূর্ণ। কিছু লোক হাত তুলে শুভেচ্ছা জানালো। পরিচিত একজন টেবিলের কাছে এসে বললো, 'অনেক দিন দেখা নেই।' মলির দিকে তার ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি। আমি জানি যে, সে চাইতে চাইবে এই মহিলা কে। তার চাইতে আমিই কেন পরিচয় করিয়ে দিই না। ' ইনি মলি গোমেজ। দিল্লিতে সংক্ষিপ্ত সফরে এসেছেন।'

মলি তার সাথে হাত মিলিয়ে বললো, 'আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি আনন্দিত।'

সেই নাক লম্বা বেজন্মা বললো, 'আনন্দটা পুরোপুরি আমারই। তা আপনি কোথা থেকে এসেছেন। ?'

মলি উত্তর দেয়ার আগেই আমি মুখ খুললাম, 'উনি ডক্টর গোমেজ। বোম্বে থেকে এসেছেন। দিল্লিতে তার বন্ধুদের সাথে আছেন।'সে যাচ্ছে না। আমি কঠোর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। 'আবার কখনো দেখা হবে।' মলির দিকে মনোযোগী হলাম আমি। ইঙ্গিতটা বুঝে সে নিজের টেবিলে ফিরে গেল। গাড়িতে ফিরে মলি বললো, 'তোমার মতো চোখে মুখে মিথ্যা বলতে পারে এমন কাউকে আর দেখিনি। আমি বোম্বে থেকে আগত ডক্টর গোমেজ নই। গোয়া থেকে আগত মলি, একজন মালিশকারিনী। মোহনের সাথে বাস করছি, যিনি দু'দিন পরপর একজন নতুন নারীর সাথে সঙ্গম করতে চেয়েছিলেন।'

আমি তার কানে চুমু দেয়ার জন্যে ঝুঁকে বললাম, 'দিন নয়, মাসে এবং তোমাকে চেয়েছি সম্ভবত বহু বছর ধরে। আমি যে ধরণের নারীর তালাশে ছিলাম, তুমি ঠিক তাই।'

'লক্ষ কোটি ধন্যবাদ।'

গাড়ির স্টেরিও ছাড়লো মলি। আমার কাছে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সঙ্গীতের ক্যাসেট আছে। সে বিটোফোনের ক্যাসেট পছন্দ করলো। পুরো ভলিউম দিল। প্রসঙ্গ পাল্টাতে সে কথা বলতে চায় না। বরং নিরবে শুনতে চায় এবং যা করছে তা ভাবতে চায়। তাকে ভাবার জন্যে ছেড়ে দিলাম। সম্ভবত তার সম্পর্কে মিথ্যা বলে তার অনুভূতিকে আঘাত করেছি। এছাড়া আর কি করার ছিল আমার ? আমি পরে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করবো।

বাড়ি পৌছে মলি আমার আগেই উপরে উঠে গেল এবং ডিনারের জন্যে কি রান্না হচ্ছে তা দেখার জন্যে সোজা কিচেনে ঢুকলো। মগ বাবুর্চির ভাঙ্গা বাংলা–ইংরেজী এবং মলি তার ভাঙ্গা হিন্দিতে বেশ চালিয়ে যায়। সে বেয়ারারের সাথে একটি কথা বলতে শিখেছে, যা উচ্চারণ করলে হিন্দি সিনেমার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেমসাহেবদের মতো শোনায়। দু'দিনেই সে আমার চাকরদের মন জয় করেছে এবং আমারও।

সে আগুনের পাশে আমার সাথে যোগ দিল। আমি স্কচ ঢেলে দিলাম, 'লোধী গার্ডেন কেমন লাগলো ?' তাকে আবার কথা বলানোর জন্যে মুখ খুললাম।

'চমৎকার। এতো সুন্দর বাগান গোয়ায় একটাও নেই। কোন পার্কও নেই। শুধু প্রাচীন পর্তুগিজ দুর্গ ও ক্যাথেড্রাল। কিন্তু আমাদের সমুদ্র সৈকত আছে। উষ্ণ, স্বচ্ছ সমুদ্র। সূর্যের আলো গ্রহণের জন্যে আপনি বালিতে শুয়ে থাকতে পারেন। সেজন্যেই গোয়ায় বিদেশীরা আসে। আমাদের পুলিশরা তাদেরকে প্রকাশ্যে সব কাপড় খুলতে দেয় না। সেজন্যে হোটেলের লনে পুরো উদোম হয়ে তারা শুয়ে থাকে। কখনো পিঠ রোদে মেলে ধরে, কখনো পেট। চাপাতি ভাজার মতো তারা রোদে নিজেদের ভেজে নেয়। তাদের সাদা চামড়ায় বেশিক্ষণ রোদ সহ্য হয় না। সেজন্যে তারা নানা ধরনের লোশন মাখে, যাতে ত্বক পুড়ে না যায়। তাদের দেখেই বুঝা যায়, কে সূর্যের কিরণে পুরো শরীর

মেলে ধরেছিল, আর কে রেখে ঢেকে রোদ পুহিয়েছে। আপনার বাড়িতে রোদ পড়ে না। শুধু বাগানে রোদ আসে। আপনার সূর্য স্নান করা উচিত। স্বাস্থ্যের জন্যে খুব ভালো।

'আমাদের উপরে একটি খোলা ছাদ আছে। চারপাশে নিচু দেয়াল তোলা। কখনো কখনো ক্যানভাসে সূর্যকে প্রণাম করতে আমি সেখানে উঠি। শীতের সময় কখনো ক্যানভাস চেয়ার পেতে দু'এক ঘন্টা বসে থাকি।'

'যথেষ্ট নয়। একটি ম্যাট্রেস ও বালিশ নিতে হবে। দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে আপনি সম্পূর্ণ নগ্ন হতে পারেন। তাহলে সূর্যের রশ্মি আপনার দেহের প্রতিটি অংশকে চুম্বন করতে পারবে।'

আমার মাথায় সে চমৎকার ধারণা এনে দিয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম। একজন কাঠমিস্ত্রি ডেকে ছাদে যাওয়ার দরজায় ছাদ থেকে একটি ছিটকিনি বা বোল্ট লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। চাকরদের বলবো, ছাদে দু'টি র‍্যাক্সিনের ম্যাট্রেস দিতে। আমি কল্পনা করতে শুরু করেছিলাম যে, মলি এবং আমি ছাদে কি করতে পারি। আবিস্কারের আনন্দে আমি উৎফুল্ল হলাম।

মলি প্রশ্ন করলো, ' আপনি হাসছেন কেন ?'

'কিছু না, এমনি।' উত্তর দিলাম।

'আপনার মাথায় নিঃসন্দেহে নোংরা চিন্তা এসেছে। আপনার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারি। দুষ্টু ছেলে।'

'কিছু মনে করো না।' আমি হেসে প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলাম।

'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা হলো। দিল্লির নাম করা ক্লাবগুলোর অন্যতম। ভালো লাইব্রেরি, ভালো রেস্টুরেন্ট, মোটামুটি ভালো থাকার ব্যবস্থা আছে সেখানে। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে কোন না কোন অনুষ্ঠান থাকেই। অনেক অবসরপ্রাপ্ত লোককে জানি, যারা তাদের পুরো দিন ওখানেই কাটায়।'

'যেখানে সবাই সবাইকে জানে সেখানে কোন আনন্দ নেই। তারা জানতে চায়, কোন সদস্য কাকে সাথে এনেছে। আপনার সেই নাক লম্বা বন্ধুর মতো।'

'সব ক্লাবের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। নতুন কারো আগমন ঘটলেই কৌতূহল সৃষ্টি হয়। এরপর আমি তোমাকে একটি পার্কে নিয়ে যাব। ছোট্ট আরামদায়ক স্থান। যারা যায়, নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে।' মলি সহজ হচ্ছে। স্টেরিওতে নাচের বাজনার মতো ক্যাসেট বাজছে। সে বললো, 'আমরা কি নাচতে পারি ?' আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মলি। 'আমার প্রিয় টাঙ্গো এটা।'

আমি উঠে বাম হাত ওর কাঁধে রাখলাম। 'আমি বেশি নাচি না। আমার পা জড়িয়ে যায়। আমাকে শিখিয়ে দাও।' বেশ ক'বার মলির পা মাড়িয়ে দিলাম। সে আমাকে ঠেলে চেয়ারে বসিয়ে দিল এবং একা একা নাচলো স্টেরিও বাজনার তালে তালে। বাজনা শেষ হওয়ার সাথে সেও থামলো। চেয়ারে বসে পড়ে বললো, 'আমি ভেবেছিলাম, আপনি সবকিছুতে চৌকশ। আপনি নাচতে জানেন না। আচ্ছা, আমি শিখিয়ে দেব। আপনার আমেরিকান বান্ধবী আপনাকে নাচতে শেখায়নি ?'

'আমেরিকান ক্যাম্পাসে নাচের তেমন সুযোগ নেই। যারা নাচতে চায়, তা জোড়া বেঁধে যথাস্থানে যায়।'

'গোয়াবাসীদের রক্তের মধ্যেই নাচ আছে। সকলেই জানে, কি করে গাইতে বা নাচতে হয়। ক্রিসমাসের সময় একবার গোয়ায় আসবেন। রাস্তাঘাট পূর্ণ থাকে, মদের ফোয়ারা ছুটে। দম্পতিরা সমুদ্র সৈকতে দলে দলে মিলিত হয়। পৃথিবীতে গোয়ার মতো স্থান আর দ্বিতীয়টি নেই।'

সে এখন পুরোপুরি উৎফুল্ল। ডিনারের সময়েও সে প্রচুর কথা বললো। ডিনারের পর ফায়ার প্লেসের সামনে বসলাম। সে কার্পেটে আমার দু'পায়ের মাঝে মাথা রেখেছে। আমরা নিঃসংকোচে আমাদের অতীতের সম্পর্কগুলোর কথা বললাম। তার অধিকাংশ সম্পর্ক শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে, যাদের সাথে তার দেখা হয়েছে হেলথ ক্লাবে অথবা তাদের রুমে মালিশ করতে গিয়ে।

'গোয়াবাসী কারো সাথে শোয়ার হাজারো বিপদ। শিগগির ব্যাপারটা জানাজানি হবে এবং আমি ভ্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত হবো। বিদেশীদের সাথে কোন বিপদ নেই। যদিও তারা আমাকে অর্থ দেয়। কিন্তু আমি মনে করি না যে, আমি বেশ্যাবৃত্তি করছি। কারণ আগে থেকে লেনদেনের কোন কথা থাকে না, দর কষাকষি হয় না। মালিশের পর সবাই আমাকে বখশিষ দেয়। মালিশের চাইতেও যদি বেশি কিছু দেই। তাহলে বখশিশের পরিমাণ কয়েক শ' নয়, কয়েক হাজারে দাঁড়ায়। আমার লক্ষ্য হচ্ছে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মজা করো, আর বিয়ে করো গোয়ার কাউকে। আপনি কি কখনো যৌনকর্মের জন্যে অর্থ দিয়েছেন ?'

'কখনো না। বরং অনেক মহিলা আমাকে মূল্যবান উপহার দিয়েছে তাদের সাথে শয্যায় গমনের পর।'

'আমাকে বলতে হয়, আপনি স্পেশাল। আমার আরো মনে হয়, কোন মহিলার মধ্যে অমন আকৃতির কিছু প্রবিষ্ট হলে সে আপনাকে গুপ্তধনের সন্ধান পর্যন্ত দেবে।' হেসে বললো সে।

'অন্যদিকে আমি এটা বিনামূল্যে পাচ্ছি এবং এর জন্যে মূল্যও পাচ্ছি। কিন্তু আমি আশা করি, আমাদের যৌনমিলনের বিনিময়ে তুমি আমাকে অর্থ দিচ্ছো না। এজন্যে তুমি অর্থ দাও না। দাও কি ?'

সে আমার পা টানছিল। আমি উপভোগ করছিলাম। সেই সন্ধ্যার সবকিছু আমি উপভোগ করছিলাম। অন্যেরা কি করেছে, সে ব্যাপারে ক্ষুব্ধ না হয়ে আমাদের নিজনিজ স্বীকারোক্তিতে আমরা আরো ঘনিষ্ঠ বোধ করলাম। ঘনিষ্ঠতর হওয়ার জন্যে আমরা প্রতীক্ষা করছি।

আগুন নিভে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি তার চুল নিয়ে খেললাম। দাঁড়িয়ে বললাম, ' আমি জানি, তোমাকে ভালোবাসার উপযুক্ত সময় এটা নয়। কিন্তু আমরা কি একই বিছানায় শুয়ে পরস্পরের উষ্ণতা অনুভব করতে পারি না ? দিল্লির রাত খুব ঠান্ডা।'

সে উত্তর দিলো, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু কোন উল্টাপাল্টা কাজ নয়। আপনার পক্ষ থেকেও নয়, আমার পক্ষ থেকেও নয়।'

'আমি নিজেরটাই গুরুত্ব দেব। সকালে উঠে আমাকে দরজা খুলে দিতে হয়। তোমাকে ঘুমের মধ্যে তুলে তোমার বিছানায় রেখে আসবো। তুমি এরপরও ঘুমোতে পারবে।' সে সম্মতির মাথা নাড়লো।

বাগানে ঝোপের উপর প্রস্রাব করে দরজা বন্ধ করলাম। উপরে উঠে দেখলাম, মলি আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছে। দাঁত ব্রাশ করে নাইট গাউন পরে তার পাশে শুয়ে পড়লাম। তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলাম। দু'হাতে স্তন মর্দন করলাম। সে আমার আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করেও বিড়বিড় করে বললো, 'অনেক এগিয়েছো, আর নয়।'

পরস্পরের বাহুতে মাথা রেখে আমাদের সারারাত কাটলো। দু'জন দু'জনের উষ্ণতা অনুভব করলাম রাতভর। যখন দু'টি দেহের সমীকরণ মিলে যায়, তখন তারা যৌন সঙ্গমের চাইতে দৈহিক সংস্পর্শেও কম আনন্দ লাভ করে না। সকালে যখন উঠলাম। তখনো সে গভীর ঘুমে। আমি কিচেনে গিয়ে চুলায় কেটলি বসালাম। আলমারী থেকে দু'টি হটওয়াটার বোতল বের করে তাতে গরম পানি ভরলাম এবং উপরে বোতল দু'টি তার বিছানায় রাখলাম, যাতে বিছানার ঠান্ডা দূর হয়ে যায়। কয়েক মিনিট পর তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলাম। সে মুখে সামান্য বিড়বিড় করলো। এরপর পাশ ফিরে স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেল। নিচে গিয়ে দরজা খুলে আবার নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

আমি সকালে চা পান, সংবাদপত্র পাঠ, স্নান এবং কাপড় পরে অফিসে যেতে প্রস্তুত। নাশতাও করলাম একা। যখন চুরুট টানছি, তখন মলি তার বেডরুম থেকে বের হয়ে চোখ ডলতে ডলতে এলো। হাত উপরে উঠিয়ে সে হাই তুলছে। 'হা ঈশ্বর! কটা বাজে?'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সাড়ে আটটা। শিগগির আমি বেরিয়ে যাবো। আজ শনিবার অর্ধদিবস অফিস। বাড়ি ফিরে লাঞ্চ করবো। বিকেলে তোমাকে নিয়ে শপিং এ যাবো। তোমার আরো কয়েকটা সালোয়ার কামিজ কেনা প্রয়োজন। যদি তুমি আমার সাথে বেড়াতে যাওয়ার সময় পরতে চাও। অথবা চাইলে তুমি শাড়িও কিনতে পারো।'

'আমি বললে কি আপনার বিশ্বাস হবে যে, আমি কখনো শাড়ি পরিনি। কিভাবে শাড়ি পরতে হয়, তাও জানি না। কেমন এলোমেলো পোশাক। কর্মজীবী মহিলা, যাদেরকে লাফিয়ে বাসে, স্কুটারে বা সাইকেলে উঠতে হয়, নামতে হয় এবং যারা আমার মতো ম্যাসেজ পার্লারে কাজ করে, তাদের পক্ষে শাড়ি পরে কাজ করা দুঃসহ ব্যাপার। সালোয়ার কামিজ চলতে পারে। স্কার্টের চাইতে ভালো এবং জিনসের চাইতে জাঁকজমকপূর্ণ।'

ঠিক আছে, তোমাকে রেডিমেড সালোয়ার কামিজের দোকানে নিয়ে যাব।' বিকেলে অফিস ত্যাগ করার পূর্বে আমি নিজের নামে একটি চেক ভাঙ্গিয়ে নিলাম। কারণ মহিলাদের কাপড় চোপড় কেনার বিল দিতে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে চাই না। লাঞ্চে যথাসময়ে বাড়ি ফিরলাম। মলিই রান্না করেছিল। উপাদেয় খাবার। হাল্কা ও সুস্বাদু। শামুকের স্যুপ, এরপর রূপচাঁদা মাছের ফ্রাই মেয়োনিজের সাথে। কোন মিষ্টি নেই।

দু'ঘন্টা পর আমরা শপিং অভিযানে বের হলাম। প্রথমে সাউথ এক্সটেনশন মার্কেট, এরপর জনপথ, সবশেষে স্টেট এমপোরিয়াম। শেষোক্ত স্থানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের হস্তশিল্পজাত পণ্যের সমাহার। চার জোড়া সালোয়ার কামিজ ছাড়াও মলি ব্লাউজ পিস, কসমেটিকসসহ বিভিন্ন জিনিস কিনলো। আমি দুই প্যাকেট হাভানা চুরুট কিনলাম এম আর স্টোর থেকে। প্রচুর নগদ অর্থ উড়ালাম। চা পান করতে গেলর্ড রেস্টুরেন্টে গেলাম। স্যান্ডউইচ এবং পাকোরা গলধঃকরণের মাঝে সে আমার হাতে হাত রেখে বললো, 'আপনি কি সব মহিলার সাথেই এমন উদার ?'

'তারা যদি আমার সাথে উদার হয়, তাহলে আমিও তাদের প্রতি সমান উদার। যেহেতু তুমি উদারতার সম্রাজ্ঞী, তোমাকে কারো সঙ্গে তুলনা করতে পারি না।'

সে উপলব্ধি করলো, আমি কি বলতে চাচ্ছি এবং স্যান্ডউইচ ও পাকোরা খাওয়া শুরু করলো। প্লেট শেষ করলো সে। তারপর বললো, 'আমার ধূমপান করতে ইচ্ছে করছে। আপনার কাছে কি সিগারেট আছে ?'

'বহু বছর আগে আমি সিগারেট ছেড়ে চুরুট টানতে শুরু করেছি। এটা ভালো। অসুবিধা নেই, তোমাকে এক প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দিচ্ছি। কোন্ ব্রান্ডের ?'

'যে কোন ব্রান্ডের হতে পারে। গোল্ড ফ্লেক, চারমিনার। ব্রান্ডের পার্থক্য আমি বুঝতে পারি না। খুব ক্লান্ত বোধ করলে আমার ধূমপানের ইচ্ছে হয়।' আমি ওয়েটারকে বিশ রুপির নোট দিলাম সিগারেট আনার জন্যে। সিগারেট আনলে সে একটি ধরালো এবং নাকের ছিদ্র দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। 'পিরিয়ডের সময় আমি খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। গত দু'দিন ধরে বলি দেয়া শূকরের মতো আমার রক্ত ঝরছে। তৃতীয় দিনে কিছুটা কম। আগামীকাল আমি বৃষ্টির মতো ঝরঝরে হয়ে যাবো এবং নিজেকে আপনার সেবায় নিবেদন করতে পারবো।' সে আমাকে নিশ্চিত করলো।

যখন রেস্টুরেন্ট থেকে বের হলাম তখন কনট সার্কাসে গোঁধূলির ধূসর আলো। যানবাহনের গর্জন ছাড়িয়ে শোনা যাচ্ছে রাতের জন্যে গাছে আশ্রয় নেয়া ময়না ও টিয়ার কিচিরমিচির শব্দ। মহারাণীবাগমুখী রাস্তায় প্রচুর যানবাহন। গাড়ির বাম্পারের সাথে বাম্পার লেগে আছে। মহারাণীবাগ পৌছতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেল। ড্রয়িং রুমে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালানো হয়েছে। হুইস্কি দেয়া হয়েছে। কয়েক ঘন্টা কেনাকাটার ধকলে আমি নিজেও ক্লান্ত। গরম পানিতে স্নান করে রাতের পোশাক পরলাম – পশমি ড্রেসিং গাউন ও স্লিপার। মলিও তাই পরেছে। তার রুম থেকে সে যখন বের হলো তাকে সতেজ লাগছিল এবং উৎফুল্ল। কেনা জিনিসগুলো সাথে এনে কার্পেটের উপর সব ছড়ালো। আমার কাছে জানতে চাইলো, 'আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে কোনটি?'

'আমি বলতে পারবো না। সবগুলোই আমার ভাল লাগে।' কামিজগুলো সে একটি একটি করে বেছে নিয়ে বুক থেকে ঝুলিয়ে ধরলো। বারবার দেখলো। যত্নের সাথে প্রত্যেকটা ভাঁজ করে আবার রুমে রেখে এলো। আমি তার জন্যে হুইস্কি ঢাললাম। সে স্টেরিও ছাড়লো। বললো, 'আজ আমি খুব ক্লান্ত। নাচতে পারবো না। কিন্তু পান করার সময় গান শুনতে ভালো লাগে।'

আমরা পান করলাম, গান শুনলাম এবং কথা বললাম। আগুনের পাশে বসেই রাতের খাবার খেলাম। সে জানতে চাইলা, 'আমরা কি একসাথে শুতে পারি ? আমি এখনো পরিচ্ছন্ন নই। কাল সকালের মধ্যেই পিরিয়ড শেষ হবে বলে আশা করি। নোংরা ব্যাপার। আপনি কি বলতে পারেন ঈশ্বর কেন মেয়েদের উপর এই অভিশাপ চাপিয়েছেন; পুরুষের উপর কেন নয় ? এটা আমার কাছে খুব অবিচার বলে মনে হয়।'

'আমি জানি না। আমি শুনেছি যে, যদিও পুরুষদের পিরিয়ড হয় না, কিন্তু তাদের বয়স অতিক্রম করলে তাদের এমনিতেই বীর্যপাত হয়ে যায়। তারা বিসদৃশ আচরণ শুরু করে। নারীভোগের চূড়ান্ত ও শেষ উদ্যোগ নেয়, তরুণীদের উত্যক্ত করে, বাজে শব্দ ব্যবহার করে অথবা নিজেদের অঙ্গ অযাতিতভাবে প্রদর্শন করে। আবার অনেক পুরুষ সেই বয়সে ধার্মিক হয় এবং তীর্থযাত্রা ও প্রার্থনায় সময় নষ্ট করে।'

'হ্যাঁ, এটা সত্য।' মলি একমত হলো। 'মেয়েরা অন্তত; এটা জানে যে, তাদের পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেলে তাদের আর সন্তান হবে না। তাদের যৌনক্ষুধাও হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু পুরুষদের যৌনতাড়না বাড়ে। এমনকি যদি তাদের অঙ্গ উত্থিত নাও হয়, তবু তারা মহিলাদের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে। আপনি কি পঞ্চাশোর্ধ পুরুষের কামনা প্রত্যক্ষ করেছেন ? খুব করুণ দৃশ্য!

নিজেরাই নিজেদের আচরণে আহম্মক বনে যায়। বৃদ্ধ লোকদের জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয়। তারা তাদের বৃদ্ধ মধ্যাঙ্গকে কখনো শান্তিতে রাখতে শিখে না।' সে জোরে হেসে উঠলো। 'এবার বিছানায় চলুন। আশা করি আপনার বিছানায় যাবেন। আজ রাতেও কিছু হবে না। জড়িয়ে শুয়ে থাকা, ব্যস্।'

আগের রাতের মতো একই রকম। আমরা নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে থাকলাম। হট ওয়াটার বোতল বিছানা থেকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের দেহের উত্তাপ নিয়ে ঘুমালাম।

রোববার অফিস নেই। স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বেশি ঘুমালাম। মলিকে কোলে তুলে তার বিছানায় রেখে বললাম, 'যতোক্ষণ পারো ঘুমিয়ে নাও। আজ রোববার। বিলম্বে নাশতা খাবো।'

জড়ানো কণ্ঠে সে কিছু বললো। আমি বুঝতে পারলাম না। পাশ ফিরে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি নিচে গিয়ে দরজা খুললাম। গেটের পাশে রোববারের সংবাদপত্রের স্তূপ। সেগুলো নিয়ে রুমে গেলাম। ইলেকট্রিক রেডিয়েটরে সুইচ দিয়ে পত্রিকা নিয়ে বসলাম। বেয়ারার চা আনলো। আধ ঘন্টার মধ্যে ছয়টি পত্রিকা এবং সেগুলো রবিবাসরীয় সংখ্যাগুলো দেখে ফেলেছি। পড়ার তেমন কিছু নেই। আমি ছাদে উঠলাম আয়োজনটা দেখতে। দু'টি রেক্সিনের ম্যাট্রেস পাশাপাশি বিছানো। কুয়াশায় ভিজে উঠেছে। ছাদ ঘুরে দেখলাম। আশেপাশের বাড়ির ছাদ বেশ উচুঁ। আমি পড়শীদের ছাদ দেখতে পারি। তারা আমারটা দেখতে পারবে না। প্রতিটি ছাদে টিভি ও ডিশ এন্টেনার জঙ্গল। শীতল সকালে যখন পায়চারি করছিলাম তখন হঠাৎ মনে হলো, বহুদিন সূর্য নমস্কার করিনি। উদীয়মান সকালে দাঁড়িয়ে আমি রীতিমাফিক সূর্যকে নমস্কার করলাম। আমার ভালো লাগলো।

নিচে এসে স্নান করলাম। স্পোর্টস শার্ট পরলাম এবং ঠান্ডা থেকে শরীর বাঁচাতে মোটা সোয়েটার গায়ে চাড়িয়ে নিলাম। মলি দশটার পর রুম থেকে বের হলো। সে স্নান করে ঝরঝরে হয়েছে। সালোয়ার কামিজ পরেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেমন লাগছে?'

'চমৎকার! তুমি একটা শাল গায়ে জড়িয়ে নাও। আবহাওয়া ভালো নয়।' সে রুমে গিয়ে হাতে বোনা একটি পশমি স্কার্ফ পরে এলো। তাতে তার সম্মুখভাগ পুরোপুরি আবৃত হয় না। আমরা ইলেকট্রিক রেডিয়েটরের পাশে বসলাম। চুরুট ধরালাম। সে তার সিগারেট জ্বালালো। তাকে বললাম, 'আজ রৌদ্রোজ্জ্বল দিন হবে বলে মনে হচ্ছে। ম্যাট্রেস ছাদে তোলা হয়েছে। আমার ত্বকে মালিশের জন্যে এক বোতল হারবাল অয়েল সংগ্রহ করেছি। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত আমরা সারাদিন সূর্যস্নান করতে পারি।' সে উত্তর দিল, 'তাহলে খুবই ভালো হবে।' হালকা নাশতা খেলাম – ঝাল চাইনিজ স্যুপ এবং স্যান্ডউইচ।

চাকররা টেবিল পরিস্কার করে তাদের কোয়ার্টারে চলে গেল। আমি তাকে আমন্ত্রণ জানালাম, 'চলো বন্দোবস্তটা দেখে আসি।' হাত ধরে তাকে ছাদের সিঁড়িতে নিয়ে গেলাম। সূর্য উজ্জ্বল এবং উত্তপ্ত। ম্যাট্রেসের শিশির ততোক্ষণে শুকিয়ে গেছে। হারবাল অয়েলও রোদে গরম হচ্ছে। মলি ছাদে ঘুরে নিশ্চিত হলো যে, আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। সে নির্দেশ দিল, 'আপনি একটা হালকা ড্রেসিং গাউন পরে নিন।' সহসা তাকে পেশাদার মনে হলো। 'আমিও অন্য কাপড় পরবো।' রৌদ্রতাপ আরো প্রখর হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলাম। আবার যখন উপরে উঠলাম, সূর্য তখন মাথার উপরে। বাতাস নেই। মলি বললো, 'সূর্য স্নানের উপযুক্ত পরিবেশ। আপনার ড্রেসিং গাউন খুলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড় ন।' তার নির্দেশ পালন করলাম। সে তার সূতির নাইটি খুলে ফেলে একদিকে ছুঁড়ে দিল। পায়ের গোড়ালিতে সোনার হালকা চেন ছাড়া তার শরীরে এক খন্ড সূতাও নেই। সে আমার পিঠের উপর এমনভাবে বসলো, যেন ঘোড়ায় বসেছে। আমার শিরদাঁড়ায় তার যৌনকেশের স্পর্শ অনুভব করছি। তার দু'হাত দিয়ে শিরদাঁড়া ডলতে শুরু করলো। নিচ থেকে উপরের দিকে। বারবার। দুই কাঁধে বৃদ্ধাঙ্গুলির চাপ দিল জোরে এবং এরপর মর্দন করলো। আমার সকল উদ্বেগ যেন সে নিয়ে নিচ্ছে। দু'হাতে হারবাল অয়েল নিয়ে আমার পিঠে মাখলো। বারবার তেল মালিশ করলো, মাথা থেকে শিরদাঁড়া পর্যন্ত। সে পিছন ঘুরে বসলো, সেভাবে আমার নিতম্ব, উরুতে তেল ডললো। পায়ের গোড়ালি, আঙ্গুলের প্রতিটি ফাঁকে তেল দিল। এভাবে প্রায় আধঘন্টা চললো। এ পদ্ধতি অত্যন্ত উপভোগ্য এবং উত্তেজনা সৃষ্টিকর। তার আদুরে আঙ্গুল আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ, অঙ্গসন্ধি এবং রন্ধ্র পর্যন্ত পৌছলো। আরেকবার উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে চিৎ হয়ে শোয়ার নির্দেশ দিল।

আমি চিৎ হলাম। তার মসৃণ দু'টি উরু এবং উরু দিয়ে ঢাকা অঙ্গ দেখার সুযোগ পেলাম। সে আমার পেটের উপর বসলো। আমার স্তনের বোটায় আঙ্গুল ঘুরালো। আমি জানতাম না যে, পুরুষের বোটাও মেয়েদের স্তনের বোটার মতোই স্পর্শকাতর হতে

পারে। সে আমার বুকের উপর তেল ঢেলে তা ছড়িয়ে দিল এবং হাতের তালু দিয়ে যত্নের সাথে মালিশ করলো। আবার সে তার অবস্থান পরিবর্তন করলো। এবার তার নিতম্ব আমার চোখের সামনে। তার সামনের দিকে ঝুকে পড়া এবং পুনরায় সোজা হওয়ার মধ্যে তার যৌনকেশের ক্রিয়ায় সুড়সুড়ি অনুভব করছিলাম। মলি খানিকটা তেল আমার অন্ডকোষে মেখে দিল এবং উরুর ভিতরের অংশ মালিশ করলো। তার দেহ সঞ্চালন এবং সবকিছু দৃশ্যমান থাকায় আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আমার মধ্যাঙ্গ পূর্ণ প্রাণ ফিরে পেয়েছে এবং তার উরুতে লাগছে। সে থাপ্পড় দিয়ে এটাকে নিম্নগামী করার চেষ্টা করলো, 'ধৈর্য্য ধরো।'

এক ঘন্টা ধরে মালিশ চললো। আমি এ ধরণের উপভোগ্য এবং অনুভূতি জাগানিয়া কোন কিছুর অভিজ্ঞতা জানি না। এমনকি যৌনকর্মের চাইতে তৃপ্তিদাযক মনে হলো আমার কাছে। সে হাতে তেল তার দেহে মুছে ফেললো এবং মুখটা নিচ দিকে দিয়ে ম্যাট্রেসের উপর শুয়ে পড়লো। এবার আমি তার পিঠে বসলাম। আমার অন্ডকোষ তা পিঠের উপর। যদিনি আমি কাউকে কখনো মালিশ করিনি, আমি আমার উপর প্রয়োগ করা মলির কৌশলগুলোই প্রয়োগ করলাম। তার গলা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত পুরো শরীর মালিশ করলাম। আমার ঠোট তার স্তনের বোটায় আঠার মতো লাগিয়ে ধীরে ধীরে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হলাম। স্বর্গীয়

সুখ অনুভূত হচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ আমি তার মাঝে থাকলাম নড়াচড়াহীন অবস্থায়। এরপর নিজেকে প্রত্যাহার করে তাকে উপুড় হয়ে শুতে বললাম। সে তার পা প্রসারিত করে উপুড় হলো। আমি তার নিতম্ব মর্দন করতে শুরু করলাম। নারীর অন্য যে কোন অঙ্গের চাইতে তার নিতম্ব পুরুষকে বেশি উত্তেজিত করে। মলির নিতম্ব চমৎকার গোলাকৃতির এবং সুদৃঢ়। আমি পুনরায় তার মধ্যে উপগত হলে সে আমাকে তার মাঝে যতোদূর সম্ভব গ্রহণ করলো। আমাদের সুখকে দীর্ঘতর করতে চেষ্টার ক্রটি ছিল না। যখনই মনে হয়েছে আমি চরমে উঠে যাচ্ছি, তখনই প্রত্যাহার করে নিয়েছি এবং সংকটটা না কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। এরপর আবার আমরা দৈহিক অস্তিত্বের অনিবার্য সত্যের সন্ধানে অবতীর্ণ হয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমাদের চরম অবস্থাও এতো দীর্ঘতর হলো যে, আমাদের দু'জনের সেই অভিজ্ঞতা আর হয়নি। আমরা কথা বলিনি। কথা কৃত্রিম ব্যাপার। ম্যাট্রেসে শুয়ে থেকে আমাদের শরীরে মাখা তেল সূর্যকে শুষে নিতে দিলাম। প্রায় তিন ঘন্টা আমরা এ অবস্থায় ছিলাম।

আমাদের নিজস্ব অদ্ভুত উপায়ে দেহ দিয়ে সূর্যের উপাসনা শেষ করে আমরা নিচে গেলাম তেল থেকে পরিচ্ছন্ন হতে। সাবান মেখে ভালো করে স্নান করলাম। ড্রেসিং গাউন পরে ইলেকট্রিক রেডিয়েটরের সুইচ অন করে চুরুট ধরালাম। কয়েক মিনিট পর মলি এসে সিগারেট ধরালো। আমি বললাম, 'সত্যিই স্বর্গের সুখ পেয়েছি। তুমি কি বলো?'

হেসে সে উত্তর দিল। 'জীবনে এর চাইতে উত্তম কিছু জানি না। কিন্তু আর পুনরাবৃত্তির চেষ্টা যাতে আমরা না করি।

'কেন নয় ?'

'এ ধরণের ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনার দেহের প্রতিটি অংশ আপনার সঙ্গীর দেহের প্রতিটি অংশকে ভালোবেসে। জীবনে একবারের জন্যেই এ অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত। দ্বিতীয় বারের কল্পনা মনেই থাকুক। বাস্তবে চেষ্টা করবেন না। তাহলে চরমভাবে হতাশ হবেন।'

উত্তর ভারতীয় মান অনুযায়ী মালিকে কোন ভাবেই সুন্দরী বলা যায়না। সে বেশ কালো এবং বেঁটে। আমার আড়ালে স্ত্রীরা বন্ধুদের কানাঘুষা করে, ওর মাঝে সে কি দেখেছে ? তার অর্থ এবং চেহারা দু'টোর বিনিময়ে সে অনেক সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে পেতে পারে। তাদের স্বামীরা উত্তর দেয়, 'হয়তো বিছানায় সে পারদর্শী। শয্যা মোহিনী হতে ফর্সা ত্বক এবং বি এ ডিগ্রির প্রয়োজন নেই।' তাদের স্ত্রীরা পাল্টা বলে, 'বিয়েতে যেন ওগুলোই সব; যে কোন স্ত্রীই শয্যায় উত্তম হতে পারে, যদি তার স্বামী জানে যে, কি করে তাকে শয্যায় ব্যবহার করতে হবে।' এমন ধরণের অনেক ফিসফিস। আমি নিশ্চিত নই যে, একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মলি কি ভাবে। সে যেভাবে কথা বলে তাতে আমার ধারণা হয়েছে যে, সে গোয়া ছেড়ে এসে কষ্ট পাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতেও স্বচ্ছন্দ বোধ করি না যে, কতোদিন সে আমার সাথে থাকতে আগ্রহী। তাহলে সে মনে করে বসবে যে, আমি তার কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছি। যা আমি মোটেই চাই না। আমি তার সঙ্গ অন্য যে কোন নারীর চাইতে বেশি উপভোগ করেছি। কিন্তু তা কতোদিন ? আমি জানি, সে প্রতি সপ্তাহে তার মাকে চিঠি লিখে। সেই চিঠি পরিবারের সবার জন্য। সে অবশ্য কোন চিঠি পায়নি। হয়তো সঙ্গত কারণেই সে কোন ঠিকানা দিয়ে আসেনি। একদিন সন্ধ্যায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দিল্লি আসার কারণ হিসেবে তোমার বাবা মাকে কি বলেছো।'

'আমি বলেছি যে, এক বৃদ্ধাকে তার আংশিক প্যারালাইসিসের জন্যে মালিশ দিতে যাচ্ছি। কতোদিন বাইরে থাকতে হবে তা তাদের বলিনি, কারণ আমি জানি না, এই মহিলার কতোদিন মালিশের প্রয়োজন হবে। সম্ভবত আপনি তা বলতে পারবেন। আমি জানি, আপনি আমাকে বিয়ে করবেন না। আমিও বিয়ে করতে চাই না। এমন বিয়ে স্থায়ী হবে না। অতএব আপনি যদ্দিন চান, আমি, থাকবো। কিন্তু দীর্ঘদিনের জন্যে আমাকে না চাইলেই ভালো, তাহলে আমাদের দু'জনের জন্যেই সমস্যার সৃষ্টি হবে। এতোটা স্বল্পস্থায়ী করবেন না, যাতে আমার অনুভূতি আহত হয়।'

বাস্তব সম্পর্কে মানুষ এর চাইতে আর কতো সৎ হতে পারে। তার স্পষ্ট ভাষণে খুশী হয়ে তাকে একটি চুমু দিলাম। 'যতো মেয়ের সাথে মিশেছি তাদের মধ্যে তুমিই সেরা। মনে হয় তোমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি।'

'ভালোবাসার প্যাঁচাল আমাকে শোনবেন না।' তার কণ্ঠে ক্ষোভ। 'আপনি আমার দ্বারা সঙ্গমের আনন্দ লুটতে চান। এতেও খুব শিগগিরই আপনার ক্লান্তি এসে যাবে। আমার যৌনক্ষুধা অতৃপ্ত। দীর্ঘদিন আপনি আমার সাথে এঁটে উঠতে পারবেন না। আমি কি সঠিক বলছি ?'সে উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। আবার জানতে চাইলো, 'পারবেন, কি পারবেন না ?'

উত্তর দিলাম, 'তুমি আমার চাইতে বয়সে বেশ ছোট। কিন্তু মলি গোমেজ, দেহের বিনিময়ে দেহ। তাতে রাজ্যও যদি যায়, যাক। আমি তোমার সাথে যথার্থই এঁটে উঠবো।'

আমার সাথে মলি তিনমাস কাটালো। আমরা দু'জনই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার একাধিক বন্ধু জানতে চাইলো যে, গোয়া থেকে আগত এক লেডি ডাক্তারকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি, এই গুজবের সত্যতা আছে কিনা। আমি প্রবলভাবে অস্বীকার করে বললাম, সে প্যারালাইসিসের এক রোগীর চিকিৎসা করছে, যার প্রতিদিন ফিজিওথেরাপি প্রয়োজন।' তারা আবার প্রশ্ন করে, 'তোমার সাথে তার পরিচয় হলো কিভাবে ?' আমি এ ধরণের জেরা পছন্দ করি না। মলি অনুভব করতে শুরু করেছে যে, তার পরিবার এবং বন্ধুরা নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছে যে, সে এতোদিন বাইরে কেন ? ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে তার ব্যবসায়িক যোগসূত্র এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একদিন সে বললো, 'আমার নিয়মিত গ্রাহকরা আমার পরিবর্তে অন্য মালিশকারিণীকে খুঁজে নেবে। তাতে আমার জীবিকার অসুবিধা হবে।'

সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব মলির উপর ছেড়ে দিলাম। সে আমাকে গোয়ার ফ্লাইটে আসন বুক করতে বললো। আমি আপত্তি করলাম। 'মলি তোমাকে কি যেতেই হবে ? এতো শিগগির ?'

সে উত্তর দিল, 'মনে হয় আমার যাওয়াই উচিত। আপনি যতো শিগগির বলে মনে করছেন, অত অল্পদিন কোথায় ? আমি এখানে তিন মাস এবং আরো বেশি কিছু সময় কাটালাম। সব ভালোর সমাপ্তি একদিন আসতেই হবে, মি. কুমার। এভাবে একদিন জীবনও চলে যাবে।'

যদিও পর্যটন মওসুম শেষ হওয়ার পথে, কিন্তু বহু ভারতীয় গোয়ার হোটেলগুলোর হ্রাসকৃত ভাড়ার সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। আমার ট্রাভেল এজেন্ট এক্সিকিউটিভ ক্লাসে একটি সিট বুক করতে পারলো এক সপ্তাহ পর। ফ্লাইটটি দিল্লি ছেড়ে যায় বেলা সাড়ে এগারটার পর। যখন তার হাতে টিকেট তুলে দিলাম সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমরা মিলিত হলাম। যে একটি সপ্তাহ আমাদের হাতে ছিল প্রতিটি দিন আমরা পরস্পরের দেহ উপভোগ করলাম।

'আপনার অর্থের মূল্য অবশ্যই আমাকে পরিশোধ করতে হবে।' মলি বললো। আমি বললাম, 'তোমার সাথে প্রতিবার মিলনের মূল্য একলাখ রুপি।' তাই নাকি ? তাহলে কমপক্ষে আশি লাখ রুপি আপনার কাছে পাওনা রয়েছি। আমার ডায়েরিতে একটি হিসাব টুকে রেখেছি। কিন্তু আমি আপনাকে এক পয়সাও চার্জ করবো না। কারণ আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা আমার জীবনে আসা অন্য কোন পুরুষের কাছে পাইনি। আমার পেটে আপনার বীর্যের যে প্রবাহ, সবই নষ্ট হয়েছে। কোন কাজে লাগেনি।'

মলি যেদিন বিদায় নেবে, সেদিন সকালে আমরা শয্যায় গেলাম। এরপর তাকে এয়ারপোর্টে পৌছে দিলাম। যখন তার ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জারদের আহবান করা হচ্ছিল, আমি আবেগের সাথে তাকে আলিঙ্গন করে এবং বিদায়ী চুম্বন করলাম। বললাম, 'মলি, প্রতিশ্রুতি দাও, আমাকে লিখবে। যতোদিন পারি আমাদের যোগাযোগ রাখা উচিত।'

সে কোন প্রতিশ্রুতি দিল না। শুধু হাত নেড়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

মলি আমাকে লিখেনি। আমি যে চিঠিগুলো লিখেছিলাম তারও কোন উত্তর পাইনি।

নূরান

জুগগত সিং ঘন্টা খানেক আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। রাতের মালগাড়ির শব্দ যখন তাকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, এখন বের হওয়া নিরাপদ, তখনই সে বাড়ি ছেড়েছে। তার জন্যে এবং ডাকাতদের জন্যেও সে রাতের ট্রেনের আগমণ ছিল একটি সংকেত। দূরাগত প্রথম শব্দ শোনার পরই সে খাটিয়া থেকে নামলো, পাগড়িটা উঠিয়ে মাথায় পরে সন্তর্পনে পা ফেলে আঙ্গিনা পেরিয়ে খড়ের গাদা থেকে একটি বর্শা বের করলো। আবার ধীরে পা ফেলে খাটিয়ার কাছ থেকে জুতা হাতে নিল। এরপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছিস ?'

জুগগত সিং থামলো। তার মায়ের কণ্ঠ।

'মাঠে যাচ্ছি।' সে বললো। 'গত রাতে জংলী শুয়োর ফসলের অনেক ক্ষতি করেছে।'

'শুয়োর! আমার সাথে চালাকি করিস না। তুই কি ভুলে গেছিস যে, এখনো তুই জামিনে আছিস– সূর্য ডোবার পর গ্রামের বাইরে যাওয়া তোর জন্যে নিষিদ্ধ। তার উপর তোর হাতে বর্শা! শত্রুরা তোকে দেখে ফেলবে। তোর নামে নালিশ করবে। আবার তোকে জেলে পাঠাবে।' তার কণ্ঠে বিলাপের সুর। 'তখন কে দেখবে তোর ক্ষেতের ফসল, আর গরু মহিষ ?'

'আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।' জুগগত সিং বললো। 'ভয়ের কিছু নেই। গ্রামের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'না, তুই কোথাও যাবি না।' তার কণ্ঠ আবার বিলাপ ধ্বনির মতো শোনালো।

'চুপ করো।' জুগগত ধমকে উঠলো। 'তোমার চিৎকারেই পাড়াপড়শীরা জেগে উঠবে। চুপচাপ থাকো। কোন ঝামেলা হবে না।'

'যা, তোর যেখানে খুশী যা। তুই কুয়ায় ঝাঁপ দিতে চাইলে ঝাঁপ দে। তোর বাপের মতো ফাঁসিতে ঝুলতে চাইলে তাই কর। আমার তকদিরে লিখা আছে, আমাকে কাঁদতে হবে। কিসমতই খারাপ আমার' – কপাল চাপড়ে বললো জুগগতের মা।

জুগগত সিং দরজা খুলে দু'পাশে দেখলো। আশে পাশে কেউ নেই। দেয়ালের পাশ ঘেঁষে গিয়ে সে পুকুরের দিকের রাস্তায় উঠলো। পাশের ক্ষেতে এক জোড়া বকের ধূসর ছায়া দেখলো, ব্যাং ধরার আশায় ধীরে ধীরে কাদার মধ্যে পা ফেলছে। বক দু'টো হঠাৎ তাদের ব্যাং অনুসন্ধান থামিয়ে মাথা তুললো। যতক্ষণ বক নিশ্চিত বোধ না করলো,

জুগগত দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো। এরপর আলপথ ধরে মাঠের মধ্য দিয়ে নদীর দিকে চললো। নদীর পানির নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে তাকে বালুকাময় তীর পাড়ি দিতে হলো। হাতের বর্শা মাটিতে গেঁথে সে বালির উপর শুয়ে পড়লো। চিৎ হয়ে সে আকাশের তারা দেখছিল।

হঠাৎ একটি হাত তার চোখ চেপে ধরলো।

'বলো তো কে?' জুগগত সিং তার দু'হাত মাথার উপরে তুলে পিছনের দিকে হাতড়াতে শুরু করলো। মেয়েটি হাত সরিয়ে নিল। জুগগত এবার তার চোখ চেপে ধরা হাত অনুসরণ করে মেয়েটির কাঁধ, এরপর মুখ স্পর্শ করলো। সে তার গাল, চোখ, নাকে আদর করলো। তার হাত এসবের সাথে ভালোভাবে পরিচিত। সে তার ঠোটে আঙ্গুল দিয়ে খেলার চেষ্টা করলো যাতে সে আঙ্গুলে চুমু দেয়। মেয়েটি মুখ খুললো এবং জোরে আঙ্গুলে কামড় দিল। জুগগত ঝাঁকুনি দিয়ে হাত সরিয়ে নিল। এরপর সে দ্রুত দু'হাত দিয়ে মেয়েটির মাথা ধরে তার মুখ নিজের মুখের উপর টেনে আনলো। দু'হাতে তার কোমর পেঁচিয়ে আলতো করে তাকে উপরে তুলে ধরলো। মেয়েটি আটকা পড়া কাঁকড়ার মতো হাত পা ছুঁড়ছিল। হাতে ব্যথা না হওয়া পর্যন্ত সে তাকে উপরেই ধরে ছিল। এরপর তাকে নিজের উপর স্থাপন করলো। জুগগতের প্রতিটি অঙ্গের উপর মেয়েটির অঙ্গ। সে জুগগতের মুখের উপর দু'হাত দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। 'একটা বেগানা মেয়েমানুষের গায়ে তুমি হাত দিয়েছো। বাড়িতে কি তোমার মা-বোন নেই? তোমার কি কোন লজ্জাশরম নেই?

পুলিশের খাতায় খারাপ লোক হিসেবে যে তোমার নাম লিখা আছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইন্সপেক্টর সাহেবের কাছে আমিও অভিযোগ করবো যে, তুমি একটা আস্ত বদমাশ।'

'আমি শুধু তোর কাছেই বদমাশ, নূরু। আমাদের দু'জনকে একই হাজতখানায় রাখা উচিত।'

'তুমি বেশি বেশি কথা বলতে শিখেছো। আমাকে আরেকজন পুরুষ মানুষ খুঁজতে হবে।'

জুগগত সিং দু'হাতে মেয়েটিকে ঝাপটে ধরলো, যতক্ষণ তার কথা বলা বা দম নেয়া বন্ধ না হলো। যখনই সে মুখ খুলতে চেষ্টা করেছে তখনই তাকে জোরে চেপে ধরেছে এবং তার কথা গলায় আটকে গেছে। অবশেষে সে হাল ছেড়ে দিল। তার ক্লান্ত মুখ জুগগতের মুখের উপর স্থাপন করলো। জুগগত মেয়েটিকে তার পাশে শুয়ে দিল মাথাটা বাম কাঁধে রেখে। ডান হাতে সে তার চুল ও মুখ আঁকড়ে ধরলো।

মালগাড়ি দু'বার হুইসেল বাজালো এবং জোরে শব্দ তুলে সেতুর দিকে এগিয়ে গেল। বকগুলো ভয়ার্ত শব্দ করে ডানা মেলে দিল নদীর পানে। নদী থেকে আবার তারা উড়ে গেল জলাশয়ের দিকে। ততক্ষণে মালগাড়ি সেতু অতিক্রম করেছে এবং গাড়ির শব্দ দূরে মিলিয়ে গেছে।

জুগগতের আদরের স্পর্শ কামনাময় হয়ে উঠলো। তার হাত মুখ থেকে নিচের দিকে নেমে মেয়েটির স্তন ও কোমরে ঘুরাফেরা করছিল। সে হাতটা ধরে তার মুখের উপর ফিরিয়ে আনলো। তার নিঃশ্বাস ধীর ও উত্তপ্ত। হাত আবার সক্রিয় হয়ে তার স্তনের উপর এমনভাবে এলো, যেন ভুলবশত হয়ে গেছে। মেয়েটি হাতের উপর চপেটাঘাত করে সরিয়ে দিল। জুগগত সিং তার বাম হাত প্রসারিত করে মেয়েটির মাথার নিচে রাখলো এবং তার সচল হাতটি ধরে ফেললো। আরেক হাত আগে থেকেই জুগগতের শরীরের নিচে, মেয়েটির আর প্রতিরোধের উপায় নেই। 'আমার হাত ছাড়ো বলছি। তোমার সাথে আর কখ্খনো আমি কথা বলবো না।' সে তার মাথা প্রবলভাবে এপাশ ওপাশ করতে থাকলো জুগগতের ক্ষুধার্ত মুখকে এড়ানোর জন্যে।

জুগগত তার হাত ঢুকিয়ে দিল মেয়েটির কামিজের মধ্যে এবং বাড়ন্ত স্তনের আকৃতি অনুভব করলো। তার শক্ত হাত মেয়েটির স্তন থেকে নাভিমূল এবং নাভিমূল থেকে স্তন পর্যন্ত উঠানামা করছিল। তার পেটের উপরের ত্বক হাঁসের মাংসের মতো তুলতুলে।

মেয়েটির আপত্তি ও প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। 'না! না! না! তোমার দোহাই! আল্লাহর গজব পড় ক তোমার উপর! আমার হাত ছাড়ো বলছি। এরকম করলে আমি আর কখ্খনো তোমার সাথে দেখা করতে আসবো না।' জুগগত সিং এর সন্ধানী হাত মেয়েটির সালোয়ারের ফিতার এক প্রান্ত খুঁজে পেয়ে হ্যাঁচকা টানে ফিতার গিট খুলে ফেললো।

'ভালো হবে না বলছি।' মেয়েটি কর্কশ কণ্ঠে বললো।

একটি গুলির শব্দ রাতের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলো। বক দু'টি পানি থেকে উড়াল দিল একে অন্যকে ডেকে। কীকর গাছে কাকগুলো ডেকে উঠলো। জুগগত সিং একটু থেমে অন্ধকারের মধ্যেই গ্রামের দিকে তাকালো। মেয়েটি এই সুযোগে তার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে জামাকাপড় ঠিক করলো। কাকগুলো আবার গাছে নিরব হয়ে বসেছে। বক দু'টি উড়ে নদী অতিক্রম করছে। শুধু গ্রামের কুকুরগুলো চিৎকার করছে।

মেয়েটি ঘাবড়ে গিয়ে বললো, 'গুলির শব্দের মতো মনে হলো।' পুনরায় জুগগতকে প্রেমের খেলা থেকে বিরত করতে সে আবার উচ্চারণ করলো, 'শব্দটি কি গ্রামের দিকেই হলো?'

জুগগত তাকে পাশে টেনে এনে বললো, 'আমি জানি না। তুই পালাতে চেষ্টা করছিস কেন? এখন সব শান্ত হয়ে গেছে।'

'এটা প্রেম করার সময় নয়। গ্রামে নিশ্চয়ই খুন হয়েছে। বাবার ঘুম ভেঙ্গে গেলে জানতে চাইবেন, আমি কোথায় গেছি। এখনই আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

'না তুই যেতে পারবি না। আমি তোকে যেতে দেব না। তুই বলে দিস যে, তোর কোন বান্ধবীর সাথে ছিলি।'

'আহম্মক চাষার মতো কথা বলো না। কি করে...' জুগগত সিং তার মুখ দিয়ে মেয়েটির মুখ বন্ধ করে দিল। নিজের বিপুল দেহটা তুলে দিল তার উপর। মেয়েটি তার হাত ছাড়ানোর আগেই জুগগত আবার তার সালোয়ারের ফিতা খুলে ফেললো।

'আমাকে যেতে দাও! আমাকে...।'

জুগগত সিং এর সাথে শক্তিতে সে পেরে উঠবে না। সে আন্তরিকভাবে জোর খাটাতেও চাইছিল না। তার বিশ্ব সংকীর্ণ হয়ে গেল নিঃশ্বাসের ছন্দময় শব্দের মধ্যে। জুগগতের ধূলিময় ত্বকের উষ্ণতার গন্ধ জ্বরের তাপের মতো তপ্ত হয়ে উঠলো। তার ঠোঁট ঘুরে ফিরছিল মেয়েটির চোখ ও গালে। জিহবা দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল তার কানে। উত্তেজনার প্রাবল্যে সে জুগগতের হালকা দাড়িওয়ালা গালে নখ বসালো এবং নাকে কামড় দিল। তাদের উপরে আকাশের তারাগুলো উন্মাদের মতো ঘুরতে ঘুরতে যেন মেরী গো রাউন্ডের মতো ধীরে ধীরে নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। জীবন ফিরে এলো তার শীতল, নিম্নতম পর্যায়ে। মেয়েটি অনুভব করছিল তার উপর প্রাণহীন মানুষের ভারী ওজন; নদী তীরের বালি তার চুলে প্রবেশ করছিল। শীতল বায়ু বয়ে যাচ্ছিল তার নগ্ন দেহের উপর দিয়ে। আকাশের উজ্জ্বল তারাগুলোও যেন বাঁকা কামনাময় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সে জুগগত সিংকে ধাক্কা দিয়ে শরীরের উপর থেকে সরিয়ে দিল। তার পাশে শুয়ে পড়লো। 'এটাই তো তুমি চেয়েছিলে। আর পেয়েও গেলে। তুমি আসলেই একটা চাষা। সারাক্ষণ তোমার বীজ বুনতে চাও। দুনিয়াটা যদি জাহান্নামেও চলে যেতে থাকে, তখনো তুমি এসব চাইবে। গ্রামে গুলি চললেও চাইবে। তাই না?'

'কেউ বন্দুকের গুলি ছুড়ছে না। সব তোর কল্পনা।' জুগগত উত্তর দিল নিরুদ্বিগ্নভাবে, তার দিকে না তাকিয়েই। অস্পষ্ট বিলাপের শব্দ ভেসে আসছে গ্রাম থেকে নদী তীরে। শব্দটা শোনার জন্যে দু'জন বসলো। দু'টি গুলির শব্দ হলো পরপর। কীকর গাছ থেকে কাকগুলো উড়াল দিল ভয়ে কা কা শব্দ তুলে।

মেয়েটি কাঁদতে শুরু করলো। 'গ্রামে কিছু একটা ঘটেছে। বাবা জেগে উঠেই জানতে পারবেন আমি বাইরে। তিনি আমাকে মেরে ফেলবেন।'

জুগগত সিং ওর কথা শুনছিল না। সে বুঝে উঠতে পারছিল না যে, তাকে কি করতে হবে। গ্রাম থেকে যদি তার অনুপস্থিতি আবিস্কৃত হয়, তাহলে পুলিশ তাকে নিয়ে ঝামেলা করবে। এ ব্যাপারে তার তেমন তোয়াক্কা নেই, যতোটা সে ভাবছে মেয়েটির সমস্যা হতে পারে তা নিয়ে। সে হয়তো আর আসবে না। তাই বলছিল সে। 'আমি আর তোমার সাথে দেখা করতে আসবো না। আল্লাহ এবারের মতো আমাকে মাফ করলে একাজ আমি আর করবো না।'

'তুই কি মুখ বন্ধ করবি, না আমাকে তোর মুখ চেপে ধরতে হবে?'

মেয়েটি কাঁদতে শুরু করলো। তার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল যে এই লোকটিই এক মুহূর্ত আগে তার সাথে প্রেম বিনিময় করছিল।

'চুপ! কেউ এদিকেই আসছে।' ফিসফিস করে বললো জুগগত সিং। ভারী হাত মেয়েটির মুখের উপর রাখলো।

দু'জন স্থির শুয়ে অন্ধকারে চোখ মেলে রইলো। বন্দুক ও বর্শা হাতে পাঁচজন লোক তাদের কয়েক গজ দূর দিয়ে অতিক্রম করলো। তারা মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলেছে এবং কথা বলছে। মেয়েটি আস্তে বললো, 'ওরা ডাকাত! ওদেরকে কি তুমি চেনো?' 'হ্যাঁ,' জুগগত বললো। টর্চ হাতে লোকটি মাল্লি।' তার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। ওটা

একটা বাঞ্ছোৎ। হাজার বার ওকে বলেছি, এখন ডাকাতি করার সময় নয়। আর সে আমার গ্রামে ডাকাত দল এনেছে। ওর সাথে ব্যাপারটা নিয়ে বোঝাপড়া করতে হবে।'

ডাকাতরা নদীর দিকে এগিয়ে গেল এবং সেখান থেকে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এক জোড়া রাত জাগা পাখির ডাক রাতের নিস্তব্ধতা খান খান করে দিচ্ছে... টিট্ট--টিট্টি--টিট্টি-হুট-টিটি-হুট, টিট টিট টি হুই।

'তুমি কি পুলিশের কাছে নালিশ করবে ?'

জুগগত তার কথায় আমল দিল না। 'আমাকে খুঁজে না পাওয়ার আগেই গ্রামে ফিরতে হবে।' দু'জনই মানো মাজরার পথ ধরলো। জুগগত সামনে, মেয়েটি পিছনে। তারা বিলাপ ধ্বনি ও কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছে। মেয়েরা ছাদে উঠে একে অন্যের উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে। মনে হচ্ছে, পুরো গ্রাম জেগে উঠেছে। পুকুরের কাছে পৌছে জুগগত সিং থামলো এবং মেয়েটির সাথে কথা বলার জন্যে পিছনে ফিরলো।

মিনতির সুরে বললো, 'নূরু, তুই কি কাল আসবি?'

'তুমি আগামীকালের কথা ভাবছো, আর আমি আমার জীবন নিয়ে চিন্তিত। আমি খুন হলেও তো তোমার ভালো সময় কেটেছে।'

'আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' সে উঁচু গলায় বললো। 'কাল তুই আমাকে বলবি, কি ঘটেছে, অথবা পরশু, যখন এসব ঝামেলা কেটে যাবে। মনে রাখিস, মালগাড়ি যাওয়ার পর।'

'না, না! আমি যাবো না।' মেয়েটি উত্তর দিল। 'আমার বাবাকে আমি কি বলবো? এই গোলমালে নিশ্চয়ই তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে।'

'বলে দিস্. বাইরে গিয়েছিলি। পেট খারাপ ছিল বা ওই ধরনের কিছু। গুলির শব্দ শুনে লুকিয়ে ছিলি ডাকাতদের চলে যাওয়া পর্যন্ত। তাহলে পরশু আসছিস্ তো।'

'না।' আবার সে বললো; এবার কিছুটা কম জোরের সাথে। এই অজুহাতে কাজ হতে পারে। কারণ তার বাবা প্রায় অন্ধ। তিনি মেয়ের রেশমী জামা দেখবেন না, অথবা চোখের সুরমাও না। নূরান অন্ধকারে হারিয়ে গেল জুগগতের কাছে এই শপথ করে যে, আর কোনদিন সে যাবে না।

জুগগত সিং তার বাড়ির রাস্তা ধরলো। দরজা খোলা। বেশ ক'জন গ্রামবাসী উঠানে তার মায়ের সাথে কথা বলছে। সে নিরবে ঘুরে নদীর দিকে ফিরে চললো।

অন্যান্য মুসলিম বাড়িতে খবর দিতে যাওয়ার আগে ইমাম বক্স মসজিদ সংলগ্ন তার নিজের কুটীরে গেলেন। নূরান বিছানায় শুয়ে পড়েছে। মাটির দেয়ালের এক কোটরে তেলের প্রদীপ জ্বলছিল।

'নূরু, নূরু', মেয়ের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি ডাকলেন। 'উঠ্ নূরু।' মেয়েটি চোখ খুললো। 'কি হয়েছে, বাবা?'

'উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে নে। কাল সকালেই আমাদের যেতে হবে।' নাটকীয়ভাবে তিনি ঘোষণা করলেন।

'যেতে হবে ? কোথায়?'

'আমি জানি না... পাকিস্তানে।'

এক লাফে বিছানায় উঠে বসলো মেয়েটি। 'আমি পাকিস্তানে যাবো না।' সে প্রবল আপত্তি জানালো।

ইমাম বক্স ভান করলেন, তিনি শোনেননি। 'কাপড় চোপড় ট্রাংকে ভরে নে। আর হাঁড়িপাতিলগুলো চটের বস্তায়। মহিষটার জন্যে ও কিছু খড় নিয়ে নিস। ওটাকেও আমাদের সাথে নিতে হবে।'

'আমি পাকিস্তানে যাবো না।' মেয়েটি আরো জোরে প্রতিবাদ জানালো।

'তুই যেতে না চাইলেও' ওরা জোর করে বের করে দেবে। সব মুসলমান কাল শিবিরে যাচ্ছে।'

'কে আমাদের বের করে দেবে? এ আমাদের গ্রাম। পুলিশ এবং সরকার কি মরে গেছে?'

'পাগলামি করিস না, নূরু। তোকে যা বলছি, তাই কর। হাজার হাজার লোক পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে, অনেকে সেখান থেকেও আসছে। যারা রয়ে যাচ্ছে, তাদের খুন করা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নে।'

'আমাকে গ্রামের অন্যদেরকেও বলতে হবে, যাতে তারা তৈরি হয়ে নেয়।' মেয়েকে খাটিয়ায় বসা অবস্থায় রেখে ইমাম বক্স বের হয়ে গেলেন। নূরান দু'হাতে চোখ মুখ ডলে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলো। সে বুঝতে পারছেনা যে তাকে কি করতে হবে। রাতটা সে বাইরে কাটিয়ে দিতে পারে এবং সবাই চলে গেলে সে ফিরে আসবে। কিন্তু সে একা তা করতে পারে না। তাছাড়া বৃষ্টি হচ্ছে। তার একমাত্র ভরসা জুগগত সিং। মাল্লিকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। জুগগাও নিশ্চয়ই বাড়ি এসেছে। সে জানতো, এটা সত্যি নয়। কিন্তু আশা তো আছে এবং সে আশাই তাকে উদ্যোগী করে তুললো।

বৃষ্টির মাঝেই বেরিয়ে পড়লো নূরান। রাস্তায় অনেক লোককে অতিক্রম করলো সে। চটের বস্তা দিয়ে মাথা ঢেকে তারা যাচ্ছে। পুরো গ্রাম জেগে আছে। অধিকাংশ বাড়িতে সে দেখতে পাচ্ছে বাতির মৃদু আলো। অনেকে জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করতে তাদের সাহায্য করছে। অধিকাংশ লোক শুধু তাদের বন্ধু গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলছে। মেয়েরা মেঝের উপর বসে একে অন্যকে জড়িয়ে কান্নাকাটি করছে। মনে হচ্ছে, প্রত্যেক বাড়িতে এক একটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে।

নূরান জুগগার বাড়ির দরজায় ঝাঁকুনি দিল। দরজার পিছনের শিকলটা ঝনঝন করে বেজে উঠলো। কিন্তু ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। আবছা আলোতে সে লক্ষ্য করলো, দরজা বাইরে থেকে আটকানো। সে খিল খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো। জুগগার মা বাইরে গেছে। হয়তো কোন মুসলিম বান্ধবীর সাথে দেখা করতে। ঘরে কোন আলো নেই। নূরান একটি খাটিয়ার উপর বসলো। সে একা জুগগার মায়ের মুখোমুখি হতে চায় না। আবার বাড়ি ফিরে যেতেও চায় না। কিছু একটা ঘটুক, এমন আশা করছে সে– এমন কিছু, যাতে সে দেখতে পায়, জুগগা ফিরে এসেছে। সে বসে অপেক্ষা ও আশা করতে লাগলো।

এক ঘণ্টা ধরে নূরান আকাশে ধূসর মেঘের ছায়া লক্ষ্য করলো, একটি মেঘখণ্ড আরেকটিকে অতিক্রম করছে। কখনো গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ঝরছে, আবার কখনো অঝোরে ঝরছে। এরপর আবার গুড়ি বৃষ্টি। সে কর্দমাক্ত রাস্তায় সতর্ক পদশব্দ শুনলো। দরজার বাইরে শব্দ থেমে গেল। কেউ দরজায় ধাক্কা দিল।

'ঘরে কে?' এক বৃদ্ধা মহিলার কণ্ঠ।

নূরান স্তব্ধ হয়ে গেছে। সে নড়লো না।

'ওখানে কে?' রেগে মহিলা জানতে চাইলো। 'কথা বলছো না কেন?'

নূরান উঠে দাঁড়ালো এবং তোতলাতে তোতলাতে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলো, 'বিবি।'

মহিলা ঘরে প্রবেশ করে দ্রুত দরজা বন্ধ করলো।

'জুগগা! তুই কি জুগগা?' সে ফিসফিস করে বললো। 'ওরা তোকে ছেড়ে দিয়েছে?'

'না, বিবি, আমি--- নূরান। চাচা ইমাম বক্সের মেয়ে।' শান্তভাবে উত্তর দিল মেয়েটি।

'নূর?' এই রাতের বেলায় এখানে কেন এসেছিস ?' রাগের সাথে বৃদ্ধা জানতে চাইলো।

'জুগগা কি ফিরে এসেছে?'

'জুগগার সাথে তোর কি?' তার মা বাধা দিল। 'তুই ওকে জেলে পাঠিয়েছিস। তুই ওকে বদমাশ বানিয়েছিস। তুই যে রাতের বেলায় ছিনালের মতো অন্যের বাড়িতে যাস, তা কি তোর বাপ জানে?' নূরান কাঁদতে শুরু করলো। 'আমরা কাল চলে যাচ্ছি।' তাতে বুদ্ধা মহিলার হৃদয় নরম হলো না। 'তোর সাথে আমাদের কি সম্পর্ক যে,তুই আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল। তোর যেখানে খুশী সেখানে যা।'

নূরান তার শেষ তাস খেললো। 'আমি যেতে পারি না। জুগগা আমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে।'

'এখান থেকে দূর হয়ে যা কুত্তী।' বৃদ্ধা মহিলা ফোঁস্ করে বললো 'তুই একটা মুসলমান তাঁতির মেয়ে। বিয়ে করতে চাস্ শিখ কৃষককে। বেরিয়ে যা, তা না হলে আমিই গিয়ে তোর বাপকে বলবো। পুরো গ্রামকে জানাবো। পাকিস্তানে চলে যা। জুগগাকে একা থাকতে দে।'

নূরান নিজেকে অত্যন্ত করুণ ও প্রাণহীন বলে মনে করলো। 'ঠিক আছে বিবি, আমি চলে যাবো। আমার সাথে রাগ করো না। জুগগা ফিরে এলে শুধু বলো, আমি 'সত শ্রী আকাল' বলতে এসেছিলাম।' মেয়েটি হাঁটু গেড়ে বসে মহিলার পা আঁকড়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। 'বিবি, আমি চলে যাচ্ছি এবং আর কখনো ফিরে আসবো না। বিদায়ের মুহূর্তে দয়া করে আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না।'

জুগগার মা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে আবেগের লেশমাত্র নেই। তবে ভিতরে ভিতরে একটু দুর্বল ও নরম হয়েছে। 'আমি জুগগাকে বলবো যে, তুই এসেছিলি।'

নূরানের কান্না থামলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার কান্না শুরু করলো। সে তখনো জুগগার মায়ের পা ধরে আছে। তার মাথা নিচু হতে হতে বৃদ্ধার পায়ের পাতা স্পর্শ করলো।

'বিবি।'

'আর কি বলার আছে তোর?' কি বলতে পারে সে সম্পর্কে পূর্ব ধারণা যেন তার আছে।

'বিবি।'

'বিবি! বিবি! কিছু বলার থাকলে বলে ফেল।' মহিলা নূরানকে পা থেকে সরিয়ে দিয়ে বললো। 'কি হয়েছে তোর?'

মেয়েটি ঢোক গিললো। 'বিবি, আমার পেটে জুগগার বাচ্চা। আমি পাকিস্তানে গেলে ওরা যখন জানতে পারবে যে, এই বাচ্চার বাবা একজন শিখ, তখন বাচ্চা মেরে ফেলবে।'

মহিলা নূরানের মাথা আবার তার পদতলে পড়তে বাধা দিল না। নূরান শক্তভাবে পা আঁকড়ে আবার কাঁদতে লাগলো।

'কতদিনের বাচ্চা?'

'অল্প ক'দিন হলো টের পেয়েছি। এখন দু'মাস চলছে।'

জুগগার মা নূরানকে উঠতে সাহায্য করলো এবং দু'জন খাটিয়ায় বসলো। নূরানের কান্না থামলো।

'তোকে আমি এখানে রাখতে পারবো না।' বৃদ্ধা অবশেষে বললো। 'পুলিশের সাথে এমনিতেই আমার অনেক সমস্যা। যখন এসব ঝামেলা শেষ হবে এবং জুগগা ফিরে আসবে; সে গিয়ে তুই যেখানে থাকবি, সেখান থেকেই খুঁজে বের করবে। তোর বাপ কি এ ঘটনা জানে?'

'না! বাবা জানলে অন্যের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে অথবা খুন করে ফেলবে।' সে আবার কাঁদতে লাগলো।

'চুপ! তোর কান্না এখন থামা।' বৃদ্ধা কঠোরভাবে মেয়েটিকে বললো। 'যখন শয়তানি করেছিস, তখন এসব মনে ছিল না। আমি তো তোকে বললাম যে, জুগগা জেল থেকে বের হলেই তোকে আনবে।'

নূরান তার কান্না থামাল। 'বিবি, সে যেন খুব বেশি বিলম্ব না করে।'

'নিজের গরজেই সে তাড়াতাড়ি করবে। সে যদি তোকে খুঁজে না পায় তাহলে একটা বউ কিনবে। অথচ এখন আমাদের কাছে কানা কড়িটিও নেই। বউ চাইলে সে তোকেই আনবে। ভয়ের কিছু নেই।'

একটি ভ্রান্ত আশা নূরানের হৃদয়কে পূর্ণ করলো। সে অনুভব করলো যে, এটাই তার বাড়ি এবং সে এই বাড়ির। সে যে খাটিয়ায় বসে আছে সেটা তার, মহিষ, জুগগার মা– সবকিছু তার নিজের। জুগগা যদি তাকে নিয়ে আসতে ব্যর্থও হয়, সে নিজেই চলে আসতে পারবে এবং সবাইকে বলতে পারবে যে, তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার কাল্পনিক

আশার উপর কালো মেঘের মতো ছায়া বিস্তার করলো তার পিতার চিন্তা। তাকে না জানিয়েই সে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে।

আকাশে আবার চাঁদ দেখা দিল।

'বিবি, সকালে সুযোগ পেলে আমি 'সত শ্রী আকাল' বলতে আসবো। সত শ্রী আকাল। আমাকে সব গোছগাছ করতে হবে।' নূরান গভীর আবেগে বৃদ্ধা মহিলাকে জড়িয়ে ধরলো। আবার সে সত শ্রী আকাল বলে বের হয়ে গেল।

খাটিয়ায় বসে জুগগার মা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত।

বীনা

'আজ কি কারো পক্ষে গুরুদুয়ারায় যাওয়া সম্ভব হবে?' জানতে চাইলেন সাবরাই।

"ডেপুটি কমিশনারের সাথে আমাকে সাক্ষাৎ করতে হবে," তার স্বামী বললেন। 'এ রকমের দিনে সবসময় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ভয় থাকে। সব ম্যাজিস্ট্রেটকে সতর্ক থাকতে হয়। আমি সময় পেলে যেতে চেষ্টা করবো।'

'আমাকে সেখানে থাকতে হবে,' শের সিং বললো। 'গুরুদুয়ারার সামনে আমরা একটি সমাবেশের আয়েজন করেছি।'

'সমাবেশে যাওয়ার আগে তুমি গুরুদুয়ারায় যাবে,' তার মা বললেন।

'এছাড়া,' বুটা সিং প্রশ্রয়ের অহংকারে বললেন, 'গোলযোগের কারণ ঘটতে পারে এমন কিছু বলো না। আমার অবস্থানের দিকে একটু খেয়াল রেখো। জাতীয়তাবাদীদের সাথে তোমার উঠাবসায় আমি কিছু মনে করি না। আসলে দু'দিকে তাল মিলিয়ে চলাই ভালো। কিন্তু অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।'

'না, না, পিতাজি', শের সিং বললো। 'আমি জানি আমাকে কি বলতে হবে, আর কি বলতে হবে না।'

মহিলাদের সাথে এ বিষয়গুলোর আলোচনা প্রচলিত নয়। বীনার যদি কোন কাজ না থাকে তাহলে সে মায়ের সাথে যাবে। সে জানে, গুরুদুয়ারায় যাওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ তার পিতার উপস্থিতিতে বিষয়টি উত্থাপন। 'আমার পরীক্ষার আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আছে। আমি সীতাকে বলেছি যে, ওর বাড়িতে গিয়ে একসাথে পড়াশুনা করবো। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে আমরা একে অন্যকে সাহায্য করি।'

'সে এখানে আসে না কেন?' সবারাই প্রশ্ন করলেন। সীতার বাড়িতে বীনার যাওয়া নিয়ে তিনি ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। তার কঠোর কণ্ঠে বুটা সিং বিরক্ত হলেন। কন্যাকে উদ্ধারে এগিয়ে এলেন তিনি।

'ওকে সীতার ওখানে যেতে দাও। আজ বাড়িতে ওকে খাবার বা চা দেয়ার জন্যে কেউ থাকবে না। আমি তোমাকে ওয়াজির চাঁদের বাড়িতে নামিয়ে দেব।'

তর্ক এখানেই শেষ হলো। বুটা সিং এর কথার উপর কেউ প্রশ্ন করেনা। শুধু চম্পক রয়ে গেল। সাবরাই চম্পকের পরিকল্পনা সম্পর্কে খুব জ্ঞাত নয়। সে যদি গুরুদুয়ারায় যায়, তাহলে তিনি কিছুই বলবেন না। সে যদি তার রুমে খিল মেয়ে পুরো ভলিউম দিয়ে রেডিও শোনে যা সে প্রায়ই করে, তাহলেও তিনি তাকে কিছু বলতেন না। তবু চম্পকের মনে হলো, পরিস্থিতি তার কাছ থেকে একটা ব্যাখ্যা দাবি করছে। 'অনেকদিন আমি

আমার চুল পরিষ্কার করিনি। চুল যদি ঠিকমতো শুকিয়ে যায়, তাহলে বিকেলে আমি গুরুদুয়ারায় যাবো, যদি সাথে যাওয়ার মতো কাউকে পাই। তা না হলে আমি বাড়িতেই থাকবো এবং সান্ধ্য প্রার্থনার পর গ্রন্থ তুলে রাখবো।'

বুটা সিং ঘড়ির দিকে তাকালেন। 'আমি যাচ্ছি,' চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করলেন তিনি এবং উঠে দাঁড়ালেন। 'তোমার বইপত্র নিয়ে এসো, বীনা।'

ওয়াজির চাঁদের বাড়ি বুটা সিং এর বাড়ির মতোই। পার্থক্যের মধ্যে শিখের পরিবর্তে একটি হিন্দু বাড়ি এবং ধর্ম পালনের ব্যাপারে বাড়ির কারো মধ্যেই তেমন মাথা ব্যথা নেই। বাড়িতে ধর্মের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ ড্রয়িং রুমের দেয়ালে টানানো কৃষ্ণের একটি বড় রঙিন ছবি। ওয়াজির চাঁদের স্ত্রী মাঝে মাঝে একটি ফুলের

মালা ছবিটির উপর ঝুলিয়ে দেন এবং ছবির নিচের ভিত্তি স্পর্শ করে কপালে ঠেকান। মহাত্মা গান্ধীর ছবিতেও তিনি একইভাবে মালা পরান যে ছবিটি সরিয়ে বেডরুমে টনিয়ে রাখা হয়েছে।

ওয়াজির চাঁদের বাড়ির প্রকৃত 'ঈশ্বর' তার পুত্র মদনলাল। বিশ বছরের সামান্য বেশি বয়সের দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক। একমাত্র পুত্র হওয়ার কারণে স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাকে বিয়ে করানো হয় এবং কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় সে সন্তানের পিতা হয়। পড়াশুনায় খুব ভালো করতে পারেনি সে, কিন্তু খেলাধূলায় সাফল্য অর্জনের মধ্য দিয়ে সেই ঘাটতি পূরণের চাইতেও বেশি করেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে প্রমোশন দিয়েছে। কলেজে সে ছয় বছর ধরে কাটাচ্ছিল, অথচ চার বছরে যে ডিগ্রী পাওয়ার কথা, তা সে নেয়নি। কিন্তু বাড়ির প্রতিটি রুমের বাতি রাখার আধারের উপর খেলাধূলায় তার অর্জিত ট্রফি যত্নের সাথে রাখা। তিন বছর ধরে সে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট একাদশের অধিনায়ক এবং সরকারি বৃটিশ দলের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব প্রদেশের হয়ে সে খেলেছে। খেলায় তার সাফল্য তাকে পাঞ্জাবের নায়কে পরিণত করেছে। বছরের খুব কম সংখ্যক দিনই গেছে যেদিন সংবাদপত্রে খেলার খবরের জায়গায় তার ব্যাপারে কোন না কোন তথ্য প্রকাশিত হয়নি। তার বাবা মা'র কাছে এটা ছিল দারুণ গর্বের ব্যাপার। সেজন্যে তার যে কোন মর্জির কাছে তারা ধরা দিতেন এবং বলতে গেলে পুত্রকে পূজা করতেন।

দীর্ঘ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মদনলালের সাথে তার ক্ষীণদেহী ছোটখাট গড়নের বোন সীতার মধ্যে একমাত্র মিল ছিল তাদের সুন্দর চেহারা। মদনলাল অপরিচিতের সাথে স্বচ্ছন্দ ও খোলামেলা। অন্যদিকে সীতা লাজুক এবং কথা বলতে অনভ্যস্ত। মদনলাল খেলা নিয়ে মেতে থাকে, আর খেলার ব্যাপারে সীতার কোন আকর্ষণ নেই। মদনলাল বই পছন্দ করেনা; সীতা সারাক্ষণ বই নিয়ে কাটায়। মদন যে পরীক্ষাগুলো পাস করেছে সে সব খুব কম লিখেই পাস করেছে, অন্যদিকে সীতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃত্তিলাভে সক্ষম হয়েছে। একজনের ক্রীড়া কুশলী হওয়ার সাথে আরেকজনের শিক্ষা অনুরাগী হওয়ার কারণে এবং উভয়ের আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী হওয়ায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী মহলে সবচেয়ে আকাংখিত পাত্রপাত্রীতে পরিণত

হয়েছিল। কয়েক মাস পিছে লেগে থাকার পর বীনা শেষ পর্যন্ত সীতার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সফল হয়েছে।

সীতাকে খুশী করার জন্যে বীনার প্রচেষ্টার কারণেই ওয়াজির চাঁদের বাড়ির সকল সদস্য ও সবকিছু সম্পর্কে সে অতিমাত্রায় উৎসাহী ছিল। সীতার বাবা মা'কে সে ইংরেজীতে সম্বোধন করতো 'আংকেল' ও 'আন্টি' বলে। মদন ও তার স্ত্রীকে পাঞ্জাবীতে ডাকাতো 'ভারজি' ও 'দিদি' বলে। তাদের ছেলের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলতো এবং তাকে শিখাতো 'আন্টি' বলে ডাকতে। সীতাকে শুধু সীতাই বলতো, কিন্তু প্রায় প্রতি বাক্যের সাথে নামটি জুড়ে দিতো, যেন এমনটি না করলে তাকে সে হারাবে।

বীনা যখন প্রবেশ করলো, তখন মদনলাল সবে তার সকলের প্রাকটিস শেষ করে ফিরেছে। তার শার্ট ঘামে ভিজে শরীরে সাথে লেপ্টে থাকায় প্রশস্ত রোমশ বুক দেখা যাচ্ছিল। যদিও গ্রীষ্মকাল, মদন কাঁধে ফ্লানেলের ব্লেজার বহন করছে। ব্লেজারের উপরের পকেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম এবং তার নিচে সোনালী সূতায় রোমান হরফের লিখাগুলো উৎকীর্ণ। সে তার পুত্রের সাথে খেলছিল, যে পিতার ক্রিকেট বুট পায়ে দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে। দৃশ্যটি বীনার কাছে চমৎকার লাগলো। সে ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে চুমো দিয়ে সিক্ত করলো।

'উম্‌ম্‌, উম্‌ম্‌! ছোট বাবু, পাপার জুতা পায়ে দিতে চায়। নমস্তে ভারজি।'

'সত শ্রী আকাল' মদন না উঠে এবং ঠোট থেকে সিগারেট না সরিয়েই উত্তর দিল।

বীনা ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলো এবং ওকে কোলে নিয়েই চক্রাকারে ঘুরলো। তার চুলের বেণী বাতাসে উড়ছিল। ছেলেটি ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করলে সে তাকে তার পিতার কোলে দিয়ে দিল। 'সে আমার চাইতে আপনাকেই বেশি পছন্দ করে। ভারজি, সীতা, লীলা দিদি এবং আন্টি ও আংকেল কোথায়?'

'বাবা ডেপুটি কমিশনারের সাথে দেখা করতে গেছেন। মা রান্নাঘরে। সীতা পড়ছে। লীলা তার রুমে, ওর শরীর ভালো নেই। আর তোমার সেবায় এই দাস আছে।' মদন উঠে মাথা নোয়ালো।

বীনা তার বিনয় প্রকাশকে গ্রাহ্য করলো না। 'হায়! হায়! লীলা দিদির আবার কি হলো?' অহেতুক উদ্বেগ প্রকাশ করলো সে। 'হায়' শব্দটি সে ঘন ঘন ব্যবহার করে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝাতে। 'আশা করি গুরুতর কিছু নয়। যাই, তাকে দেখি গিয়ে।'

'না, না, তেমন কিছু নয়। সামান্য শরীর খারাপ আর কি,' মদন উত্তর দিল। 'রুমেই আছে সে।'

বীনা ছেলেটিকে আবার কোলে নিয়ে লীলার রুমে গেল। সে ব্যাখ্যা করলো যে, আসলে সে অসুস্থ নয়; সকালের দিকে তার বমি বমি লাগছিল। বীনার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তার হাতের পিঠ বুলিয়ে বললো যে, তার যখন বিয়ে হবে তখন আরো ভালোভাবে বুঝবে। বীনা বুঝলো এবং বিব্রত হলো। তার মুখ লাল হয়ে উঠলো। সীতা তাকে নিতে না আসা পর্যন্ত সে লীলার সাথেই বসে রইলো। 'মদন বলেছে যে, আজ বিকেলে সে আমাদেরকে ম্যাটিনি শো দেখানোর জন্যে নিয়ে যেতে পারবে। আর দু'তিন

ঘণ্টা পড়াশুনা করে তার সাথে যেতে পারি। লীলাজি, তুমি বিকেলের মধ্যে আশা করি তুমি সেরে উঠবে, তাইনা ?'

'আমি বরং যাবো না। সিনেমা হলের গুমোট পরিবেশ আমি সহ্য করতে পারিনা। তোমার ভাই আমার উপর রেগে যাবে। তোমরা দু'জন ওর সাথে যাও।'

বীনার মধ্যে বিবেকের লড়াই চলছে। গুরুদুয়ারায় না যাওয়ার অজুহাত হিসেবে পড়াশুনাকে যথেষ্ট পবিত্র বলে বিবেচনা করা চলে। কিন্তু তার পরিবারে এখনো সিনেমাকে পাপের সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয়। একবার মাত্র তার পরিবার সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, একজন সন্যাসীর জীবন ভিত্তিক বা ধর্মীয় চেতনাসমৃদ্ধ সিনেমা ছিল বলে। নিয়মিত সিনেমা দর্শকদের তারা নিন্দনীয়ভাবে তামাশা প্রেমিক বলে বর্ণনা করে। তার মা যদি জানতে পারেন যে, সে গুরুদুয়ারায় যাওয়ার পরিবর্তে সিনেমা দেখে বিকেলটা কাটিয়েছে। তাহলে তিনি এটাকে সীতাদের বাড়িতে তার আসা বন্ধ করার কারণ হিসেবে দাঁড় করাতে পারবেন। সেজন্যে বীনা তাৎক্ষণিকভাবে বললো, 'না, না, আমি যেতে পারবো না। মাকে তো এ ব্যাপারে বলিনি।'

'আমাদের সাথে গেলে উনি আপত্তি করবেন না। আমি নিশ্চিত যে, উনি কিছু বলবেন না।' সীতা তাকে আশ্বাস দিল।

'এবং তোমার একনিষ্ঠ সেবক প্রতিদিন তোমাকে আমন্ত্রণ জানাবে না,' মদন ভিতরে প্রবেশ করতে করতে বোনের কথার সাথে যোগ করলো। 'তাছাড়া আমরা তো কাউকে বলতে যাচ্ছিনা। সিনেমা শুরু হওয়ার আগে আমরা ভিতরে প্রবেশ করবো। বিরতির সময় তুমি মুখটা ঢেকে রেখো।' মেয়েরা যেভাবে মুখ ঢাকে মদনলাল তার অনুকরণে মুখের উপর দিয়ে নিজের হাতটা ঘুরিয়ে নিল।

'এটা ঠিক ওরকম খারাপ নয়; বীনা হাসতে হাসতে বললো। 'তবু যদি বলে নিতাম তাহলেই ভালো হতো। কাল্পনিক মুক্তির পথে যাওয়ার চিন্তায় সে নিজেকে বলতে শুনলো, 'ঠিক আছে, আমি তোমার সাথে যাবো, কিন্তু আমাদেরকে আগে পড়তে হবে।'

এসময়ের মধ্যে সীতার রুমে বসে বীনা নোট ও বই পড়তে পড়তে ভাবছিল যে, যখন সে বাড়ি ফিরে যাবে, তখন কি বলবে। সে যদি কিছুই না বলে এবং তার বাবা মা টের পান তাহলে বাড়িতে তার সুনাম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে বহু মাস লেগে যাবে। সম্ভবতঃ সে কোন সময় আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে পারে যে, সে সীতার চাপে পড়ে সিনেমায় যেতে বাধ্য হয়েছিল। বীনার বয়স সতের বছর এবং তার অশিক্ষিতা মা তাকে খুব বেশি শাসাতে পারবেনা। ছায়াছবি নির্দেশনামূলক হতে পারে। যেটা তারা দেখতে যাচ্ছে। সেটি হয়তো ধর্মীয় চেতনার উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং সে তার মাকে তা দেখতে জোরও করতে পারবে। যখন তারা সিনেমা হলের উদ্দেশ্যে বাড়ি ত্যাগ করলো, তখন তার মনে ভীতি ও বিদ্রোহ ঘুরপাক খাচ্ছিল।

বীনা ও সীতাকে নেয়ার জন্যে একটি টোঙ্গা পাঠানো হয়েছিল। তারা পিছনের সিটে বসলো, আর মদন তার সাইকেলে উঠে তাদের পিছন পিছন আসছিল। সে সিল্কের নতুন হাফ শার্ট পরেছে এবং কাঁধে নিয়েছে সাদা ফ্লানেল ব্লেজার। মনোগ্রামে সোনালী ছাপের মনোগ্রাম ও লিখার উপর সূর্যের আলো পড়ায় চিকচিক করছিল। উচ্চকণ্ঠে দু'জনের সঙ্গে

কথা বলছে সে। এর মাঝে রাস্তায় সাক্ষাত হওয়া পরিচিত অনেকের সাথে মাথা ঝুঁকাচ্ছিল এবং হাত নাড়ছিল।

সিনেমা হলে দর্শকের উপচে পড়া ভিড়। আশেপাশের গ্রাম থেকে বৈশাখি উৎসব যোগ দিতে আসা কৃষকরা কম মূল্যের টিকেট বুথ ঘিরে রয়েছে এবং পানীয় বিক্রির স্টলগুলোর আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। টোঙ্গা ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিল এবং পোর্চে গিয়ে থামলো। হলের দু'জন কর্মচারী মদনলালের সাইকেল নেয়ার জন্যে এগিয়ে এল। সে সিনেমার নিয়মিত দর্শক এবং সারা শহরে তার অনেক ভক্ত। তাছাড়া সে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্র এবং ম্যাজিস্ট্রেট , পুলিশ তাদের বন্ধু ও পরিবারবর্গের তো সুযোগ আছে ক্ষমতা ব্যবহার করার।

সিনেমা হলের ম্যানেজার বের হয়ে এলেন তাদের অভ্যর্থনা জানতে এবং তাদের আসন দেখিয়ে দিতে। মদনলাল তার মানিব্যাগ থেকে একটি দশ টাকার নোট বের করে দিল। ম্যানেজার তার হাত ধরে নোটটা মানিব্যাগের ভিতরে ঢুকিয়ে সেটি মদনের পকেটে পুরে দিল। 'টাকার প্রশ্নই উঠেনা', তিনি প্রতিবাদ করলেন। মদন ম্যানেজারের কানে ফিসফিস করে জানালো যে, দ্বিতীয় মেয়েটি বুটা সিং এর কন্যা। ম্যানেজার বীনার দিকে ফিরে বিগলিত হাসি দিলেন। 'আপনার শ্রদ্ধেয় পিতা কেমন আছেন?' হাত কচলাতে কচলাতে বললেন তিনি। বীনা বিনয়ের সাথে জানালো যে, তিনি ভালো আছেন। 'শুনে খুশি হলাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি সবসময় ভালো থাকুন। তাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। যে কোন সময় আপনাদের পরিবারের যে কেউ সিনেমা হলে আসতে চাইলে দয়া করে আমাকে শুধু একটা ফোন করবেন। আমরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করবো।' বীনা তার পিতাকে তার কথা জানাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল।

তিনজনকে ভিআইপিদের জন্যে সংরক্ষিত একটি বক্সে নিয়ে যাওয়া হলো এবং কিছু খেতে বা পান করতে পীড়াপীড়ি করা হলো। বিরতির সময় তার অতিথেয়তা গ্রহণ করা হবে প্রতিশ্রুতি আদায়ের পর ম্যানেজার বিদায় নিলেন।

মদন দু'জনের মাঝখানের আসন গ্রহণ করলো। সে একটি সিগারেট ধরালো এবং সিগারেটের ধোঁয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যে বক্স আচ্ছন্ন হলো। তার গায়ে ছিটানো কলোনের সুগন্ধও নাকে আসছিল।

বাতি নিভে যাওয়ার সাথে সাথে পান, মিষ্টি, শরবত বিক্রেতা এবং শত শত দর্শকের কণ্ঠের চিৎকার থেমে গেল। প্রথমে পর্দায় ভাসলো সাবান, চুলের তেল এবং পরবর্তীতে যে ছায়াছবিগুলো প্রদর্শিত হবে সেসবের রঙিন বিজ্ঞাপন। দর্শকের মধ্যে শিক্ষিতরা উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে নামগুলো উচ্চারণ করছিল। এরপর ছায়াছবি শুরু হলো এবং তখনো যারা কথা বলছিল সজোরে গালি দিয়ে তাদের নিরব করা হলো।

মদনলাল তার সিগারেট ফ্লোরে পা দিয়ে নিভিয়ে আরেকটি ধরালো। আবছা অন্ধকারে সে লক্ষ্য করলো, তার বোন ছবির মধ্যে পুরোপুরি মগ্ন। সে সিগারেট বাম হাতে ধরে ডান হাত হালকাভাবে বীনার চেয়ারের হাতলে রাখলো।

বীনা তখনো তার এভাবে আসার পরিণতি সম্পর্কে স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারছেনা। ছায়াছবির মধ্যে মনোনিবেশ করে মন থেকে অবাঞ্ছিত চিন্তা দূর করতে এবং সীতা ও তার ভাইয়ের সাথে থাকার আনন্দ অনুভব করার চেষ্টা করলো। সিল্কের শার্ট, ফ্লানেলের ব্লেজারে মদনলালকে এতো হ্যান্ডসাম লাগছে, এতো আবেদনময় ভঙ্গিতে সে সিগারেট টানে এবং তার কলোনের সুগন্ধ স্বর্গীয় শীতল ও স্বচ্ছ।

মদনের হাত চেয়ারের হাতল থেকে পড়ে বীনার কনুই স্পর্শ করলো। মুহূর্তের জন্যে সে তার দম বন্ধ করে রাখলো। মদন হয়তো ছায়াছবির মধ্যে খুব আকৃষ্ট এবং তার হাত কোথায় তা হয়তো সে উপলব্ধি করেনি। সে তার কনুই সরিয়ে নিল না, তাতে মদন বিব্রত হতে পারে। তার এতো কাছাকাছি হতে পারা সুখকর। বিরতির আলো জ্বলে না উঠা পর্যন্ত তার হাত যেখানে ছিল, সেখানেই রইলো। অন্যমনস্কভাবে চুল ঠিক করে বোনের সাথে ছায়াছবি নিয়ে আলোচনা শুরু করলো।

ম্যানেজার আবার উপস্থিত হলেন। তার পিছনে এসেছে কয়েকজন বেয়ারার, বয়ে এনেছে শীতল পানীয়, আইসক্রিম, পটেটো ফ্রাই। সীতার সাথে কথা বলছেন ম্যানেজার। মদন বীনার দিকে ফিরলো। 'তুমি কি জানো যে, তোমার ভাই ও আমি ঘনিষ্ট বন্ধুতে পরিণত হয়েছি। অনেক বছর ধরে আমরা একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি, আর মাত্র অল্পদিন হলো আমরা পরস্পরকে জানি। ছাত্রদের মধ্যে সে খুবই জনপ্রিয়।'

'আপনার চাইতেও কি জনপ্রিয়, ভারজি? আমার বিশ্বাস হয় না। আমরা সবাই আপনার ক্রিকেট খেলা দেখেছি। দুনিয়ার সবাই দেখেছে।'

'ক্রিকেট খেলা কোন ব্যাপার হলো, মদন হতাশার সাথে বললো। 'আমাদের ভাই শের সিং আরো এগিয়ে যাবে। ছাত্র সংসদের সভাপতি পদে সে যে নির্বাচিত হবে, তা প্রায় নিশ্চিত। সে সবচেয়ে ভালো প্রার্থী এবং আমার সব বন্ধুসহ আমি তাকে ভোট দেব।'

'একা আপনার নামই তাকে নির্বাচিত করা উচিত। শহরের সবাই আপনাকে চিনে। বৃটিশ একাদশের বিরুদ্ধে যেদিন আপনি সেঞ্চুরী করেন তখন আমরা খেলা দেখেছি। আমরা প্রত্যেকে আপনাকে নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। ছক্কার পর ছক্কা মারছিলেন। সত্যিই চমৎকার ছিল আপনার খেলা।

'এটা কিছুই না। চেষ্টা করলেই তুমি ভালো ক্রিকেটার হতে পারো। তোমার চমৎকার এথলেটিক ফিগার।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো বীনা। প্রথম বার তাকে কেউ প্রশংসা করলো এবং সেটা মদন, সেরা মদন। 'কি বলছেন ভারজি, আমি দেখতে তেমন ভালো নই। অমন গতিতে ক্রিকেট বল আমার দিকে এলে আমি দেখতেই পাবো না।'

'তুমি অবশ্যই দেখতে পারবে। তোমার ওই চোখ দু'টো দিয়ে ছক্কা মারতে তুমি যে কোন কিছু করতে পারবে,' ম্যানেজার এবং সীতা যাতে শুনতে না পারে সেজন্যে বীনার দিকে ঝুঁকে সে বললো।

'হায়, ভারজি, আপনি তো ভয়ঙ্কর মানুষ। আমার মতো মেয়েকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন।'

বেয়ারার ক'জন খালি গ্লাস ও প্লেট নিতে আসায় তাদের আলোচনা বাধাগ্রস্ত হলো। ম্যানেজার তখনো অদৃশ্য সাবান দিয়ে তার হাত ধুচ্ছেন। ছায়াছবি শেষ হলে আবার দেখা করতে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বিদায় হলেন।

বাতি নিভে যাওয়ার সাথে মদনলাল বীনার চেয়ারের হাতলে হাত রাখলো। এবার বীনা জানে যে, এটা দুর্ঘটনাবশতঃ নয়। সে বিশ্বাসই করতে পারছেনা যে কেউ এবং সেটা মদন, তার মতো সহজ সরল মেয়েকে প্রশংসা করতে পারে। এটা অবিশ্বাস্য রকমের চাটুকারিতা। কিন্তু সে বিবাহিতা এবং কাজটা ঠিক হচ্ছে না। মদনের আঙ্গুল তার কনুই আঁকড়ে থাকায় তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বীনার আর কোন সন্দেহ থাকে না। সে হাত সরিয়ে নিলে কি মদন রাগ করবে? সীতা দেখলে সে কি ভাববে? মদন তার হাতে চাপ দিতে শুরু করলো। বীনা নড়লো না। অতঃপর তার হাত বীনার স্তনের উপর স্থাপন করলো। সে কেঁপে উঠে চেয়ারের এক প্রান্তে নিজেকে গুটিয়ে নিল। মদন শান্তভাবে আরেকটি সিগারেট ধরালো এবং তার দিকে আর খেয়াল করলো না।

সিনেমা হল থেকে বের হবার পর তারা দেখলো রাস্তা লোকে লোকারণ্য। আনন্দে উৎফুল্ল কৃষক, টোঙ্গা, সাইকেল ও হকারদের ভিড়। হলের টিকেট বুথকে মনে হচ্ছে মৌচাকে মৌমাছির ভিড়ের মতো। ক্লান্ত দর্শকরা বের হয়ে আসছে, আর নবাগতরা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে ভিতরে প্রবেশের জন্যে।

পোর্চে তাদের জন্যে টোঙ্গা অপেক্ষমান এবং একজন কর্মচারী মদনের সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যানেজার অবনত হয়ে তাদের সালাম করলেন। তিনি হাসছিলেন এবং তখনো হাত কচলাচ্ছিলেন। তিনি তাদের বিদায় দেয়ার আগে বারবার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তারা যেন এ সিনেমা হলকে তাদের নিজেদের বলেই বিবেচনা করে। ভিড়পূর্ণ রাস্তা দিয়ে তারা চললো। টোঙ্গা চালক পথচারীদের সরিয়ে দিতে চিৎকার করছিল। মদন ধীরে ধীরে টোঙ্গার পিছনে সাইকেল চালিয়ে আসছিল। টোঙ্গ যখনই থেমে যাচ্ছিল, সে এক পা মাটিতে রেখে সাইকেল থামাতো এবং আবার চালানোর সময় পা দিয়ে একটু ঠেলা দিচ্ছিল। ফেরার পথে সে কথাও বললো না, এমনকি বীনার দিকে তাকালোও না।

বীনাকে প্রথমে তার বাড়িতে নামিয়ে দেয়া হলো। সে তড়িঘড়ি 'নমস্তে' বলে বাড়ির মধ্যে হারিয়ে গেল। তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে, শুধু চম্পক বাড়িতে ছিল এবং সেও রেডিওতে গান শুনতে ব্যস্ত বলে বীনা তাকে বিরক্ত করলো না। বীনা নিজের রুমে প্রবেশ করে ভিতর থেকে খিল আটকে দিল। গরমের মধ্যে সে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। অন্ধকার হয়ে গেলে সে টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালালো এবং বিছানায় শুয়েই ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

চম্পক

বুটা সিং এর বাড়িতে গোপনীয়তার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিবাহিত দম্পতিদের জন্যে তাদের নিজস্ব বাথরুমের ব্যবস্থাসহ প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বেডরুম আছে। চম্পকের জন্যে যতটা সময় সম্ভব সে তার নিজের রুমেই রেডিও নিয়ে কাটায়। স্নান করতে সে প্রচুর সময় নেয়। ধর্মীয় ছুটির দিনগুলোতে সবাই যেহেতু বাড়ির বাইরে যায়, সে বাড়িতে কাটায়। ড্রেসিং গাউন পরে, খোলা চুল কাঁধের উপর ছড়িয়ে আঙ্গিনায় পায়চারি করে এবং জোরে জোরে গান গায়।

বৈশাখির দিনে সাবরাই মান্ডুকে নির্দেশ দিয়েছিল রান্নাঘরের হাঁড়ি বাসন মাজতে ও চম্পকের স্নানের পানি গরম করে দিতে। চম্পক আপত্তি করেছে যে, গরম পানির প্রয়োজন নেই, কিন্তু তার শাশুড়ি তার কথা বলেছেন। 'গরম পানিতে চুল ভালো পরিষ্কার হয়।'

চম্পক চুপ করে রুমে বসে ছিল। সে রেডিও খুলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে তার প্রিয় ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়তে থাকে। একটু পর ম্যাগাজিনটি ফ্লোরে ছুঁড়ে দিয়ে আঙ্গিনার দিকে তাকায়। মান্ডু পাছায় ভর করে ছাই দিয়ে একটি বিরাট পিতলের কলসী মাজছিল। তার পাশে চুলার উপর টিনের বড় একটি পাত্র।

'মান্ডু, পানি গরম হয়েছে, না হয়নি?'

ছেলেটি তার ময়লা হাতে চুলার পাত্রটি স্পর্শ করলো। 'না, বিবিজি, এখনো হয়নি। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে গরম হয়ে যাবে।'

সে হাঁটু গেড়ে বসে চুলায় ফুঁ দিতে শুরু করলো। ছাই এবং ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠলো। ধোঁয়ার প্রভাবে মান্ডুর চোখ জ্বালা করছে। সে দাঁড়িয়ে তৈলাক্ত শার্টের কোনা দিয়ে চোখের পানি মুছলো। শার্ট ছাড়া সে পরেছে এক টুকরা লাল কাপড়, যা দিয়ে শুধু তার সম্মুখভাগ ঢাকা সম্ভব হয়েছে। নিতম্ব উন্মুক্ত, শুধু লাল কাপড়ের টুকরার একটি অংশ নিতম্বের মাঝ দিয়ে এসে কোমরে বাঁধা ফিতায় আটকে আছে।

'গরম হলেই পানি বাথরুমে দিয়ে যাবি।'

চম্পক বিছানা থেকে উঠে তার আলমারি খুললো। শাড়ির ভাঁজ থেকে শেভ করার সরঞ্জাম বের করে বাথরুমে প্রবেশ করলো। সে বাথরুম অথবা আঙ্গিনার দিকে খোলা বেডরুমের দরজা বন্ধ করলো না। মান্ডু তার চলাফেরার ক্ষেত্রে বাধা নয়। সে চাকর এবং এসব ব্যাপারে এখনো ছোট্ট বালক। তার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলো সে।

কয়েক মিনিট পর সে বেডরুমে ফিরে এলো, গায়ে কোন কাপড় না রেখেই। শেভিং সরঞ্জাম যথাস্থানে রেখে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নার সামনে দাঁড়ালো তার শেভের ফলাফল পরীক্ষা করে দেখার জন্যে এবং নিজের চকোলেট ব্রাউন দেহের গঠন দেখে

নিজেই বিমুগ্ধ হলো। চুল ছড়িয়ে দিয়ে সে ঘুরে দাঁড়ালো পিছন থেকে দেখতে তাকে কেমন লাগে তা যাচাই করতে। নিতম্ব যেখান থেকে তরমুজের মতো গোল হয়ে উপরে উঠছে তার চুল সে স্থান পর্যন্ত লম্বিত। কোমরের দু'পাশে পিছনের দিকে টোলের মতো। আরেকবার সে পিছন ঘুরে দাঁড়ালো, গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিল। হাতের তালু দিয়ে স্তন দু'টি উঁচু করে ধরলো এবং আঙ্গুল দিয়ে স্তনের বোটা ঘষতে থাকলো, যতক্ষণ পর্যন্ত বোটা দু'টি জামের আকৃতি ধারণ না করলো। এরপর মাথার উপর হাত দু'টি যুক্ত করে হাওয়াই দ্বীপের নর্তকিদের ভঙ্গিমায় নিতম্ব দোলাতে লাগলো। সে তার পেট কুঞ্চিত করে হাত দিয়ে হাঁটু স্পর্শ করার চেষ্টা করছিল। আয়নায় মুখ দেখে নগ্ন মডেলের সকল ভঙ্গিমায় নিজেকে দেখার মহড়া দিল। আয়নায় সে নিজের পরিতৃপ্তির প্রতিফলন দেখতে পেল।

আঙ্গিনায় মান্ডু তার হাড়ি বাসন মেজে শেষ করেছে এবং হাঁটু গেড়ে উঁচু হয়ে আরেকবার চুলার ফুঁ দিচ্ছে। উল্টো দিক থেকে তাকে ব্যাং এর মতো দেখাচ্ছে।

পরিতৃপ্তির সাথে হেসে চম্পক বাথরুমে ফিরে গেল। যাওয়ার আগে আঙ্গিনার দিকে দরজা ভেজিয়ে দিলেও খিল বন্ধ করেনি। বাথরুম থেকে সে পানির জন্যে চিৎকার করলো। বালতির উপর পানির ট্যাপ খুলে দিয়ে রেডিওতে ভেসে আসা গানটি গুনগুন করে গাইতে শুরু করেছিল সে।

মান্ডু গরম পানির পাত্রটির উপরে যুক্ত কাঠের হাতলটি ধরে তুললো। ভারী পাত্রটি নিয়ে প্রতিবারে কয়েক পা এগিয়ে থামতে হচ্ছিল তাকে। বাথরুমের দরজায় পৌঁছে সে পানির পাত্র নামিয়ে রাখলো চৌকাঠের উপর দিয়ে ভিতরে রাখার আগে দম নেয়ার জন্যে। দু'হাত দিয়ে সে হাতলটি ধরে কপালের ধাক্কায় দরজা খুলে পাত্রটি ভিতরে নিয়ে গেল। বালতির পাশে গরম পানির পাত্র রেখে সে উপরে তাকালো।

'বাথরুমে ঢোকার আগে তুই আমাকে ডাকতে বা দরজায় টোকা দিতে পারলি না?'

দু'হাত উরুসন্ধিতে স্থাপন করে চম্পক তার নগ্নতা ঢাকলো। তার কালো চুল গলার দু'পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। দু'হাতের ফাঁক দিয়ে স্তন দেখা যাচ্ছে। মান্ডু তার কথার উত্তর না দিয়ে বোকার মতো তাকিয়ে থেকে দরজার দিকে ফিরলো।

'আমি গরম পানি কোথায় মিশাবো? বালতি এবং পাত্র দু'টিই তো পানিতে ভরা।'

মান্ডু ট্যাপ বন্ধ করে দিয়ে বালতি কাঁত করে কিছু পানি ঢেলে দিল এবং পিতলের একটি ছোট মগ দিয়ে গরম পানি বালতিতে ভরতে থাকলো। চম্পকের হাঁটু থেকে উপরে উঠছে না মান্ডুর চোখ। চম্পক যেভাবে ছিল সেভাবেই হাত দিয়ে নগ্নতা ঢেকে ছেলেটির বিব্রত দশা দেখছিল।

'ভবিষ্যতে ভিতরে আসার আগে দরজায় টোকা দিবি। মাঝে মাঝে আমার গায়ে কোন কাপড় থাকে না।'

'জানো, আজ কি ঘটেছে! হায় গুরু। আমি তো লজ্জায় প্রায় মরেই গেছিলাম।' চম্পক তার কথার সময়ে কোন কিছুকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইলে সবসময় 'হায় গুরু', বা 'আমার গুরু' শব্দ দু'টি যোগ করে। আলোচনাকে সবসময় নিজের দিকে টানার অভ্যাস তার। তার প্রতি কোন প্রশংসা হোক, রাস্তায় তার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেয়া বাজে মন্তব্য হোক অথবা কেউ তার দিকে লাম্পট্যের দৃষ্টিতে তাকালে অনিবার্যভাবেই তার কথার সাথে 'হায় গুরু' যোগ হবেই এবং বিব্রত হয়ে সে যে প্রায় মরে যাচ্ছিল সে কথাও

থাকবে। এসবের প্রতি তার স্বামীর কৌতুহল সামান্য। তাছাড়া সেদিন সন্ধ্যায় তার মনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছিল। অতএব চম্পক কি বলছে, তা সে ভালোভাবে শোনেনি।

'সারাটা দিন তোমার বাড়িতে থাকা উচিত হয়নি; অন্ততঃ মেলায় যেতে পারতে। আমার সমাবেশে কতো লোক জড়ো হয়েছিল! প্রথমে এসভিসি'র কুচকাওয়াজ। বেসামরিক লোকদের এমন চৌকস কুচকাওয়াজ এর আগে কেউ দেখেনি। এখন এসভিসি মানে কিছু একটা। এরপর আমি বক্তৃতা করলাম। সম্পূর্ণ পিনপতন নিরবতা।' শের সিং এর বর্ণনার মধ্যে 'পিনপতন নিরবতা' শব্দটি তার খুব প্রিয়। তাছাড়া সে প্রায়ই উপচে পড়া ভিড়, 'সবকিছু ত্যাগ করতে হবে' এবং 'শত্রুতা এড়িয়ে চলতে হবে' বাক্যগুলো ব্যবহার করে। 'তাই নাকি। চমৎকার!' উৎসাহের সাথে চম্পক সাড়া দিল। 'একদিন তুমি সরকারের মন্ত্রী হবে এবং তখন আমাদের বাড়ির উপর একটি পতাকা উড়বে। আমাদের সরকারি গাড়ি থাকবে, ইউনিফর্ম পরা পিয়ন থাকবে। তখন আমরা তোমার এই আহম্মক মাভুকে বাদ দিতে পারবো। তোমার কি এরকম পরিকল্পনা নেই।'

'আছে, অবশ্যই আছে,' শের সিং ধৈর্য হারিয়ে বললো। 'গরীব বেচারি, সামান্য পয়সার বিনিময়ে কাজ করে। শহুরে সমাজে গৃহ-ভৃত্যদের অবস্থা বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনের চব্বিশ ঘণ্টা তাদেরকে দিয়ে কাজ করাই, কম বেতন দেই, কম খেতে দেই এবং পরনের জন্যে উপযুক্ত কাপড়ও দেই না। তাদের থাকার জায়গা নোংরা। যখন খুশী তাদের গালিগালাজ ও মারধোর করা হয়। তাদের জিনিসপত্র অপমানজনকভাবে হাতিয়ে দেখার পর বিনা নোটিশে কাজ থেকে বাদ দেয়া হয়। খুব আপত্তিকর এসব। এ অবস্থার অবসান হওয়া উচিত এবং আমাকেই এটা বন্ধ করতে হবে।'

'আমার বিশ্বাস আছে যে, তুমি তা পারবে। কিন্তু এই মাভুটা.....আসলেই।'

'ওকে নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে? অন্য চাকরদের সাথে তার কোন পার্থক্য নেই। সমস্যা হচ্ছে, আমরা কখনো নিজেদের দোষ দেখিনা। লোকদের সাথে যখনই আমার কোন সমস্যা হয়, আমি নিজেকে তাদের পদতলে সমর্পণ করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই বুঝতে চেষ্টা করি। এটি খুব ভালো নীতি।'

শের সিং ও তার স্ত্রী একে অন্যকে নিজ নিজ বিষয় শোনাতে ব্যস্ত। অতএব উভয়েই উদ্যোগটা পরিহার করলো।

খুব গরম। সিলিং ফ্যান ঘরের ভিতরের বাতাসকেই ঘোরাচ্ছে। পরিবারের অন্য সদস্যরা ছাদের উপর চাঁদের আলোর শীতলতায় শুয়ে আছে। এমনকি মনিব বাড়িতে থাকলে যে ডায়ার কখনো তার পাশ ছেড়ে যায় না, সেও রাতের বেলায় রুমের মধ্যে থাকতে চায় না। শের সিংকে তার স্ত্রীর কারণে ঘরের মধ্যে গরমে থাকার কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। ঘড়ির দিকে দেখলো সে। 'রাত এগারটা বাজে। আমার মনে হয়নি যে, এতো রাত হয়েছে। এতো ক্লান্তিকর ছিল সারাটা দিন।' হাত উপরের দিকে উঠিয়ে সে হাই তুললো।

'তোমার মা এখনো গুরুদুয়ারা থেকে ফিরেননি। হয়তো শোভযাত্রা এখনো শেষ হয়নি।'

'আমি তার কথা জানি না, কিন্তু আঙ্গিনা থেকে বাবার নাক ডাকার শব্দ পেয়েছি। বীনার রুমে বাতি জ্বলছিল। হয়তো সে পড়ছিল।'

পাগড়ি ও ইউনিফর্ম খোলার আগে শের সিং বেশ খানিক সময় ধরে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলো। এরপর সে বাথরুমে গিয়ে শরীরে কয়েক মগ পানি ঢেলে ফ্যানের নিচে দাঁড়ালো পানিতে শুকিয়ে নিতে। আয়নায় নিজেকে দেখলো। তার উদরের স্ফীতি কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। সে পেট কুঞ্চিত করে ভাবলো, যখন অবস্থা এমন ছিল তখন তাকে কতো সুন্দর দেখাতো। সে ঝুঁকে তিনবার পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করে পেটের উপর প্রভাব পুনরায় দেখলো। এরপর হালকা সূতী শার্ট ও পাজামা পরিধান করলো। আলো নিভিয়ে দেয়ার আগে সে রুমের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল যে, সবকিছু জায়গামতো আছে। চম্পক তার গাউন খুলে ফেলেছে এবং পুরো নগ্ন অবস্থায় উপুড় হয়ে শুয়েছে। তার দু'হাতের মাঝে বালিশ এবং পা দু'টো প্রসারিত। শের সিং জানে যে, এর মানে কি। 'হায় ঈশ্বর, ভীষণ ক্লান্তি লাগছে আমার,' জড়ানো কণ্ঠে উচ্চারণ করে শের সিং বাতি নিভিয়ে দিল।

চম্পক তার এক হাত বাড়িয়ে স্বামীর হাত ধরলো। 'এখন অন্ধকার, এখন তোমার মান্ডু সম্পর্কে তোমাকে বলতে পারি। তুমি ওকে যেমন নিরীহ মনে করো, আসলে সে মোটেই তা নয়!'

'তাই নাকি? সে কি করেছে?' হাই তুলতে তুলতে শের সিং বললো।

'আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে বলছি,' বিড়বিড় করে সে বললো স্বামীর হাত ধরে টেনে।

শের সিং তার বিছানায় গিয়ে চম্পকের হাত তার হাতের উপর রাখতে দিল। 'আমি যখন স্নান করি, সে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়।'

'তুমি কি করে বুঝলে?'

'আমি জানি। আর আজ তো সে গরম পানি দিয়ে যাওয়ার ভান করে আমার বাথরুমে ঢুকে পড়েছিল। আমার গায়ে একটা সূতাও ছিল না! হায় গুরু, আমি লজ্জায় মারা যাচ্ছিলাম আর কি।'

'তুমি বাথরুমের দরজা বন্ধ করোনি কেন ?'

'এমন তো কখনো ঘটেনি। আমি ভেবেছি, সবাই বাইরে। যাই হোক না কেন, ভিতরে আসার আগে তো ওর উচিত ছিল দরজায় টোকা দেয়া।'

'আমারও তো তাই মনে হয়। বেচারা, ছোট্ট ছেলে।' সে বললো। 'চলো ঘুমিয়ে পড়ি।' এক মিনিট পরই গভীরভাবে সে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলো।

চম্পক তার শরীর মোচড়ালো। সে গোঙানির শব্দ করলো, যেন দুঃস্বপ্ন দেখেছে এবং স্বামীর আরো নিকটবর্তী হলো। সে তার হাতটা ধরে শরীরের নিচের দিকে নিয়ে গেল। শের সিং জানে, পালাবার আর পথ নেই।

'তুমি কি করেছো?'

'তোমাকে কিছু বৈচিত্র দেয়ার জন্যে।'

ভাগমতি

ভাগমতি আর্মচেয়ারে দু'পা তুলে একটি বই এর পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিল। তার বাম হাতের দু'আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট। সিগারেটে সুখটান দিয়ে সে কার্পেটের উপর ছাই ঝাড়লো। মাথার চুলে সে প্রচুর তেল মেখেছে এবং প্রজাপতির মতো করে চুল বেঁধেছে। কৃত্রিম সিল্কের চকচকে গোলাপি রং এর শাড়ি তার পরনে। ব্লাউজের রং ঘন নীল। সাদা স্যান্ডেলের উপর আঙ্গুলের দিকে বো টাই এর মতো করা। ভাগমতি দিল্লির সবচেয়ে বাজে পোশাকে সজ্জিতা বেশ্যা।

টেবিল ল্যাম্পের আলোতে দেখা গেল তার মুখের উপর পাউডার ও রোজের পুরু প্রলেপ। কিন্তু এ প্রলেপ দিয়ে তার গায়ের কালো রং বা গুটি বসন্তের দাগ, কোনটাই গোপন করা যায়নি। চোখে কাজলের দাগ টেনেছে লম্বা করে। ঠোঁটে সস্তা কড়া রং এর লিপস্টিক মাখা। পান খেয়ে সে দাঁত রঙ্গিন করে ফেলেছে। এভাবে ভাগমতিকে মনে হবে দিল্লিতে সবরাচর দৃষ্ট সাধারণ বেশ্যার মতোই।

'এই যে, আপনি বিলাত থেকে ফিরেছেন।' আমাকে প্রবেশ করতে দেখেই সে বললো এবং কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলে চললো, 'আপনার কাছে এগুলো কেমন বই? কোন ছবি নেই।' কথার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সাথে সে মাথা ঝাঁকাচ্ছে এবং হিজড়াদের সহজাত ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে। 'ছবি ছাড়া কালো অক্ষরগুলো যেন মরা মাছি।' এবার সে প্রসঙ্গ পাল্টায়, 'লন্ডনে গোরা খচ্চরীগুলোর উপর যখন সওয়ার হয়েছেন, তখন কি এই হতভাগী ভাগমতির কথা আপনার মনে পড়েছে?' ভাগমতি আসলেই দিল্লির সবচেয়ে কর্কশ ও রূঢ় বেশ্যা।

ভাগমতি অন্যান্য মহিলাদের মতো নয়। সে আমাকে তার অতীত জীবন সম্পর্কে কিছু বলেছে, বাকিটা আমি নিজে আবিষ্কার করেছি। জুমা মসজিদের কাছে ভিক্টোরিয়া জেনানা হাসপাতালে ভাগমতির জন্ম। তার পিতা যখন ডাক্তারের কাছে জানতে চেয়েছিল যে, 'এটা কি, ছেলে না মেয়ে?' ডাক্তার উত্তর দিয়েছিল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।' তার বাবা মা'র ইতোমধ্যে তিনটি পুত্র সন্তান ছিল। অতএব তারা তাদের চতুর্থ সন্তানের নাম রাখলো মেয়ের নামে– 'ভাগমতি।'

তাদের বাড়িতে যখন একদল হিজড়া নাচতে ও গাইতে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাদের বাচ্চা দেখান। সে ছেলে না মেয়ে অথবা কষে গালি দিল এবং নাচগানের জন্যে টাকা পয়সা না দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিল। যখনই তারা সেই মহল্লায় আসতো, তখন তাদের দরজায় থেমে বলতো, 'আপনাদের ছোট বাচ্চাটাকে দেখান। সে যদি আমাদের মতো হয়, তাহলে ওকে আমাদের হাতে তুলে দিন।'

ভাগমতির মায়ের আরো দু'টি সন্তান হলো– দু'টিই মেয়ে। এই মেয়ে দু'টি হবার সময়েও ভাগমতির পিতা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল এবং ডাক্তারকে পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ জানিয়েছিল যে, সে ছেলে না মেয়ে। দু'বারই ডাক্তার তার গোপন অঙ্গ পরীক্ষা করে বলেছিল, 'আমি নিশ্চিত নই। দু' এর মিশ্রণ।' ভাগমতির বয়স যখন চার বছর তখন তার বাবা মা'র শেষ সন্তান হলো। হিজড়াদের আগমন ঘটলে তার বাবা তাদেরকে একুশ টাকা দিয়ে বললেন, 'এখন আমার তিন ছেলে, দুই মেয়ে। তোমরা একে নিয়ে যেতে পারো। সে তোমাদেরই একজন।'

হিজড়াদের দল ভাগমতিকে নিয়ে এলো। তারা তাকে গান গাইতে, হাততালি দিতে এবং হিজড়াদের মতো নাচতে শিখালো। যখন তার বয়স তের বছর, তখন তার গলার স্বর পুরুষদের মতো হয়ে গেল। তার ঠোঁটের উপর লোম গজাতে শুরু করলো। থুতনির পাশে এবং বুকে লোমের উদগম হলো। অন্যদিকে তার স্তন ও নিতম্ব ছেলেদের চাইতে আকৃতিতে বাড়লো, কিন্তু তার বয়সী মেয়েদের মতোও হলো না। তার ঋতুস্রাব শুরু হলো। গোপনাঙ্গের গঠন মেয়ের মতো হলেও তাতে বৈচিত্র ছিল। তার ভগাঙ্কুর আকৃতিতে বড়, বাকি সবকিছু মেয়েদের মতো। এবার সে নিজেই ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার বললো, 'একটা মেয়ে যা করতে পারে, তার সবই তুমি করতে পারবে; কিন্তু তোমার বাচ্চা হবে না।'

হিজড়াদের মধ্যে পুরুষ ও ,মহিলা উভয়ই আছে। কিছু হিজড়া প্রায় পুরুষদের মতো; কিছু প্রায় মেয়েদের মতো। আবার কিছু আছে পুরুষ ও মহিলার মিশ্রণ। সেজন্যে বলা মুশকিল যে, কার মাঝে কি অবস্থা লুকিয়ে আছে। মেয়েদের পোশাক পরার ব্যাপারে তাদের মাঝে আগ্রহের একটা কারণ থাকতে পারে যে, পুরুষ শাসিত সমাজে গ্রহণযোগ্য মান অপেক্ষা ভিন্নতর কিছুকে অপুরুষোচিত বিবেচনা করা হয়। তার চাইতে বরং মহিলারা উদার।

ভাগমতি মেয়ে হিজড়া। তার বয়স যখন পনের বছর তখন হিজড়া দলের নেতা তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। তার আরো দু'জন হিজড়া স্ত্রী ছিল। এটা কোন ব্যাপারই নয়। পুরনো স্ত্রীরা তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করার চাইতে বরং তাকে বিয়ের পোশাক পরানো থেকে শুরু করে বাসর শয্যা রচনা করা পর্যন্ত সব কাজ করলো আনন্দচিত্তে। তার আগে ভাগমতির শরীরের বিভিন্ন স্থানে গজানো অবাঞ্ছিত লোম কামিয়ে তাকে গোলাপ জলে স্নান করিয়ে দিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে বাসর রাতের লীলা দেখা ও কথা শোনার চেষ্টায় লিপ্ত হলো। পরে তারা তাকে ভালোও বাসতো।

ভাগমতি সতের বছর বয়সে পড়লে গুটি বসন্তে আক্রান্ত হলো। হিজড়ারা তাকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করে হাসপাতালে ছেড়ে এলো। সেখানে মানুষ মরছিল মাছির মতো। 'শীতলা মা (বসন্ত রোগের দেবী) আমাকে বাঁচিয়ে রাখলেও তার আঙ্গুলের ছাপ রেখে গেল আমার মুখের উপর।'

পুরুষেরা যখন তাদের লালসা চরিতার্থ করতে হিজড়াদের কাছে আসতো, তখন বিস্ময়কর মনে হতো যে, কতক লোক হিজড়াদেরকে মহিলাদের মতোই ব্যবহার করে। ভাগমতি মেয়ে হিসেবেও ব্যবহৃত হতো, সমকামীদেরকেও তার উপর উপগত হতে দিতো। সে আরো আবিষ্কার করেছিল যে, কিছু খদ্দের নিজেরাও মেয়েদের মতো আচরণ পাওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়। যদিও খদ্দেরকে তৃপ্তি দেয়ার মতো উৎস তার সীমিত, তবুও সে শিখে নিয়েছিল যে, কিভাবে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

ভাগমতির কাছে কোন যৌন প্রক্রিয়াই অস্বাভাবিক বলে মনে হতো না। অতএব সে নিজেও যৌন কর্ম উপভোগ করতো। খুব সাধারণ হিজড়া হওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধ, তরুণ, সক্ষম, ধবজভঙ্গ, সমকামী, মর্ষকামী সব ধরনের খদ্দেরই তাকে কামনা করতো।

ভাগমতি যৌন শয্যাকে প্রতিযোগিতায় মত্ত দু'জন কুস্তিগীরের কুস্তি লড়ার স্থানের মতোই বিবেচনা করতো। ভাগমতি পুরুষ-নারীতে আসক্ত যৌন বিকারগ্রস্তদের ভোগের উপকরণ। যদিও ভাগমতি তার পেশার ব্যাপারে উদার, তবু তার স্বামী ও সতীনদের সাথে সে লাল কুয়ানেই বাস করতো। যা আয় হতো, তা স্বামীর হাতে তুলে দিতো। বিনিময়ে মাথার উপর একটি ছাদ আর আহার জুটতো তার। অসুস্থ হলে তারা তাকে সেবা করতো। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে জামিনে ছাড়িয়ে আনতো। সাজা হলে জরিমানা দিয়ে মুক্ত করে আনতো।

ভাগমতির সাথে কিভাবে আমার সম্পর্ক হলো? সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আমার কাছে সে এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো কেন ? সে সম্পর্কেও আমি নিশ্চিত নই। জীবনে আমার দু'টি মাত্র আবেগ আছে; একটি আমার প্রিয় নগরী দিল্লির জন্যে, আরেকটি ভাগমতির জন্যে। উভয়ের মধ্যেই দু'টি বিষয়ে বিরাট সামঞ্জস্য ঃ উভয়েই আনন্দের অফুরন্ত উৎস এবং উভয়েই বন্ধ্যা।

জর্জিন

আমার জন্যে বছরটা দুঃসময় ছিল। আমার হাতে লিখার খুব কাজ ছিল না এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখা পাঠিয়ে যা পাচ্ছিলাম, তা আমি যে জীবনযাত্রার অভ্যস্ত তা নির্বাহ করার জন্যে মোটেও পর্যাপ্ত ছিল না। সে জন্যে আমাকে ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগে গাইড হিসেবে নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়েছিল এবং বিদেশী দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক সংস্থার দফতরগুলোতে আমার ভিজিটিং কার্ড রেখে আসতাম। পর্যটনের মওসুমে, অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রায় আমার বেশ ভালো আয় হয়, যা আমি সরকারি রেটের চাইতে অধিক মূল্যে ভারতীয় রুপিতে রূপান্তরিত করি। আমি হোটেল, কুরিয়ার এজেন্ট, জ্যোতিষীদের কাছ থেকেও কমিশন লাভ করি তাদের কাছে বিদেশী টুরিস্টদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে। বিদেশীরা আমাকে তাদের গাইড হিসেবে নিযুক্ত করে। তারা ফিরে যাওয়ার সময় তাদের স্কচ মদের বোতল আমাকে দিয়ে যায়। কখনো কখনো মাঝবয়সী রমণীরা তাদের হোটেল কক্ষে আমাকে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাদেরকে দেয়া সার্ভিসের বিনিময়ে উপঢৌকন দেয়।

কাজটা খুব কঠিন নয়। কিছুসংখ্যাক রাজবংশ ও সম্রাট-রাজাদের নাম এবং কখন তারা এদেশ শাসন করেছে তা মুখস্থ করার পর তাতে কিছু রস ও মশল্লা যোগ করে পরিবেশন করাই আমার কাজ। কুতুব মিনারে গিয়ে আমি তাদেরকে বলি যে, এখানে কতো লোক ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি তাদেরকে সম্রাট হুমায়ুনের পিতা বাবরের কথা বলি, যিনি পুত্রের রোগশয্যার চারদিকে চারবার প্রদক্ষিণ করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন পুত্রের ব্যাধি তার দেহে সংক্রমণের জন্যে এবং কিভাবে হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেন এবং এর ক'দিন পরই বাবর মৃত্যুবরণ করেন। লালকিল্লা এবং সেখানকার প্রাসাদ সম্পর্কে আরো চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করি। এর নির্মাতা সম্রাট শাহজাহানের সময়কাল হতে যারা ময়ুর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, যাদেরকে হত্যা বা অন্ধ করে দেয়া হয়েছে, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশদের লালকিল্লা দখল, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অফিসারদের বিচার, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক লালকিল্লার উপর থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে নেয়া ও নেহরু কর্তৃক ভারতের ত্রিরঙ্গা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা পর্যন্ত বিস্তারিত বলি। এর বাইরে আমার আর কোন কাজ থাকে না।

অল্পদিনের মধ্যে আমি কাজটি পছন্দ করতে শুরু করি। যদিও আমি এমন কোন সম্ভাবনা দেখি না যে, কেউ আমাকে বিশ্বটা ঘুরে বেড়ানোর জন্যে একটি ফ্রি টিকেট

দেবে, কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে, গোটা বিশ্বই আমার কাছে হাজির হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের এক ফ্যাক্টরীতে চাকরিরত আমার চাচাতো ভাই একবার আমাকে বলেছিল যে, একই সাথে কর্মরত কতোগুলো শ্বেতাঙ্গিনীকে সে 'হত্যা' করেছে। আমিও তাকে বলেছিলাম, এই দিল্লিতে বাস করেই এবং চার আনার একটি অচল মুদ্রা খরচ না করেও আমি তার চাইতে অনেক বেশি সংখ্যক ইউরোপীয়, আমেরিকান, জাপানি, আরব ও আফ্রিকান মহিলাকে 'হত্যা' করতে সক্ষম হয়েছি। ভাইটির মুখ দিয়ে যেন লালা ঝরতে শুরু করে এবং ঈর্ষায় নিজের অণ্ডকোষ চুলকাতে শুরু করে।

কিন্তু আমার একমাত্র সমস্যা হচ্ছে, কারো সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ার কোন সুযোগ কখনো হয় না। সব মেরী, জেনস, ফ্রাংকোসিস, মিকিস আমার সাথে প্রেম করেছে, আমাকে একদিন বা দু'দিন আনন্দ দান করেছে। বাস্, এরপরই চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে। কয়েক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর আমিও তাদের নাম বা চেহারা আর স্মরণ করতে পারি না। শুধু মনে করতে পারি যে, আমি যখন তাদের প্রসারিত উরুর উপযুক্ত ব্যবহার করতে গেছি তখন তারা আমার সাথে কেমন আচরণ করেছে। কেউ বিছানায় নির্জীব নিঃসাড় পড়ে থেকেছে। চরম অবস্থায় পৌছে কেউ মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করেছে। কেউ কেউ মুখে বাজে শব্দ উচ্চারণ করতে পছন্দ করেছে, আমার মুখে থাপ্পড় মেরে বলেছে, 'যা করার ভালোভাবে করো।'

কিন্তু আমেরিকান মিসি বাবা জর্জিনের সাথে সম্পর্কটা ছিল একেবারে ভিন্ন রকমের। মার্কিন অ্যামবেসিতে আমার যোগসূত্র ছিল কার্লাইল নামে এক ব্যক্তির সাথে। আমি জানি না, অ্যামবেসিতে তার কাজ কি। তবে এটুকু জানি যে, আমেরিকা থেকে কেউ ভারতে এলে তাদের দেখাশুনার ভার তার উপর পড়ে। গাইড নিয়োগ করার কাজটিও তার। একদিন সে আমাকে আশ্বাস দেয় যে, আমি যদি কোন ট্যুরিস্টের সাথে হ্যাংকি প্যাংকি না করি তাহলে সে আমাকে অনেক কাস্টমার জুটিয়ে দেবে। আমেরিকানরা আমার সবচেয়ে ভালো কাস্টমার। তাদের চমৎকার আচার ব্যবহার ছাড়াও অন্যান্য বিদেশী অপেক্ষা তারা অনেক বেশি উদার। আমি বিশেষ করে কার্লাইলের লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতাম। আমি তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ, নম্র এবং একটা দূরত্বও বজায় রাখি। তাদের জন্যে গাড়ির দরজা খুলে দেই, টিপসের জন্যে হাত পাতি না অথবা তাদের টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা, বল পেনের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাই না। (কারণ আমি জানি, তারা আমার জন্যে কিছু স্যুভেনির অবশ্যই রেখে যাবে।) কমিশন পাবার লোভে আমি তাদেরকে বড় বড় দোকানে নিয়ে যাই না। তবে যথাসম্ভব কম দামে ভালো জিনিস কেনার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি। বৃটিশ টানে আমার ইংরেজী উচ্চারণ আমেরিকানদের প্রভাবিত করে অন্য ইংরেজী ভাষীদের চাইতে বেশি। তাদের কাছে আমি ভদ্র বিনয়ী গাইড, সম্ভ্রান্ত মানুষ, ভাগ্যচক্রে অবস্থা খারাপ হয়েছে বলে গাইডের কাজ করছি। কথাটা সত্য।

কার্লাইল আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় জর্জিনের সাথে। জর্জিন মিসেস কার্লাইলের ভাতিজি। ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে দিল্লি এসেছে। কার্লাইল জর্জিনের দ্বিতীয় নামটি আমাকে না জানিয়েই বলে, 'এ হচ্ছে, জর্জিন।' আমার দিকে দেখিয়ে বলে, 'এ তোমার গাইড।' জর্জিন বলে, 'হাই।'

জর্জিন তন্বী তরুণী। মুখে ব্রণ। স্তন বিশাল। গাধার ওলানের চাইতে বড়। ARIZONA লিখিত টাইট ফিটিং সোয়েটার তার গায়ে এবং ততোধিক আঁটসাট জিনসের ট্রাউজার। আমি জানতে চাই, কোন্ বিষয়ে তার আগ্রহ অধিক। ব্যক্তি, না স্মৃতিসৌধ! সে কাঁধ ঝাঁকায়, মুখ খুলে এবং উত্তর দেয় খানিকটা অভিযোগের সুরে, 'আমি কি করে জানবো? দু'টোরই কিছু কিছু বলে আমার ধারনা।' সে আমার হাতে একটি মিনি ক্যামেরা ধরিয়ে দেয়। কার্লাইল পরিবারের সাথে তার ছবি তোলার জন্যে। জর্জিন দ্রুত কথা বলে এবং যে সব শব্দের শেষে 'ing,' থাকে তার অধিকাংশ থেকে 'g' বাদ পড়ে যায়। যেমন 'goin' 'comin', 'gettin', 'seein', ইত্যাদি। তার অঙ্গভঙ্গিও দেখার মতো। খুব দ্রুত এবং নীল চোখ ও হাত দিয়ে কথা বলে বেশি। অনেক সময় নাঁকি সুরেও বলে এবং বলার সময় মনে হয় যেন ইচ্ছাকৃতভাবে জিহবা বের করে দিচ্ছে।

ফটো তোলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার দিকে ফিরে বলে, 'আমরা তাহলে অপেক্ষা করছি কেন?'

আমি গাড়ির পিছনের দরজা খুলে ধরি। সে অবজ্ঞার সাথে অগ্রাহ্য করে ড্রাইভারের পাশের আসনে গিয়ে বসে। আমি পিছনের আসনে বসে বলি, 'মিস...'

'আমার নাম জর্জিন।'

'মিস জর্জিন, তুমি কি.....,

'মিস জর্জিন নয়, শুধু জর্জিন। আশা করি, কিছু মনে করবে না।'

'আমি বলতে চাইছিলাম, তুমি কি ভারতের ইতিহাস কিছুটা পাঠ করছো ? কারণ আমরা দেখতে যাচ্ছি..... ।'

'একজন আমেরিকান হাইস্কুল ছাত্রীকে এ ধরনের প্রশ্ন করা অনুচিত। যীশুর নামে বলছি, আমাকে কেন ভারতের ইতিহাস পাঠ করতে হবে?' আমি শান্ত থাকার সিদ্ধান্ত নেই। দিল্লি গেট হয়ে ফয়েজ বাজারে প্রবেশ করি। সে জানতে চায়, 'এই লোকগুলো কি করছে?'

'সব্জি বিক্রি করছে। ওরা সব্জি বিক্রেতা।' সে আমার দিকে তাকায় এটা দেখতে যে, আমি সত্যিই মানুষ কিনা। কারণ আমার উত্তরে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

আমরা ফয়েজ বাজার অতিক্রম করছি। বাম দিকে শাহী জু'মা মসজিদ। ডান দিকে লালকিল্লার সুউচ্চ প্রাচীর। সে ড্রাইভারকে থামতে বলে এবং ছবি তোলে। আমরা লাল কিল্লার ফটক পর্যন্ত যাই এবং গাড়ি থেকে নামি। আমি টিকেট নেয়ার জন্যে লাইনে দাঁড়াই এবং জর্জিন ছবি তুলতে থাকে। চাঁদনী চক, টোঙ্গা হকার, ভিখারী সবকিছুর ছবি তুলছে সে। ফটকের প্রহরীদের ছবিও সে তোলে। আমরা বিভিন্ন উপঢৌকন সামগ্রীর দোকানের সারির কাছে পৌঁছি। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সে চিৎকার করে, 'আমি সবকিছু নিতে চাই। কতো দাম পড়বে?' সে এ দোকান থেকে সে দোকান– প্রতিটি দোকানে যায়। এক একটা জিনিস তুলে, দেখে আবার যথাস্থানে নামিয়ে রাখে। জর্জিন খুব ধূর্ত। সে কিছুই কিনে না। কাঁচের কাসকেটে সাজানো মার্বেলের একটি তাজমহল হাতে নেই। দোকানির উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকাই। সে মাথা ঝুঁকিয়ে বুঝতে দেয় যে, এটা জর্জিনকে সে ফ্রি দিচ্ছে উপহার হিসেবে।

'সত্যি! কিন্তু কেন?' আমার হাত থেকে তাজমহল নিয়ে সে খুশীতে তার বিশাল স্তনের সাথে চেপে রাখে। 'এটি খুবই সুন্দর। ধন্যবাদ! ধন্যবাদ' সে আমার নাকে তার ঠোঁট ছোঁয়ায়। 'আর এটা তোমার জন্যে।'

ফেরার পথে সে আমার পাশে পিছনের আসনে বসে। আমি যখন ড্রাইভারকে বলি গাড়ি জু'মা মসজিদের দিকে নিতে, সে আপত্তি জানায়। 'না একটি সকাল, একটি সৌধ। ঠিক আছে?'

'তাহলে দিল্লি দেখতে আমাদের এক মাস লেগে যাবে।'

'গুডি। তুমি প্রতিটি সকাল আমার সাথে কাটাতে পারবে। তা কি তোমার ভালো লাগবে না ?'

গাড়ি চাঁদনী চক, খারি বাউলি, সদর বাজার দিয়ে চলছে। জর্জিনের মুখে কথার তুবড়ি ছুটছে। সে ছবি তুলছে। কখনো বলছে, তোমাকে খুব মজার লাগছে দেখতে। গত সপ্তাহে কেউ যদি আমাকে বলতো যে, আমাকে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, মুখে অগোছালো দাড়িওয়ালা একজন কালো মানুষের সাথে গাড়িতে ঘুরতে হবে, তাহলে আমি মরেই যেতাম।' আমি কিছু বলি না। সে বলেই চলেছে, 'আমি সবসময় আজেবাজে বাকি।' আমার বিরক্তি নিশ্চয়ই সে বুঝতে পারছে। 'কিছু মনে করো না।' আমি নিরুত্তর। সে অস্বস্তির উচ্চারণ করে এবং কার্লাইলের বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত আর কিছু বলে না। গাড়ি থেকে নেমেই সে মুখ খুলে, 'আমি কি তোমার দাড়ি ছিঁড়তে পারি?' আমি দাড়ি রক্ষার জন্যে হাত তোলার আগেই সে আমার দাড়ি খামচে ধরে সজোরে টান দেয়। সিটের উপর তিনটে দশ রুপির নোট ছুঁড়ে দিয়ে তাজমহলের প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে একটা লাফ দেয়। তার গুরু নিতম্বে প্রবল কম্পন তুলে দরজার দিকে দৌড় লাগায়, 'বাই! কাল আবার দেখা হবে।'

আমরা নাকারখানা গেটে আসি। সে গাইড বুক খুলে বলে, 'আমাকে বলতে দাও। এখানে দামামা বাজানো হতো, তাই না? সামনের ওই লাল প্রাসাদে মহান সম্রাটরা সাধারণ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।'

'ঠিক ধরেছো। এ প্রাসাদের নাম 'দিওয়ান-ই-আম'

'তোমার কোন গাইডের প্রয়োজন নেই। তুমি সব জানো।'

'না, আমি জানি না।' গাইড বুক দেখে সে আমাকে সম্রাট শাহজাহান সম্পর্কে বলে। তিনি কবে এসব প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন ইত্যাদি। সিংহাসনের পিছনের চিত্রমালা দেখে সে বলে, 'এ হচ্ছে রং মহল, স্বপ্ন দেখার ঘর। অস্টকোনাকৃতির জেসমিন টাওয়ার। দিয়ারোনি ...।'

'দিওয়ান-ই-খাস।'

'এখানে সম্রাট ময়ুর সিংহাসনের বসে ওমরাহদের সাক্ষাৎ দিতেন।'

'তুমি যথার্থ বলেছো।'

'গুডি। পার্ল মসজিদ তৈরি করেছেন সম্রাটের পুত্র, যিনি পিতাকে বন্দি করে রেখেছিলেন। সম্রাট ওরাঙ্গিয়েদি..,'

'আওরঙ্গজেব।'

'আমি কি যথেষ্ট বুদ্ধিমতি নই?'

'যথেষ্ট। পেশাদার গাইড হিসেবে তুমি খুব ভালো কামাতে পারবে।'

'তা পারবো! আমি তৃষ্ণার্ত। আমি কি দুধ বা কোক পেতে পারি?'

'কোক পাওয়া যাবে। কিন্তু দুধ পাওয়া যাবে না।'

আমরা গেটের কাছে আসি। সে দুই বোতল কোক পান করে। পেটে চাপ দেয় এবং ঢেকুর তুলে বলে, 'সরি। এখন বেশ ভালো লাগছে।'

কোন ট্যুরিস্টকে লালকিল্লা ঘুরিয়ে দেখাতে আমার দেড় ঘন্টার বেশি সময় লাগে। জর্জিনের লাগলো বিশ মিনিট। আমি আপন মনে বিড়বিড় করি, 'কুত্তি!' ওকে যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, ওর পা দু'টো প্রসারিত করে জিনসের ট্রাউজার ফেড়ে ফেলে ওর তরমুজ আকৃতির বিশাল নিতম্বে প্রবলভাবে কয়েকটি চাপড় মারা এবং এরপর অস্বাভবিক যৌনকর্ম সম্পন্ন করা।

কফি হাউজে গিয়ে নিজেই আমার বন্ধুদের সাথে জর্জিনের ব্যাপারে আলাপ শুরু করি। আমি আমার শিখ সাংবাদিক বন্ধুকে পছন্দ করতে পারলাম না এ কারণে যে, সে জর্জিনকে আমার 'ফাঁদে পতিত আরেকটি শিকার' হিসেবে ভাবছে বলে। রাজনীতিবিদ বন্ধুও ষোড়শী বালিকার কামকলার জ্ঞানের ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করলো। কফি হাউস থেকে যখন বের হলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। জাম গাছে পাখিরা কিচিরমিচির রব তুলেছে। আমি তার নাম এতো জোরে উচ্চারণ করতে চাইলাম, যা গোটা কনট সার্কাসে প্রতিধ্বনি তুলতে পারে, 'জর্জি-ন!' এই আওয়াজে যানবাহন চলাচল রুদ্ধ হয়ে যাবে। জর্জিন শব্দটি এবং পাখির কলতান এক হবে। কনট সার্কাসও তার চারপাশ জুড়ে শুধু প্রতিধ্বনি শোনা যাবে, 'জর্জিন, জর্জিন, জর্জিন।'

সেই সন্ধ্যায় আমি ভাগমতিকে বললাম জর্জিন সম্পর্কে। বরাবরের মতোই সে শুধুমাত্র তাকে ছাড়া অন্যান্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখানোকে পছন্দ করতে পারলো না। আমি তাকে একথা স্মরণ করিয়ে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলাম যে, জর্জিন আমার চাইতে বয়সে চল্লিশ বছরের ছোট। কিন্তু তাতে সে আশস্ত হলো না। অতঃপর আমি যখন তাকে স্বাভাবিকের চাইতে বেপরোয়াভাবে গ্রহণ করলাম, সে জানতে চাইলো, 'আজ আপনার কি হয়েছে?' যার অর্থ, আপনি আসলে আমাকে গ্রহণ করছেন না, বরং বিশাল নিতম্বের অধিকারিণী ষোড়শী শ্বেতাঙ্গিনীকে। তার ধারনাই সঠিক।

সকালে আমার মধ্যে উৎসাহ নিতান্তই কম। যা হোক, আমি ঠান্ডা স্যাঁতসেতে বাথরুমে বিশ মিনিট ব্যয় করলাম দাড়িতে কলপ লাগাতে। কার্লাইলের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছিলাম, কি ধরনের অভ্যর্থনা পাবো। জর্জিন বাইরে রোদ পোহাচ্ছিল। তাকে আরো বড়োসড়ো লাগছিল। মাথাটা একটু ঘুরিয়ে জানতে চাইলো, 'আমার চুলের নয়া স্টাইল তোমার কেমন লাগছে?' চুলগুলোকে সে মাথার উপরে উচুঁ করে বেঁধেছে। এতে তার গলা দীর্ঘ মনে হচ্ছে এবং ছোট গোলাপী কান দু'টো বের হয়ে আছে। বললাম, 'খুব সুন্দর! ঠিক একজন ভদ্রমহিলার মতো মনে হচ্ছে।'

'আমি আসলেও তাই।'

গাড়িতে বসে সে জানতে চাইলো যে, আমি পাগড়ি মাথায় রেখেই ঘুমাই কিনা।

উত্তর দিলাম, 'তুমি যদি বয়সে আর একটু বড় হতে, তাহলে বলতাম, এসে এবং নিজে দেখে যাও।'

তার মুখ উজ্জ্বলতর হলো। 'তুমি একটা দুষ্টু বুড়ো। তুমি কি আমাকে কিছু বুঝাতে চাইছো?'

এবার আমার বিব্রত হওয়ার পালা। 'আমি বলেছি, তুমি যদি বয়স্কা হতে অর্থাৎ বেশ বয়স্কা...। আমি নিশ্চয়ই তোমার পিতার চাইতেও বেশি বয়স্ক।'

'আমি কি সে ধরনের কাউকে চিনেছি?'

আমাকে চাটুকারিতার আশ্রয় নিতে হয়। শ্বেতাঙ্গরা চাটুবাক্যে অভ্যস্ত নয়। অতএব সহজে ধরা দেয়। সেও আমাকে সুযোগ দেয় অল্প সময়ের মধ্যে আমার হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে। 'আমার সাথে পাগলামি করো না। আমি বাজে কোন ইঙ্গিত করিনি।' আমি তার হাত আঁকড়ে ধরে বলি, 'তোমাকে বাজে বলিনি। তুমি হলে সুন্দরতম মিসি বাবা। এমন কারো সাথে আমি আগে কখনো মিশিনি।'

'মেসি কি?' কণ্ঠ একটু চড়িয়ে সে বলে।

'মেসি নয়, মিসি। মিথ্যা বলছি না। তোমার মতো সুন্দরীকে নিয়ে ঘোরার সুযোগ সচরাচর হয় না।'

'আহ্! আমি সুন্দরী বা সুদর্শনা অথবা সেরকম কিছু নই।' কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার কথায় সে তুষ্ট হয়েছে। খুশীতে তার মুখ গোলাপী বর্ণ ধারন করেছে। এক মুহূর্ত থেমে সে বলে, 'তুমি চমৎকার বৃদ্ধলোক। আমি কি তোমাকে 'পপ' বলতে পারি? আমি তোমার নাম জানি না।'

ষোড়শীদের বাগে আনা খুব সহজ। এর চাইতে এক বা দু'বছরের বড় হলে অতোটা নয়। ষোল বছর বয়সে তারা নিজেদের সম্পর্কে অনিশ্চিত অবস্থায় থাকে এবং তাদের সৌন্দর্য, মেধা– যে কোন ব্যাপারে কারো প্রশংসায় কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। জর্জিনও খুব সহজ মনে হলো আমার কাছে। তাকে কফি হাউসে নিয়ে গেলাম বন্ধুদের দেখানোর জন্যে। তার মুখ আবার উজ্জ্বল হলো এবং বললো, 'তুমি আসলেই একটা দুষ্টু বুড়ো। কিন্তু তোমাকে আমি পছন্দ করি।'

কফি হাউসে 'শুধু পরিবারের জন্যে' সংরক্ষিত অংশে বসলাম। আমি ওর জন্যে একটি কোকের অর্ডার দিয়ে বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাতে গেলাম। জর্জিনের ব্যাপারে তারা ভালো কোন মন্তব্য করলো না। শিখ সাংবাদিক বন্ধু বললো, 'তুমি যেভাবে এর বর্ণনা দিয়েছিলে, তাতে আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি একটা মেরিলিন মনরো ধরেছো। সুন্দর মোটা গোশতের টুকরা। মজাদার!'

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করলো, 'সে মোটেও কোন নূরজাহান নয়। আর দশটা আমেরিকান স্কুল ছাত্রীর মতোই। বেশ তুলতুলে পুষি বেড়ালের মতোই মনে হচ্ছে। আমি যা ভেবেছিলাম, তুমি দেখছি, তার চাইতে বেশি পাগল হয়েছো। দেখো, কোন বাজে ফন্দি খাটাতে গেলে একেবারে সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড।'

কুৎসিৎ, অশ্লীল আলোচনা। জর্জিনের কাছে ফিরে যাই। সে জানতে চায়, 'তোমার গার্লফ্রেন্ড সম্পর্কে তাদের বক্তব্য কি?'

গার্লফ্রেন্ড? তুমি তাই মনে করছো?' আমি বিস্মিত হওয়ার ভান করি। 'ওরা বললো, তুমি খুব সুন্দরী।'

'মিথ্যুক! একশ' ডলারের বাজি ধরছি। ওরা বলেছে; ওরকম বিশ্রী দর্শন একটি মেয়ের সাথে তুমি কি করছো? সতের বছরের নিচের কারো সাথে এরকম করলে জেলে যেতে হবে। আমার ধারণা সম্পর্কে তোমার কি মনে হচ্ছে?'

'ভুল, ভুল, ভুল!' আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। দেখতে পাচ্ছি, সে খুশী হয়েছে।

এবার সে আমাকে ফি দেয় একটি খামে ভরে এবং ধন্যবাদ জানায় সবকিছুর জন্যে।

সেই সন্ধ্যায় আমি আবেগ ও বিবেক তাড়িত হই। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে আমি তাকে ফোন করি, যদিও তাকে বলার কিছুই ছিল না। তার চাচা ফোন ধরে, 'তুমি নিশ্চয়ই জর্জিনের মাথাটা খারাপ করে দেবে না। সে তোমার সাথে যে সময় কাটিয়েছে, আমি সেই বিল দিয়ে দেব।' আমি কেন ফোন করেছিলাম তা জানতে না চেয়েই সে ফোনটা রেখে দেয়। কিন্তু এটা জেনে উত্তেজিত হয়ে পড়ি যে, চাচাকে কিছু না বলেই জর্জিন আমার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে।

এই তথ্যটি একটি উপযুক্ত সময়ে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখি। ইতোমধ্যে সৌজন্য বিনিময়ে আমি সাহসী হয়ে উঠেছি। যেহেতু সে প্রতিদিন চুলের স্টাইল পাল্টাচ্ছে, অতএব আমি তাকে খুশী করার মতো মন্তব্য করার প্রচুর সুযোগ পাই। একদিন সে উজ্জ্বল লাল শাড়ি পরে। তাকে মানায়নি। সে এটাও জানে না যে, শাড়ি পরে একজন মেয়ে কিভাবে হাঁটে। অধিকাংশ ককেশীয়ের মতো তার মধ্যে এক ধরণের পুরুষালী ভাব আছে। আমি তবুও বলি, 'বাহ্, কি চমৎকার মানিয়েছে!' উত্তরে সে বলে, 'ধন্যবাদ! আমি ভেবেছিলাম, তোমাদের দেশীয় পোশাক পরতে দেখলে তুমি খুশী হবে।' আমি তাকে বুঝিয়ে বলি যে, 'শাড়ি পাঞ্জাবীদের পোশাক নয়, পাঞ্জাবী মেয়েরা সালোয়ার– কামিজ পরে এবং তাতে তোমাকে আরো বেশি মানাবে।' সে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠে। 'সত্যি! আমি এখনই সেগুলো চাই।' আমি তাকে দর্জির কাছে নিয়ে যাই। সে যখন কাপড় পছন্দ করছিল তখন আমি দর্জিকে পাঞ্জাবীতে বলি, পোশাকটি তৈরি করে বিলসহ আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। জর্জিন মনস্থির করতে পারে না। যে কাপড়টি পছন্দ করেছে, সে বলছে, তার জন্যে ব্যয়বহুল। অতএব সে তার দ্বিতীয় পছন্দের ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি করলো। দর্জিকে পাঞ্জাবীতে বললাম, জর্জিনের প্রথম পছন্দ করা কাপড় দিয়ে সালোয়ার-কামিজ তৈরি করতে। গাড়িতে বসে সে আমার কাছে জানতে চায়, 'তুমি কি সত্যিই বলছো যে, এই পোশাক আমার গায়ে ভালো লাগবে?'

'আমি নিশ্চিত, ভালো লাগবেই। আমাদের ভাষায় একটি শব্দ আছে, 'জামাজেবী' অর্থাৎ যে কোন পোশাকে মানানোর যোগ্যতা। আমার বিশ্বাস, তুমি যে পোশাকেই পরবে, তাতেই তোমাকে ভালো লাগবে।'

কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়। কারণ তার বিশাল স্তন ও গুরু নিতম্বের কারণে কোন পোশাকে তাকে মানানো বা শোভনীয় করার মতো নয়। সে আমার প্রশংসায় বিগলিত না হওয়ার ভান করে। 'আমি জানি, তুমি যতো সুন্দর কথাই বলো না কেন, কোনটাই সত্যি নয়। কিন্তু তুমি যা বলছো, তা আমার ভালো লাগছে। কাজেই না থেমে বলো,

ঠিক আছে।' আমার অ্যাপার্টমেন্টে তাকে পাওয়া খুব সহজ। পোশাকের জন্যে মাপ নেয়ার দু'দিন পর আমি তাকে আমার গাড়িতে ঘুরে বেড়ানোর প্রস্তাব করি। তাকে যখন তুলে আনতে যাই, তখন খুব অস্বাভাবিকভাবে বলি, 'তোমার পোশাক আমার অ্যাপার্টমেন্টে ডেলিভারি দিয়েছে। তুমি কি বেড়াতে যাওয়ার আগে সেগুলো নিয়ে নেবে?'

'ঠিক আছে চলো।'

সে প্রশংসার দৃষ্টিতে আমার বই, ছবি দেখে। 'সুন্দর' 'চমৎকার 'বাহ্', এসব ধ্বনি তুলে।

'ধন্যবাদ। একটু বসবে কি?' সে জুতা খুলে আড়াআড়ি করে পা রেখে বসে। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছো?'

আমি গালিবের কবিতার উদ্ধৃতি দেই। প্রথমে উর্দুতে, পরে ওর জন্যে ইংরেজীতে তরজমা করি ঃ

"আজ সে আমার বাড়িতে এসেছে
কখনো আমি তার দিকে তাকাই
কখনো নিজের ঘর দেখি –"

'এর মানে আমাকে এখানে পেয়ে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছো। আমার জিনিসগুলো কোথায়?'

আমি প্যাকেটটা এনে খুলি। কাপড় দেখে সে মুখ খুলে, 'আমি তো এটার কথা বলিনি। তোমার মনে আছে, এটার দাম বেশি। বুড়ো দর্জি আমার উপর ডাকাতি করতে চাইছিল। তোমরা সব ইন্ডিয়ান আমেরিকানদের ধরতে চেষ্টা করো। তোমাদের ধারনা, আমরা হচ্ছি শোষক, তাই না?'

'দর্জি এর জন্যে তোমার কাছ থেকে বেশি দাম নেবে না। সে বুঝতে পেরেছে যে, এটাই তোমার পছন্দ। তাই সে তোমার জন্যে তৈরি করেছে।'

সে বিব্রত বোধ করে। 'আমি দুঃখিত। সে আসলে ভালো মানুষ। এটা কি?' ওড়নার ভাঁজ খুলে সে বিস্মিত হয়। 'এটা খুব সুন্দর। কিন্তু এটা তো আমি চাইনি।'

পোশাকের সাথেই এটা থাকে। বাড়তি দাম দিতে হয় না।' সে মাথা গলিয়ে কামিজ পরে একটি আয়না খুঁজতে থাকে।

'কোথায় পরবো এগুলো? ' আমি বেডরুম দেখিয়ে দেই। খানিক সময়ের জন্যে আমি একা। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দ্রুত পান করি। চেয়ার ছেড়ে সোফায় বসি। জর্জিন পাঞ্জাবী পোশাক পরে বের হয়ে আসে। ওড়নাটা মনে হচ্ছে, তারকাপূর্ণ সাদা মেঘমালার মতো। পোশাকটা তার গায়ে ঠিকভাবে লেগেছে। মনে হচ্ছে, পাঞ্জাবী পোশাক পরার জন্যেই তার দেহকাঠামো তৈরি হয়েছে। পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন হয়েছে?'

'তুলানাহীন! তুমি যা পরে থাকো, তার যে কোনটার চাইতে অনেক বেশি সুন্দর।'

'ধন্যবাদ! আমারও বেশ পছন্দ হয়েছে।' সে কাছে আসে এবং আমার পাশে সোফায় বসে। হাতব্যাগ খুলে বলে, 'এর জন্যে দর্জিকে কতো দিতে হবে?'

আমার শব্দ যেন গলায় আটকে গেছে। জোর করে বলি, 'কিছু দিতে হবে না। তোমাকে এটা গিফট হিসেবে দেয়ার সুযোগ আমাকে দাও। প্লিজ!'

'ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু আমি জানি, এ তোমার সাধ্যের বাইরে।'

'তা নয়, সাধ্যের মধ্যেই এবং এতে আমি খুব খুশি হবো।

'তুমি খুশি হলে আমি অবশ্যই নেব। তোমাকে আবারও ধন্যবাদ।' সে চট করে আমার দাড়ির উপর চুমু দেয়। তার চুমু আমাকে বিবশ করে দেয়। খানিক পর আমি বলতে পারি। 'তাছাড়া, আমি তোমার কাছে ঋণী। তোমার নিজের থেকে তুমি আমার ফি দিয়েছিলে, তাই না?'

'তুমি কি করে জানলে?'

'তোমার চাচাকে ফোন করেছিলাম।'

সে চুপ হয়ে যায়। 'কাজটা ভালো হয়নি। উনি কি বললেন?' ওর হাত আমার হাতে নেই। 'তুমি কিছু ভেবো না। তাকে বলিনি যে, তুমি আমাকে ফি দিয়েছো। এখন আমি কি ডাবল ফি উপার্জন করতে পারি?'

সে হাসে। 'তুমি যথার্থই ধূর্ত, প্রাচ্যের বৃদ্ধ। আমি স্বস্তিবোধ করছি যে, আমার আংকেল ব্যাপারটা জানে না।'

'তুমি তাকে বলো নি কেন?'

'আমি জানি না।'

এখন আমার উদ্যোগ নেয়ার সময়। 'হয়তো তুমি তার অজান্তে আমার সাথে থাকতে চেয়েছিলে।' পিছনে চুল নেড়ে সে বলে, 'হয়তো।'

যে কোন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় জানে যে, একজন টিন এজারের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করা অনুচিত। কারণ যখন আসল সময় আসে তখন তার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে যায় অথবা শুধু বলে, 'না।' অতএব উত্তম হলো, হাত দিয়ে দেহের সাথে কথা বলা। এর ফলে তার মাঝে বাকহীন গ্রহণযোগ্যতার উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আমি তাই করি। তার কোমর পেঁচিয়ে ধরি এবং আমার দিকে আকর্ষণ করে তার ঠোঁট, চোখ, নাক, কান, গলায় চুমু দিতে থাকি। সে অসহায়ের মতো গোঙাতে থাকে। তার কামিজের নিচে হাত দিয়ে স্তনের বোটা নিয়ে খেলতে শুরু করি। এরপর তার সালোয়ারের ফিতা খুলে সিক্ত উরুর মাঝে আঙ্গুল দেই। অত্যন্ত আলতোভাবে নাড়াচাড়া করার ফলে সে শিগগির চরম অবস্থায় উপনীত হয়ে গোঙাতে শুরু করে; 'ও গড, ও গড'। সে মানুষের আকৃতির একটি রবারের পুতুলের মতো নিঃসাড় পড়ে আছে। তার স্তনে হাত দেই। সে আমার হাতে থাপ্পড় দিয়ে হাত সরিয়ে দেয় এবং উঠে পড়ে। নিজের কাপড়গুলো তুলে নিয়ে বেডরুমে প্রবেশ করে। জিন্স পরে সে বেরিয়ে আসে। সালোয়ার কামিজ ও ওড়না দলামোচড়া করে ছুঁড়ে ফেলে এবং অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে যায়। জর্জিনকে সেই শেষবার দেখি। কার্লাইলের দেয়া শেষ কাস্টমারও ছিল জর্জিন। আমি জানি না, সম্মতির বয়সের চাইতে কম বয়সের মেয়ে, যার কামকলার জ্ঞান রয়েছে, তার সাথে আমি এমন কি করেছি। মহাভারতের একটি উদ্ধৃতি আমার মনে পড়লো, 'সমুদ্রে ভাসমান দু'টি কাষ্ঠখন্ড এক পর্যায়ে মিলিত হলো; আবার বিচ্ছিন্নও হয়ে গেল। সমগ্র বিশ্বের জীবন্ত সৃষ্টিগুলোর মিলনের রীতিও এ রকম।'